মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো ॥

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৬২
দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ (নিঃশেষিত—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪)
তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
রঘুনাথ গোস্বামী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
কলিকাতা-১২

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

এদেশ-বিদেশের জীবনসন্ধানী
শ্রীমান স্থধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের :

মানুষ গড়ার কারিগর

রক্তের বদলে রক্ত

আমার ফাঁসি হল

বৃষ্টি, বৃষ্টি !

বাঁশের কেল্লা	এক বিহঙ্গী	সৈনিক
ভুলি নাই	ওগো বধূ সুন্দরী	যুগান্তর
শত্রুপক্ষের মেয়ে	বনমর্মর	আগস্ট ১৯৪২
নরবাঁধ	নবীন যাত্রা	একদা নিশীথকালে
জলজঙ্গল	দুঃখ-নিশার শেষে	কুঙ্কুম
পৃথিবী কাদের	কাচের আকাশ	দিল্লি অনেক দূর
উলু	কিংশুক	দেবী কিশোরী
শ্রেষ্ঠ গল্প	খদ্যোত	বকুল

মনোজ বসুর গল্প-সঞ্চয়ন

রাখিবন্ধন	শেষলগ্ন	বিপর্যয়
ডাক বাংলো	নূতন প্রভাত	বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং

প্লাবন

সোবিয়েতের দেশে দেশে	চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব
নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ	চীন দেখে এলাম ২য় পর্ব

পথ চলি

'সবুজ চিঠি' সম্বন্ধে—

যুগান্তর :—"বাংলার ঘরোয়া কাহিনী দরদের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে বোধ করি মনোজ বসুর জুড়ি নেই। তাঁর প্রথমকালীন রচনা বনমর্মর নরবাঁধ কিম্বা দেবীকিশোরী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই এ কথা স্বীকার করবেন। তারপর মনোজবাবুর অন্যূন ত্রিশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই অবকাশে তাঁর সম্পর্কে পাঠকের ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলার ঘন বিটপীআচ্ছাদিত ছায়াসুশীতল গৃহপরিবেশের নানা জীবনধারা মনোজবাবুর লেখনীতে যে ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, অনেক লেখকেরই তা অনুকরণযোগ্য। সেখানে জীবন যে একটানা নিস্তরঙ্গ গতিতে বয়ে চলেছে, এমন নয়; সেখানে যেমন আনন্দ আছে, তেমনি দ্বন্দ্বও আছে। তাঁর সর্বশেষ আলোচ্য উপন্যাস-খানিতে সেই জীবনদ্বন্দ্ব নানা ঘটনা-পারম্পর্যে বিসর্পিল রেখায় ফুটে উঠেছে। স্কুল-মাস্টার ত্রিদিব ঘোষের প্রথম জীবনে এলো রোমান্স, তারপর সেই রোমান্সকে অতিক্রম করে বন্ধু শেখরনাথের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে কি করে নিজের হৃত মর্যাদার পথ খুঁজে পেলো সে, প্রধানত এই ঘটনাকে অবলম্বন করে সবুজ চিঠির মূল আখ্যান গড়ে উঠেছে। গ্রন্থের চরিত্রগুলি এক একটি টাইপ হয়ে ওঠায় স্বভাবতই তারা মনকে নাড়া দিয়ে যায়। সেখানে স্ত্রী ঝুমা, প্রণয়িনী উৎপলা, নিরপরাধিনী শরণার্থিনী সুধা কিম্বা মেস-ম্যানেজার ভুজঙ্গ বাড়ুজ্যে—স্ব স্ব ক্ষেত্রে কারও ভূমিকাই সংক্ষিপ্ত নয়। গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ভাষা। ভাষাকে কত সহজ কথ্যভাবে ব্যবহার করে কাহিনী বর্ণনায় লাবলীলতা অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এই গ্রন্থ। এ পরীক্ষায় মনোজ বসু নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হয়ে প্রকাশ-ব্যঞ্জনার একটি নতুন ধারা পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকা: "আলোচ্য উপন্যাসের লেখক একজন খ্যাতনামা কথা-শিল্পী। এ পর্যন্ত তিনি অনেক উপন্যাস ও বহু গল্প রচনা করিয়াছেন। অনেক লিখিয়াছেন বলিয়া কোনটিরই গুণ হ্রাস পায় নাই। তাঁহার সব কয়টি গ্রন্থ আদৃত হইয়াছে। না হইবার কারণও নাই। বাংলার জল, মাটি, আলো আর হাওয়ায় যে স্নিগ্ধতা মিষ্টতা আর মধুরতা তাহারই

স্বাদ পাওয়া যায় তাঁহার রচনায়। সুতরাং তাঁহার রচনা যে রসিক মনকে আবিষ্ট করিবে তাহাতে আশ্চর্য কী। আলোচ্য "সবুজ চিঠি" উপন্যাসখানিও তেমনি রসসমৃদ্ধ মনোরম গ্রন্থ। কিন্তু তাই বলিয়া উপন্যাসের চরিত্রগুলি সবই মনোরম নয়। উপন্যাসের নায়কের আবাল্য বন্ধু ভুজঙ্গবাবুর নীচতা ও কপটতা এবং শেখরের ক্রূরতা আর শয়তানি মনকে যেমন বিষিষ্ট করিয়া তোলে তেমনি উৎপলা, সুধা ও নায়িকা ঝুমার চরিত্র মনকে স্বভাবতই নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে যে কত বিচিত্র চরিত্রের নরনারী বিচরণ করিতেছে, তাহারই কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমান উপন্যাসে। লেখকের ভাষা অনবদ্য, গল্প বলার ভঙ্গি সুন্দর। একটানা পড়িয়া যাওয়া যায়, কোথাও থামিতে হয় না।"

দেশ: "যে সকল প্রবীণ কথাশিল্পী অক্লান্ত লেখনীচালনায় বাঙলা-সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়কে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, নিঃসন্দেহে মনোজ বসু তাঁদের অন্যতম পুরোগণ্য। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস "সবুজ চিঠি"।

মনোজ বসুর রচনার আঙ্গিক, চরিত্রচিত্রণ, গল্প বলার ভঙ্গিটি মনোরম। তাঁর শব্দচয়ন এবং ঘটনা-বয়নের মধ্য দিয়ে একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে গল্পকে দুধারে বেগে টেনে নিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে পরমকুশলী কথাশিল্পীর স্বাক্ষর বহন করে। এই সমস্ত নৈপুণ্য 'সবুজ চিঠি' উপন্যাসে পুরোমাত্রায় উপস্থিত।

একটি স্নিগ্ধ ঘরোয়া পটভূমি থেকে আখ্যান শুরু হয়েছে। স্কুলমাস্টার ত্রিদিব আর তার স্ত্রী ঝুমা—এদের একটি মধুর গৃহকোণ থেকে কাহিনী নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের এক বিশাল প্রান্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে। এসেছে জং বাঁড়ুজ্যের মত কপট চরিত্র, এসেছে উৎপলার আশা-বেদনা, এসেছে দুলালচাঁদ, দেশসেবার আড়ালে শেখরনাথের মত ক্রূরতা, সুধার মত অমৃতময়ী। মনোজ বসু চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে এ গ্রন্থে চিত্রধর্মী। সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের ওপর থেকে তিনি কপট আবরণ তুলে দিয়েছেন।

আর একটি বিষয় আমাদের ভালো লেগেছে। সেটি হলো কাহিনীকে তিনি নিছক ট্র্যাজেডি কি কমেডির বৃত্তবন্দী করেন নি। জীবনের একটি অধ্যায়কে তার বিভিন্ন উত্থান-পতনের সংগ্রামকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।"

॥ এক ॥

বনবিহঙ্গিনী আপনি এসে খাঁচায় ঢুকেছ। মজা টের পাও এখন!

মুখ শুকনো করে ত্রিদিব বলে, সাত তারিখ হয়ে গেছে—এখনো মাইনে দিল না।

তা ঝুমাও কি হার মানবার মেয়ে!

বয়ে গেল না দিয়েছে। উনি টাকা দিলে তবে আমার সংসার চলবে! মাসের গোড়ায় মাইনে ওরা কবে দিয়ে থাকে?

দেয়ও কি পুরোপুরি? আজ দু-টাকা কাল পাঁচ টাকা—এমনি করে যদ্দুর যা হল। শেষটা জোড়হাত করবে, ডোনেশান দিয়ে দিন বাকিটা।

ঝুমা বলে, গরিব ইস্কুল—পেরে ওঠে না তা কি করবে?

কিন্তু আমাকেও সংসার করে খেতে হয়। বাতাস খেয়ে দিন কাটে না।

ঝুমা রাগ করে।

বাতাস খাওয়াই নাকি তোমায়? কেন অমন কুচ্ছো করবে আমার সংসারের?

তাই তো অবাক হয়ে যাই—কেমন করে এত যোড়শোপচার জোটাচ্ছ। কি মন্তোর জানো তুমি বলো।

এবারে হেসে উঠে ঝুমা বলে, মন্তোর বলতে নেই—তা হলে খাটে না। নিজের কাজ কর মাস্টার মশায়, ছেলেপুলের ট্রানশ্লেসনের ভুল কাটগে। আমার সংসারের কোন কথায় থাকবে না, এই বলে দিলাম।

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ। পান সেজে একটা খিলি ত্রিদিবের মুখে গুঁজে দিয়ে খরখর করে ঝুমা চলল রান্নাঘরের পাট সারতে।

অনেক রাত হল। এগারোটার গাড়ি চলে গেল, গুমগুম তার আওয়াজ আসে। ঝুমা একটি মানুষ খোলা দরজায় চোখের উপর দিয়ে এসে ঢুকল, তা দেখ—মাস্টার মশায়ের একেবারে হুঁশ নেই। ট্রানশ্লেসনের খাতাগুলো যথারীতি বাণ্ডিল বাঁধা আছে, এবং পড়েও থাকবে অনন্ত কাল। তাতে ঝুমা দোষ দেয় না—ফেল কড়ি, মাখ তেল—পয়সা যখন দেবে না, মানুষ অত খাটতে যাবে কেন? কিন্তু ঝুমা দেবী ঘরে এলো, মাছি-পিঁপড়ের সামিল মনে করবে তাকে? কথা না বলো, মুখ তুলে হাসিমুখে একটিবার তাকাতে কি দোষ ছিল?

ঝুমা এসেছে, খুটখাট করছে। চোখ না তুলেও ত্রিদিব টের পাচ্ছে সমস্ত। বিছানা ঝাড়ছে, ফুলদানির ফুলগুলো নামিয়ে জল ভরে আনল বাইরে গিয়ে। দেখছে সব, অথচ ত্রিদিব বই থেকে একটিবারও চোখ তোলেনি। হাই তুলছে ঝুমা বিছানার উপর বসে, জানলাটা উঠে ভাল করে খুলে দিয়ে এলো। স্বগতোক্তি করে, কী গরম!

আছে বসে বিছানায় চুপচাপ। জানলা দিয়ে বাইরে দেখছে। দেখছে কি জোনাকি? ঝাঁকড়া-ডাল বাদামগাছটা জোনাকিফুলে ভরে গেছে, তাই দেখছে বুঝি মগ্ন হয়ে!

হঠাৎ ঝুমা কথা বলে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন।

বইটা খুব ভাল বুঝি?

এর পর চুপ করে থাকলে ত্রিভুবন লণ্ডভণ্ড হবে। ঝুমার মুখে চেয়ে ত্রিদিব বলে, বড্ড ভালো—

হাসে। ঢোক গিলে একটি লাগসই কথা বলে এতক্ষণের অপরাধ মুছে ফেলতে চায়।

তুমি আরো ভালো ঝুমা। তোমার তুলনা নেই। লিখেছেও বইটায় তাই। দেহের রূপ দেখে অবাক হও, দেহের ভিতরের রূপ দেখে একেবারে পাগল হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের মধ্যে এ রোমান্স, কোথায় লাগে তার কাছে গল্প-উপন্যাস!

ঝুমা বলে, রক্ষে কর। সারাদিন খেটেখুটে রাত দুপুরে এখন

হাড়-মাংসের গল্প শুনতে পারিনে। চোখে আলো লেগে ঘুম হচ্ছে না।

ত্রিদিব বলতে পারে, শোওনি তো মোটে, ঘুম কি বসে বসেই হবে? কিন্তু কথা-কাটাকাটির সময় নয়, বইয়ে মন মজে আছে। তাজ্জব বই—বিজ্ঞানের নাম শুনে কেন যে ঘাবড়ে যায় লোকে! একখানা পুরানো পোস্টকার্ড গুঁজে দিল হেরিকেনের কাচে। বলে, এবারে চোখে লাগছে না—

এমন রাগ হয় মানুষটার উপর! হাসিও পায়। মুশকিল বোঝ তা হলে ঝুমার! এই অবুঝকে নিয়ে ঘর করা। শিশুর মতন, কিম্বা তারও বেশি। শিশুর দাপাদাপি ঘর-উঠান, বড় জোর এবাড়ি-ওবাড়ির মধ্যে। ত্রিদিব ছুটে বেরুবে তেপান্তরের পৃথিবীতে। গোয়ালাদের বাচ্চা ছেলে ছুটো সমস্তটা দিন, দেখতে পাও, নদীর চরে গাঙশালিকের ছানা খুঁজে বেড়াচ্ছে—ও তেমনি খোঁজে বিপুল বিশ্বশক্তির কোন এক অনায়ত্ত উৎস। ঐ তার দিনরাতের ভাবনা। কখনো মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে, কখনো বা রাগ করে গোঁ থামাতে হয়। না, ঝুমা তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে বছর খানেক এই সংসার করতে গিয়ে।

এর উপর ঠাট্টা আবার যখন তখন। পিছন দিনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

খাসা ছিলে ঝুমা, রাজহংসীর মতো নিজের দেমাকে ভেসে ভেসে বেড়াতে। বুদ্ধির ভুল, আটক পড়লে ঘর-উঠানের বেড়ার মধ্যে—

প্রথম সেই দেখলে তুমি। চৌধুরি-দীঘি পাড়ি দিচ্ছিলাম। এপার থেকে ওপার, ওপার থেকে আবার এপার-মুখো। পা-দাপাদাপি নয়, জল নড়ছে না একটুও—ভেসে ভেসে যাচ্ছি। দুপুর গড়িয়ে যায়। মা তারপর এসে পড়লেন। ভাল কথায় হয় না দেখে চেঁচামেচি লাগিয়েছেন। জলে পড়লে ডাঙার কথা কি কানে যায়—মা অন্য কাকে যেন কি বলছে, আমায় কিছু নয়। তুমি আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিলে—শঙ্কর-দা'র সঙ্গে গিয়ে উঠেছিলে তাদের বাড়ি। স্নানের

জন্ত দীঘির ঘাটে এসে দাঁড়ালে। হংসীর উপমা মনে গেঁথে গেল নাকি সেই থেকে ?

আরও কত বিছে, জানতে না, তোমার ঝুমার। যার যাতে আটকায়। ঝুমা, ঝুমি, ওরে ঝুমঝুমি, দেখ দিকি মা, মেয়েটার জ্বর এখন কত ?···বলিস কিরে, মাথা ধুইয়ে দেবো এই অবস্থায় ?

আর ডেকে বলারই অপেক্ষা রাখত কিনা সে !

পূজোর আগে সে আমলে এই গাঁয়ে যদি আসতে, শেষরাত্রে ঠিক ঘুম ভেঙে যেত। দমাদম ঢ্যা-কুচকুচ—ঢেঁকির পাড় পড়ছে বাড়ি বাড়ি। চিঁড়ে-কোটার ধুম। চিঁড়ে মজুত রাখতে হবে এসো-জন বসো-জন সকলের জন্য। ঝুমা চোখ মুছতে মুছতে ছুটে বেরুত।

সরো দিদি, আমি একটু পাড় দেব—

উঁহু, তুমি কেন ?

বলছি, দাও। পারবে আমার সঙ্গে গায়ের জোরে ?

তা সত্যি। সব মেয়ে-বউ একসঙ্গে হলেও অসুরটাকে এঁটে উঠা যাবে না। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে, তার চেয়ে আপসে ঢেঁকি থেকে নেমে যাওয়াই ভালো।

ঝুমা ভীমবিক্রমে পাড় দিচ্ছে। নিচে বসে এলে দিচ্ছিলেন শঙ্করের পিসি। তিনি বললেন, তুমি তো বাছা নাছোড়বান্দা হয়ে পড়। তোমার মা ভাবে, পাড়ার দশজনা ভুজুংভাজাং দিয়ে আহ্লাদি মেয়েকে খাটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ঝুমা বলে, ক্ষেপিও না বলছি পিসি। বেতালা পাড় পড়ে তোমার হাত ছেঁচে যাবে—

তা ও-মেয়ের পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। স্বচ্ছন্দে মনের সুখে হাত ছেঁচে দিতে পারে। ভয়ে ভয়ে বুড়ি আর দ্বিরুক্তি করে না।

ঘন্টাখানেক হয়তো চলল এমনি। মেয়েটার পায়ে ব্যথা ধরে না, ক্লান্তিও নেই। হঠাৎ কি হল—ঢেঁকিশাল থেকে এক লাফে নামল উঠানের উপর। এক ছুটে উধাও।

বাগিচার ভিতর কামরাঙা-গাছ—চলে গেছে সেখানে। ঢেঁকিশাল থেকেই অতদূর নজর গেছে। উপর-ডালে কিছু ফল আছে, নিচের দিককার সব লোপাট। কামরাঙা-লোভী কয়েকটা মেয়ে আঁকশি নিয়ে এসে জুটেছে। নানা রকম কসরৎ করছে, নিচের গুঁড়ি থেকে ডাল উঠেছে—সেই ডালে চড়েছে একজন। কিছুতে তবু নাগাল পায় না।

ঝুমা এসে ধাক্কা দেয় মেয়েটাকে। পড়ে যাবার ভয়ে দু-হাতে মেয়েটা ডাল জড়িয়ে ধরে। খিলখিল করে হাসে ঝুমা।

উঠে পড়্ ঐ দোডালার উপর। পা ঝুলিয়ে আরাম করে বসে আঁকশি ধর্।

মেয়েটা অনেক-উঁচু সেই জায়গার দিকে চেয়ে সভয়ে বলে, সর্বনাশ!

দেখ্ তবে—

কাঠবিড়ালি যেমন চলে বেড়ায়, তেমনি আলটপকা উঠে গেল ঝুমা। একেবারে মগডালে। আঁকশির ধার ধারে না, হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কামরাঙা ফেলছে। তলায় মেয়েগুলোর মধ্যে হুটোপাটি লেগে গেছে।

সেদিনটা তুমি চোখে দেখনি—রাজহংসীর সঙ্গে কাঠবিড়ালির উপমাও দিতে তবে নিশ্চয়।

কি রকমে টের পেয়ে অকুস্থলে মা এসে পড়লেন। এসে তিনি মাথা ভাঙছেন।

নেমে আয় হতভাগী। পড়ে হাত-পা ভাঙবি, ঠুঁটো-জগন্নাথ কেউ ঘরে নেবে না। কী যে করি, কোথায় তোকে গছিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি পাই!

মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, মেয়ের জ্বালায় এক তিল শান্তি ছিল না। বিয়ের পরে সেই ঝুমা আর একরকম। মা, তুমি দেখছ কি আকাশের পার থেকে, কিম্বা ঐ জোনাকি-ভরা বাদামগাছ-তলায় অদৃশ্য দাঁড়িয়ে? তোমার সে ডাকাত মেয়ে মরে গেছে, এ আর একজন। শান্ত চালচলন, কথা বলে এখন কত আস্তে—ত্রিদিব মাস্টারের বউয়ের প্রশংসায় পাড়ার মানুষ পঞ্চমুখ।

পড়ছে ত্রিদিব। হুঁশ নেই, রাত্রি কত হয়েছে। আছে এক গ্রামে পড়ে। ইস্কুলে তার সহকর্মীদের দিকে কৌতুক ও অনুকম্পার চোখে তাকায়। আহা, কতটুকু নিয়ে আছে এরা সংসারে, দৃষ্টি কত সঙ্কীর্ণ! অমুকের এক টাকা অধিক মাহিনা-বৃদ্ধি ঘটেছে, কিম্বা হেডমাস্টার অমুকচন্দ্রকে একঘণ্টার জন্য উঁচু ক্লাসে পড়াতে দিয়েছে—এই নিয়েও হিংসা। মানুষগুলোও তেমনি এই জায়গার। ঝুমার কাছে কখনো-সখনো পাড়ার বউ-গিন্নিরা এসে বসে, সেই সময়ের কথাবার্তা কিছু কিছু সে শুনেছে আড়াল থেকে। কি কি রান্না হল বউ—সজনে রেঁধেছ তো সরষে ফোড়ন দিলে না কেন? পাঁচীর শাশুড়ী কানবালা দিয়ে বউয়ের মুখ দেখেছে—ফাঁকিজুকি, ঐ মরাসোনা দু'দিনে দেখো রূপোর মতন সাদা হয়ে যাবে। পুরুষদের মধ্যে গিয়েও শোন, এক কাঠা বাড়তি জমি কে ঘিরে নিয়েছে কিম্বা কোন্ মেয়েটা হাসে ফ্যা-ফ্যা করে—এইসব আলোচনা। ত্রিদিব পঙ্গু হয়ে রয়েছে এই একটুখানি গাঁয়ে ঐ সমস্ত লোকের একজন হয়ে; হাত-পা বেঁধে কারাগারে রেখে দিয়েছে তাকে। বইয়ের মধ্যে মুক্তি পায়। এদেশ আর ওদেশ, একাল আর সেকালের মাঝে সেতু হল এই বই। জড়-পুতুলের মতো একটা চেয়ারে বসে আছে—মন ছুটে বেড়াচ্ছে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানীর সঙ্গে—বিশ্বের অপরিজ্ঞাত শক্তিপুঞ্জ লাগামে বেঁধে ফেলে হুকুমের নফর বানানো যাদের জীবনসাধনা। বিশ্বভুবনই বা কত ছোট ও সামান্য হয়ে গেছে আজ—প্রাচীন উপমা দিয়ে বলা যায়, হাতের মুঠোয় এক আমলকি। এ নিয়ে আর কুলাচ্ছে না মানুষের।

তারপর এক সময় আলো নিভিয়ে দিয়ে ঝুমার পাশটিতে সে শুয়ে পড়ে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে একবার।

ঝুমা তো ঘুমুচ্ছে বিভোর হয়ে। অনেকক্ষণ থেকেই ঘুমুচ্ছে—তবু ঝিনমিন করে চুড়ি বেজে উঠল, কোমল হাত এসে পড়ল ত্রিদিবের গায়ে।

জেগে আছ ঝুমা ?

তোমার নিশ্বাস পড়ল কেন তাই বলো ?

এমনি—

ঝুমা বলে, এমনি নয়—আমি জানি। আমি এক ভারবোঝা হয়েছি তোমার—আমি আনন্দ নই, দায়িত্ব।

তোমার কথা নয় ঝুমা। ভাবছিলাম, আরও একটা দিন মিছামিছি কেটে গেল, মৃত্যুর এক দিন কাছাকাছি এসে গেলাম।

জানি গো জানি— পাশে থেকেও তুমি অনেক দূরের। সমস্ত জানি। তবু অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিরস্ত হবার মেয়ে নয় ঝুমা। বই ছেড়ে শুয়ে পড়েছ—এবারে আমার। পুরোপুরি আমার তুমি। কোন চিন্তা মনে থাকবে না একমাত্র আমি ছাড়া। ঝুমা-ময় হয়ে থাক।

ঝুমা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ভালবাসার অতলে তলিয়ে গেল ত্রিদিব ঘোষ—ভাবনা-বেদনার অতীত লোকে। তার পৃথিবী এখন এই ঝুমা—ঝুমার চুড়িপরা নিটোল বাহু ছু'খানি···ঘন কালো মেঘের মতো ঝুমার আলুল চুল···মেঘের বুকে বিদ্যুতের মতো কথায় কথায় ঝুমার ঝিকমিকিয়ে হেসে ওঠা। রাতের অন্ধকারে ছু'জনে ওরা চেয়ে থাকে এ-ওর দিকে। চোখে নয়, মনের আলোয় দেখতে পাচ্ছে।

॥ দুই ॥

একদিন ঝুমা বলল, দেখ—হাসতে পারবে না কিন্তু। একটা কথা বলছি তোমায়।

কি ?

হাসলে দেখো কি করি।

ত্রিদিব বলে, এমন লোভ দেখাচ্ছ ঝুমা, হাসি না পেলেও যে হাসতে ইচ্ছে করছে।

ঝুমা অতএব ভূমিকা না বাড়িয়ে সোজাসুজি বলে, এত্ত ছাত্রের ট্রানস্লেসন দেখ। বোঝায় উপর শাকের আঁটি। আর একজনের ইংরেজি লেখা একটু দেখেশুনে দাও না।

ত্রিদিব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

না, না, কক্ষণো নয়। সন্ধ্যার পরে কয়েকটা মাত্র ঘণ্টা আমার নিজের আছে, কোন দামে তা বেচব না। রাতের ট্যুইশানি আমি নিতে পারব না।

বলতে বলতে থেমে যায় সহসা। আগুনে জল পড়ে। বলে, সংসার চালাতে পারছ না ঝুমা? তা সত্যি—যে ক'টা টাকা আসে, তাতে একজোড়া মুরগি পোষাই যায় না। এ তবু দু-দুটো মানুষ!

এবারে ঝুমার পালা।

সব কথায় ঘুরে ফিরে আমার ঘর-গৃহস্থালী নিয়ে আসবে কেন বল তো? সর্বক্ষণ যেন হাত পেতে বসে আছি। টাকা চেয়েছি আমি কোনদিন?

চাওনি, কিন্তু চোখ আছে আমার। সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে বিকেলবেলা একটুখানি অবসর, তখনও শক্তিসংঘের মেয়েগুলোর সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ-প্যারেড করা—

ঝুমা বলে, ক'টা করে টাকা দেয় বটে, কিন্তু টাকার জন্যে নয়। ও যে চিরকেলে স্বভাব আমার। শঙ্কর-দা ওঁদের বড় চিন্তা, মস্তবড় আদর্শ—আমার সে সব কিছু নয়। ঐ অছিলায় মেয়েগুলোর সঙ্গে হাত-পা খেলিয়ে একটু বাঁচি।

শঙ্করের প্রসঙ্গে ত্রিদিব হো-হো করে হেসে ওঠে।

ভারী ভারী কথা বলে বুঝি শঙ্কর? তোমায় শুদ্ধ তাক লাগিয়েছে—অন্তত কথা বলার ক্ষমতাটা আছে, মানতে হবে।

ঝুমা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, অমন বলতে নেই ঐ মানুষের সম্বন্ধে।

ত্রিদিব বলে, তিন-তিন বারেও পাশ করতে না পেরে সভাসমিতির চেয়ার-বেঞ্চি বয়ে বেড়াত, নেতারা বক্তৃতা করতে উঠলে পাখার বাতাস

করত। গাঁয়ে এসে—খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, একটা-কিছু নিয়ে তো থাকা চাই! সংঘ গড়ে তাই দশের মধ্যে হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছে। এই অবধি বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু ইদানীং আদর্শের বুলি কপচাচ্ছে—শঙ্করও হাফ-নেতা হয়ে পড়ল—এতে না হাসলে দম ফেটে মরে যাব যে!

ঝুমা বলে, পাশের কথা বলছ—পাশ করতে ও-মানুষের আটকায় নাকি? কিন্তু কলেজের বই পড়বার সময় কোথা?

গলা নামিয়ে বলে, দিন নেই, রাত নেই সর্বক্ষণ কাজ নিয়ে আছেন। দেশের মুক্তি ওঁর জীবন-সাধনা।

বটে! এস. ডি. ও. সাহেবকে বলে আসতে হবে তো এইবার সদরে গিয়ে।

ঝুমা বলে, খবরদার, ঠাট্টা করেও অমন কথা বোলো না। বড্ড ধড়পাকড় নানান দিকে।

ত্রিদিব বলে, শঙ্কর মিস্তিরকে তা বলে কেউ ধরতে যাচ্ছে না। লাঠি না হলে যে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, সে হল স্বদেশি সেনাপতি! এস. ডি. ও. শুনেও হেসে গড়িয়ে পড়বে। নিশ্চিন্ত হবে এদের দেশ-উদ্ধার সম্পর্কে।

তখন ঐ পর্যন্ত। ইস্কুলের পর ত্রিদিব বাসায় ফিরেছে। ঝুমা সংঘের কাজে বেরুবে এবার—সে-ও তৈরি। ত্রিদিবকে সামনে বসে খাবার খাইয়ে তবে সে সংঘে যায়। আজকে খাবারের প্লেট এবং সেই সঙ্গে ভারী ওজনের এক খাতা।

ত্রিদিব সভয়ে বলে, খাতায় কি? সংসারের হিসেব বোঝাতে এসেছ নাকি? ওরে বাবা!

মুখ নেড়ে অপরূপ ভঙ্গিতে ঝুমা বলে, উনি আমার হিসেব বুঝবেন—ভারি কিনা বুদ্ধি!

ত্রিদিব সায় দেয়, ঠিক তাই। একবর্ণ বুঝিনে। সত্তর টাকা আয়ে এক শ' টাকা খরচ করে মাসে মাসে পঁচিশ হিসাবে কেমন করে

জমানো যায়—এ অঙ্ক মাথায় ঢোকে না আমার। যাক গে, হিসেব-নিকেশ নয় যখন, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কি তবে ?

সেই যে বলেছিলাম—ট্রানশ্লেসন আছে কয়েক পাতা। একটু যদি চোখ বুলিয়ে যাও। খুব ভাল ছাত্রী আমি—মাস্টার মশায়ের নগদ মাইনে। কেমন চন্দ্রপুলি তৈরি করেছি সারা দুপুর বসে বসে। খেয়ে দেখ, ভাবছ কি ? খেয়ে বলতে হবে, কেমন হয়েছে।

চন্দ্রপুলি তো করেছ—তারও চেয়ে তাজ্জব করেছ···বাঃ বাঃ, চমৎকার !

ট্রানশ্লেসনের পাতা ওলটাচ্ছে আর তারিফ করছে উচ্ছ্বসিত ভাবে। ঝুমা লজ্জিত মৃদুস্বরে বলে, খেয়ে নাও দিকি আগে।

খুব ভাল হয়েছে, বাড়িয়ে বলছিনে। কদ্দিন এসব করছ, কিছু তো জানিনে।

সাড়ে-দশটায় বেরিয়ে যাও, কোন্ খবরটা রাখো তুমি? উঁহু, মন দিয়ে দেখছ না। তা হলে দাগ-টাগ দিতে নিশ্চয়।

দাগ দেবার জায়গা পাইনে যে ! খাসা ইংরেজি লিখেছ, আমি এমন পারিনে। ঝুমা, তোমার তুলনা নেই।

মুগ্ধ হয়ে দেখছে তাকে। এত পরিশ্রম, এমন অধ্যবসায়, এতখানি নিষ্ঠা—ঝুমার আর এক নতুন রূপ।

না, না, যাও···এ কি বল তো ?

এমন সুন্দর কাজ—পুরস্কার না পেলে ছাত্রীর স্ফূর্তি আসবে কেন ?

কিন্তু রাগের ভান করাটাও চলল না, হাততালি দিয়ে ঝুমা হেসে ওঠে। হাসির দমক সামলাতে সামলাতে বলে, একটুখানি পাউডার বুলিয়েছিলাম—তোমার ঠোঁটে-মুখে তা লেপটে নিলে। খাসা চেহারা খুলেছে, হি-হি-হি !

তারপর থেকে ঝুমাও ঘুমিয়ে পড়ে না রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর। ঘরের দুই প্রান্তে দুই হেরিকেন। এদিকে পড়ছে ত্রিদিব, ওদিকে পাতার পর পাতা ঝুমা ট্রানশ্লেসন লিখে যাচ্ছে। ঝুমা এ সময়টা পড়ে

না। তার ইস্কুল পাশের পড়া—শব্দ করে পড়তে হয়। ত্রিদিবের তাতে বিঘ্ন ঘটবে।

যে লোকে তুমি বিচরণ কর, তোমার ঝুমাও উঠে যাবে সেখানে। ভিন্ন এক জীবনে পড়ে থাকবার মেয়ে আমি নই। দু'জনে পাশাপাশি আমরা—দেহে যেমন, অন্তরে অন্তরেও তেমনি। ঝুমা দেবী কি আলাদা ত্রিদিব থেকে?

ইস্কুলে অবসর-ঘণ্টায় ত্রিদিব অবিরত চিঠি লেখে। সব মাস্টারের নজরে পড়েছে। তাই নিয়ে টীকা টিপ্পনীও চলে খুব।

থার্ড পণ্ডিত ঘাড় লম্বা করে দেখে নেবার চেষ্টা করেন। ইংরেজি চিঠির কি বুঝবেন তিনি! প্রশ্ন করলেন, চাকরির দরখাস্ত?

তা বই কি!

নিতান্ত মিথ্যাও নয়। জানাশোনা যে যেখানে আছে, ত্রিদিব চিঠি লিখে পরিচয় ঝালিয়ে নিচ্ছে। কাজের ব্যবস্থা যদি কেউ করে দিতে পারে, তুচ্ছ এই মাস্টারি জীবন থেকে মুক্তির কোন উপায়।

চিঠির জবাব কদাচিৎ আসে। তা-ও দু-চারি ছত্রের মধ্যে মোটা রকমের উপদেশ। দিনকাল অতিশয় খারাপ—তা-বড় তা-বড় লোকে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, বাজার-সরকারি কাজেও পাঁচ শ' গ্রাজুয়েটের দরখাস্ত। আছ কোথায় বাপু? মাসান্তে তবু যৎকিঞ্চিৎ আসছে—এই বা ক-জনের ভাগ্যে ঘটে! যা আছে তাইতে খুশি থাকো, দুরাকাঙ্ক্ষার শান্তি নেই……

থার্ড পণ্ডিত বলেন, যে ক'টি টাকা পাও, সবই দেখছি ডাকটিকিটে খরচা কর। দরখাস্ত বেয়ারিং-পোস্টে ছাড় এবার থেকে। নগদ পয়সার উপর দিয়ে গেল না—সেইটুকু মুনাফা।

ছেলে হবার পর ঝুমার পড়া-লেখা বন্ধ। মাংসের একটা দলা—বেঢপ গড়ন, ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছে অষ্টপ্রহর। জেগে উঠলে পিটপিট করে

তাকায়, অথবা কাঁদে ট্যা-ট্যা করে। ঝুমার উল্লাসের অবধি নেই এই বস্তু নিয়ে। দেমাকে ফেটে পড়ছে সে যেন। কখনো কখনো ত্রিদিবের কোলে দেয়, ছেলে কেঁদে ওঠে অমনি। লিকলিকে ঐ যন্ত্রের আওয়াজ দেখে অবাক হতে হয়। ঝুমার এত আদরের ছেলে—তাই মুখে কিছু বলা যায় না, সয়ে থাকতে হয় ছটো-পাঁচটা মিনিট। কাজের অজুহাতে তারপর কোল থেকে নামিয়ে দেয়—দিয়ে বেঁচে যায়। ছেলের উপর মানুষের দরদ—দরদ যে কিসে আসে, ত্রিদিব কিছুতে ভেবে পায় না।

দশ মাস এক বছর কেটে যায়। আশ্চর্য তো! সেই বেটপ বাচ্চা কোন্ সময় সুন্দর হয়েছে—কেমন তার ফুটফুটে চেহারা! ছধে-দাঁত বেরিয়েছে গোটা চারেক, সেই দাঁতের অহঙ্কারে বাঁচেন না, হাসির নামে দাঁত বের করে দেখানো হয় কথায় কথায়। থপথপ করে বেড়ায়—গায়ে এক কড়ার বল নেই, কিন্তু স্থির থাকবেনা এক মুহূর্ত। দিনের মধ্যে অমন বিশবার আছাড় খাবে। ছুটে যায় ত্রিদিব, ধরে তোলে। বকুনি দেয় কখনো সখনো।

বড্ড খারাপ হয়েছ তুমি খোকা। সর্বক্ষণ ছুষ্টুমি। পড়াশুনো-কাজকর্ম হবার জো নেই তোমার জন্য।

এক বছরের ছেলে কত যেন বোঝে! ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়ায়, চোখের পাতা কাঁপে ছ-একবার। কিন্তু ছুষ্টু কি কম! কান্নায় ত্রিদিব বিরক্ত হয়—তাই বুঝি কান্না সামলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মুহূর্তকাল। শেষে মুখ উঁচু করে তোলে। অর্থাৎ আদর কর। কম ছেলে—দোষ করবে, আবার আদর না কেড়ে ছাড়বে না।

রান্নার মধ্যে ঝুমা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। ত্রিদিব বললে, দেখ কি, মায়ের ছেলে একেবারে! থমথমে মুখ করে দাঁড়ানো হবে, অন্য মানুষের দোষঘাটের যেন অন্ত নেই। আদর ষোলআনা না হওয়া পর্যন্ত হাসি ফুটবে না।

ঝুমা বলে, হিমসিম হয়ে যাই একরত্তি ঐ দস্যি সামলাতে। আমার

আবার কিছু হবে! বই-খাতা তাকে তুলে দিয়েছি। ঘরে মন রয় না বাবুর, অহরহ পালাই-পালাই। পুরোপুরি বাপের স্বভাব। একটু বেসামাল হয়েছি তো পথ অবধি ধাওয়া করবেন।

ছোট্ট দু'টি ঠোঁট--ফুলের কুঁড়ির আদল আসে। নাম হয়েছে মুকুল। আধেক-ফোটা কী মিষ্টি কথা যে! আর কী বুদ্ধি! ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে কথা শুনতে ইচ্ছে করে।

নাম কি তোমার?

মুম্ম—

মুখখানি সূঁচাল করে শেষ অক্ষরে অদ্ভুত রকম জোর দিয়ে বলে অপরূপ ভঙ্গিতে। না হেসে পারা যায় না। হাসিতে কি শোধ যায়, কোলে তুলে নাচাতে হয় খানিকক্ষণ। নয় তো তৃপ্তি লাগে না।

আচ্ছা মুম্ম বাবু, ভয় দিয়ে দাও তো এবার।

এক কলের পুতুল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাঁশির আওয়াজের মতো—আ-আ—আ—

বড্ড ভয় পেয়েছি। আর নয়, আর নয়,। কোথায় লুকুই যে এখন! কোন তক্তপোশের তলায়, কোন পিঁপড়ের গর্তে!

বাপের ভাবে-ভঙ্গিমায় মুকুল খিলখিল করে হাসে। ঝুমাকে দেখিয়ে ত্রিদিব বলে, কে বল দিকি?

ঝুম্মা—

দেখ, সব জানে ছেলে। কেমন তোমার নাম ধরে বলে দিল।

ঝুমা বলে, ছোট্ট বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। তিনিই ফিরে এলেন। বাপে মেয়ের নাম ধরবে ছাড়া কি!

ত্রিদিব বলে, ঝুমা বড় দুষ্টু হয়েছে—যখন তখন দুঃখের কথা তোলে। ঝুমাকে মেরে দাও মুকুল।

কলের পুতুল টলতে টলতে গিয়ে মায়ের কোলে ঝুপ করে বসে পড়ল, তুলতুলে হাতখানি তুলে তার গালে ঠেকায়।

ঝুমা পুলক ভরা কণ্ঠে বলে, মারছ তুমি আমায়? নাওয়াই-

খাওয়াই, কোলে তুলে নাচাই—আর তুমি পরশুরাম পিতৃআজ্ঞা পেয়েছ, তবে আর কি।

তখন ত্রিদিব সদয় কণ্ঠে বলে, ঝুমা কাঁদছে তুমি মেরেছ বলে। আদর করে দাও মুকুল।

ছেলে আদর করবে তো একটু-আধটু নয়। উঠে দাঁড়িয়ে মুখখানা কোমল ভাবে ছোঁয়াল মায়ের গালে। এক গালে হবে না—মুখ ঘুরিয়ে ধরে ও-গালেও দিল স্পর্শ! তারপর বাপের কাছে গিয়ে তাকেও ঐ রকম।

ত্রিদিব জড়িয়ে বুকে তুলে বারম্বার চুমা খাচ্ছে। এতখানি মুকুলের পছন্দ নয়—হাত-পা ছুড়ছে, মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে প্রবল-ভাবে। ছটোপুটি করে ত্রিদিবের কোল থেকে সে নেমে দাঁড়াল।

আঙুল দিয়ে মাকে দেখিয়ে দেয়, আধো-আধো সুরে বলে, বাবা—ঝুম্মা—আদো—

অর্থাৎ তার যথেষ্ট হয়েছে, মাকে আদর করো এবার।

হেসে উঠে ত্রিদিব বলল, ছেলে কি বলে শুনছ? পিতৃভক্ত ছেলে—আমার সব কথা শোনে, ওর কথাটাও আমার রাখা উচিত। কি বল?

আনন্দে আত্মহারা ঝুমা হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়।

যাও—

ইস্কুলে যেতে হেডমাস্টার একখানা খামের চিঠি হাতে দিলেন। শেখরনাথ তবে জবাব দিয়েছে চিঠির। শেখরনাথের চিঠি—খাম-কাগজ অতএব অসাধারণ হবেই। কলেজি বন্ধুদের মধ্যে শেখরের বরাতই ভালো সকলের চেয়ে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে বিয়ে করে রাজার হালে আছে। বউকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মাসে মাসে নিয়মিত বাড়িভাড়ার টাকা আসে হাজার কয়েক; পা নামক একটি অঙ্গ আছে—গাড়ি চড়ে চড়ে প্রায় সে তা ভুলে যেতে বসেছে। কিন্তু এ

সব কারণে নয়—বউ-অন্তপ্রাণ সে বিয়ের সময় থেকেই, যখন তার শ্যালক জীবিত ছিল, এত সম্পত্তি হাতে আসবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। মঞ্জু, মঞ্জুলা, মঞ্জুভাষিণী, মঞ্জুলেখা—কত রকম সম্বোধন করে চিঠি দিত বউকে। অভিন্নহৃদয় বন্ধু ত্রিদিব, সে দেখেছে অনেক প্রেমপত্র। শেখরনাথই দেখাত।

এমন বন্ধুর কাছে ছোট হয়ে দায় জানানো ঠিক হবে কি না—ত্রিদিব অনেক ইতস্তত করেছে। নিরুপায় হয়ে অবশেষে লিখেছিল! জবাব সে নিশ্চয় দেবে, এবং সাধ্যমতো করবেও। কিন্তু মান খুইয়ে তার কাছে সাহায্য নিতে হচ্ছে, এই বড় দুঃখ।

জবাব পড়ে কিন্তু মন রি-রি করে জ্বলে। ক্লাসে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, পড়াবার অবস্থা নেই। টাকা হয়ে শেখর তুমি এমনি হয়ে গেছ! তোমার ত্রিসীমানায় যাবে না ত্রিদিব। ঐ চিঠি ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেও বুঝি তৃপ্তি হবে না···উঁহু, ছিঁড়ে ফেলবে না চিঠি ঝোঁকের মাথায়। লেকপাড়ায় নতুন বাড়ি করেছে, তার ঠিকানা রয়েছে। মর্মঘাতী একখানা চিঠি দেবে ঐ ঠিকানায়—কলমের আগায় যত গালিগালাজ আসে। চিঠিটা রেখে দেওয়ার দরকার, বড়লোক হয়ে শেখর যে কেমন হয়ে গেছে, তার বিচিত্র পরিচয়। আর যা-ই হোক, টাকা কখনো যেন না হয় ত্রিদিবের।

সেই রাত্রে। বই বন্ধ করে ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। মাথায় কিছু যাচ্ছে না, এমন পড়ায় লাভ কি? হেরিকেনের ক্ষীণ আলো পড়েছে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন মা আর ছেলে দু'টি মুখের উপর। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে বিলীন হয়ে আছে মুকুল।

ত্রিদিব দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। বিনুনি করবার সময় নেই ইদানীং ঝুমার—বিস্রস্ত চুলের বোঝা শিয়র আচ্ছন্ন করে আছে। ক্লান্তির সুস্পষ্ট রেখা মুখে। সারা দিনের এত কর্তৃত্ব ও খবরদারি এখন এই রাত্রিবেলা বাহারের পোশাকের মতো খসে গিয়ে এক করুণ অসহায়তা

ফুটে বেরিয়েছে মনোরম দেহভঙ্গিমায়। বাইরে যাবে ত্রিদিব—কিন্তু পা আটকে গেছে যেন মেজের সঙ্গে। কোন অপরিচিতা রূপসীকে দেখছে সে এখন, দেখে দেখে কূল পায় না। দিনমানে যে কর্মচঞ্চলাকে দেখে থাকে, সে নয়—এ হল এক নতুন মানুষ। সেই যে তখন মুকুল কি বলছিল—নিশুতি রাতে ঝুমারও অজান্তে ছেলের সেই কথাটা রাখতে বড় লোভ হয়।

ঝিঁঝি ডাকছে—ঘর-কানাচে কালকাশুন্দের জঙ্গলে কোন সখীর দল ঘুঙুর বাজিয়ে ভারি নাচ লাগিয়েছে রে! শিয়াল ডেকে ডেকে প্রহর জানাল। কুয়োপাখী একটানা ডেকে চলেছে তেঁতুল-ডালে বসে। বাদুড়ের ঝাঁক দেবদারু-ফল খেয়ে উড়ছে এদিক-ওদিক। হাওয়া আসে বাঁওড়ের দিক থেকে—গুমট ভেঙে ঠাণ্ডা জোলো হাত সর্বাঙ্গে কে বুলিয়ে দেয়।

বাঁধনের উপর বাঁধন পড়ে যাচ্ছে ত্রিদিবনাথের। ঝুমা ছিল, আবার এই মুকুল। টলতে টলতে এগিয়ে এসে কচি হাত আগলে দাঁড়াবে, পালাতে পার দেখি কেমন! দিনের বেলা মাস্টারি, রাতের ক'ঘণ্টা ছিল তোমার নিজের···এখনই যে লোকের বাড়ি বাড়ি ফিরি করতে হবে রাত্তের ট্যুইশানি একটা জোটে কিনা! নয়তো কষ্ট পাবে মুকুল—তার দুধের কমতি হবে, জুতো-মোজা হবে না। ঝুমা মুখ ভারি করবে—নিজের জন্য কিছু বলে না, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে তিলেক ত্রুটি ঘটলে ক্ষেপে যায়।

কলকাতা থেকে মাসে মাসে বই আনানো শেষ এইবার। ভাল করে বেঁধেছেঁদে কাগজে মোড়ক করে বই বরঞ্চ তাকে তুলে দাও। বেচতে পারলে যা-হোক কিছু উশুল হত। কিন্তু এখানে কিনবে কে? ইস্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়া বাজে বইর এখানে খদ্দের নেই।

জোর বাতাস উঠল। জানলার কবাট ঠকাস করে ঘা মারল দেয়ালে। বাঁশবাগান ক্যাঁচকোঁচ করে ওঠে, সুপারিগাছ বিষম বেগে

মাথা দোলায়। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—নিঃসীম জ্যোতির্লোককে ধরিত্রী দোল খাচ্ছে যেন উন্মাদের মতো।

। তিন ।

ঝুমা দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে। ফ্রেমে-বাঁধানো এক ছবি। গাছের ফাঁক দিয়ে নতুন রোদের কুচি পড়েছে এখানে-ওখানে। দু'টি হাত ঝুমা চৌকাঠের দু-দিকে রেখে একটু কাত হয়ে আছে ত্রিদিবের দিকে চেয়ে। যেতে যেতে ত্রিদিব পিছন তাকিয়ে দেখে বার বার। থমকে দাঁড়ায়। না দাঁড়িয়ে পারা যায়?

বেশি দিন নয় ঝুমা। তোমাদের নিয়ে যাবো একটু-কিছু সুবিধা হলেই। সুবিধা না হলে ফিরেই তো আসছি। বিচ্ছেদ ক'দিনেরই বা! ইস্কুলের এ আমার পাকা চাকরি। আজ দু'টাকা, কাল পাঁচ-সিকে—এমন মাইনেয় কার পোষাবে? মায়ামন্ত্র-জানা ঝুমা নেই তো তাদের! এ মাস্টারি আর কেউ নিচ্ছে না। কলকাতায় যাচ্ছি—দেখে আসি একটুখানি বাইরের পৃথিবী।

এমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা চলবে না। দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে যে দেখবে, ঝুমার কৌতুক-চঞ্চল চোখ দুটোয় কেমন করে বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসে, তার উপায় নেই। ভয় করে। ডাকাত জেগে উঠবে এখনই। এক বছুরে ডাকাত। কিন্তু কি শক্তি এক বছরের কচি হাতদুটোয়! ত্রিদিব রোগা অশক্ত নয়। ঝুমা তো পালোয়ান মেয়ে। কিন্তু মা-বাপের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে মুকুল। জড়িয়ে ধরলে সাধ্য কি সেই বন্ধন ছাড়িয়ে চলে যাবে। ঝুমার চেয়ে বেশি ভয় মুকুলকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি চল, পা চালিয়ে চল হে ত্রিদিবনাথ।

শহর কলকাতা। মানুষ গিজগিজ করছে। সভ্য মানুষ, সুন্দর মানুষ—কিন্তু মনের দোসর মানুষ নেই। বড় বড় অট্টালিকা ভ্রূকুটি-

কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে। একটা গাছ পাওয়া যায় না, যার ছায়ায় একটুখানি বসি।

সহপাঠী ও পুরানো বন্ধুরা আছে। কিন্তু ভয় করে শেখরনাথের সেই চিঠি পাবার পর থেকে। কার কোন্ মূর্তি হয়েছে ঠিক কি! যেমন খুশি হোক গে—ত্রিদিব তা জানতে চায় না। মরে গেলেও সে চেনাজানা কারো কাছে যাচ্ছে না।

অতএব চৌরঙ্গির হোটেলে উঠল। এটা নতুন এক রাজ্য—তার পুরানো কলকাতা থেকে একেবারে আলাদা একতলায় বড় বড় হল—লাউঞ্জ, অফিস, খানাঘর, বার, বিলিয়ার্ড-রুম···। দোতলা থেকে ছ'তলা অবধি ছোট্ট ছোট্ট অগুন্তি খোপ। মৌচাকের উপমা মনে আসে। তারই একটা খোপ নিয়ে সে আছে।

হপ্তা দুই কাটল। তার পরে প্রয়োজন হল মনিব্যাগ উপুড় করে গণে দেখবার। অবস্থাটা এখন ভাল করে ভেবে দেখতে হয়। সার্ট-ট্রাউসার বাক্সবন্দি করে ফেলে অঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি চাপাবে নাকি? উঁহু, দেখাই যাক। দেখতে যাবে কোথায় বা! সেই সনাতন মেস—চার বছর আগে একদিন যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে।

গলির গলি তস্য গলিতে মেস—বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। বিস্তর বস্তি ছিল—বস্তি ভেঙে এখন বড় বড় বাড়ি। রাস্তার নতুন চেহারা হয়েছে। সত্যই সেই গলিটা কিনা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠাহর করে নিতে হয়। মেসবাড়ি কিন্তু সেই যা দেখে গিয়েছিল, অবিকল সেই বস্তু। সব যায়গায় ইলেকট্রিক আলো, শুধু ঐ বাড়িতে নয়। যেন অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে আছে, নতুন শহরকে এই বাড়ির ভিতর নাক গলাতে দেবে না।

ছয় সিটের বড় ঘরে হেরিকেনের আলোয় তাস চলছে। বাকি ঘরগুলো অন্ধকার। সেকালেও ঠিক এমনি ছিল। মানুষ রয়েছে কিন্তু ঐ-সব অন্ধকার ঘরে—শুয়ে আছে, শুয়ে শুয়ে গল্প করছে অথবা

কেরোসিন না পুড়িয়ে। দেয়ালের ভাঙাচুরো জায়গাগুলোয় আস্ত বালির জমাট ধরানো হয়নি, চুনের একটা পোঁচ টানা হয়নি বাড়ি তৈরির পরে। হোলির দিনে সেবার মানুষ তাক করে পিচকারি মারতে গিয়ে একটা জায়গায় রং লেগে গিয়েছিল—সেই চিহ্ন অবধি নজরে আসছে। মানুষগুলোও সে আমলের। আশুবাবু, তারিণীবাবু, সতীশবাবু…আরে, বিশুই তো! তখন কলেজে পড়ত—এই আড্ডায় সকলের সঙ্গে সমস্বরে যখন স্নাম হাঁকছে, বিশুও তবে ইতিমধ্যে কোন অফিসে ঢুকে পড়েছে।

দরজার সামনে ছায়ামূর্তির মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে, কিন্তু ঘরের মানুষদের ফুরসত নেই বাইরে তাকিয়ে দেখবার। ত্রিদিব একবার ভাবল যাই ফিরে যেমন এসেছি চুপিচুপি। এমন সময় খড়ম খটখট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন জংবাহাদুর অর্থাৎ ভুজঙ্গ বাড়ুয্যে।

জংবাহাদুরও, দেখা যাচ্ছে, অফিসের কাপড় ছেড়ে কোমরে চেক-কাটা লুঙি বেড় দিয়ে ডাবা-হুঁকো টানতে টানতে সেই সে-আমলের মতো উপরে নিচে ঘুরে বেড়ান। খবরের কাগজে চাকরি করতেন ভদ্রলোক, এখনো হয়তো তাই। আগেকার মতোই প্রতি ঘরে ঢুকে খবরবাদ নেন, কার শরীর কি রকম, চিঠিপত্র এল কিনা—বাড়ির কে কেমন আছে?—বড়বাবু গোলমাল করেছে শুনে সদুপদেশ ছাড়েন, গঙ্গার ইলিশ ও ল্যাংড়া-আম হুজুরে পৌঁছে দিয়ে আসতে। এরই মধ্যে একবার বা রান্নাঘরে ঢুকে চাটনিতে কিসমিস দেবার তালিম দিয়ে এলেন ঠাকুরকে।

ত্রিদিবকে দেখে জংবাহাদুর হৈ-হৈ করে উঠলেন, পথ ভুলে নাকি ভায়া? গোঁ ভরে সেই বেরিয়ে পড়লে, রোজই তারপরে খবরের কাগজ খুঁজি—রাজা-উজির কি হয়েছ না জানি এদ্দিনে। আছ কোথায় আজকাল?

পরিপাটি পোশাকের দিকে বারম্বার দৃষ্টি দিচ্ছেন। আর কেউ হলে কথাগুলো ব্যঙ্গ বলে ভাবা যেতো, কিন্তু জংবাহাদুরের সঙ্গে

কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে। একটা গাছ পাওয়া যায় না, যার ছায়ায় একটুখানি বসি।

সহপাঠী ও পুরানো বন্ধুরা আছে। কিন্তু ভয় করে শেখরনাথের সেই চিঠি পাবার পর থেকে। কার কোন্ মূর্তি হয়েছে ঠিক কি! যেমন খুশি হোক গে—ত্রিদিব তা জানতে চায় না। মরে গেলেও সে চেনাজানা কারো কাছে যাচ্ছে না।

অতএব চৌরঙ্গির হোটেলে উঠল। এটা নতুন এক রাজ্য—তার পুরানো কলকাতা থেকে একেবারে আলাদা একতলায় বড় বড় হল—লাউঞ্জ, অফিস, খানাঘর, বার, বিলিয়ার্ড-রুম···। দোতলা থেকে ছ'তলা অবধি ছোট্ট ছোট্ট অগুন্তি খোপ। মৌচাকের উপমা মনে আসে। তারই একটা খোপ নিয়ে সে আছে।

হপ্তা দুই কাটল। তার পরে প্রয়োজন হল মনিব্যাগ উপুড় করে গণে দেখবার। অবস্থাটা এখন ভাল করে ভেবে দেখতে হয়। সার্ট-ট্রাউসার বাক্সবন্দি করে ফেলে অঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি চাপাবে নাকি? উঁহু, দেখাই যাক। দেখতে যাবে কোথায় বা! সেই সনাতন মেস—চার বছর আগে একদিন যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে।

গলির গলি তস্য গলিতে মেস—বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। বিস্তর বস্তি ছিল—বস্তি ভেঙে এখন বড় বড় বাড়ি। রাস্তার নতুন চেহারা হয়েছে। সতাই সেই গলিটা কিনা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠাহর করে নিতে হয়। মেসবাড়ি কিন্তু সেই যা দেখে গিয়েছিল, অবিকল সেই বস্তু। সব যায়গায় ইলেকট্রিক আলো, শুধু ঐ বাড়িতে নয়। যেন অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে আছে, নতুন শহরকে এই বাড়ির ভিতর নাক গলাতে দেবে না।

ছয় সিটের বড় ঘরে হেরিকেনের আলোয় তাস চলছে। বাকি ঘরগুলো অন্ধকার। সেকালেও ঠিক এমনি ছিল। মানুষ রয়েছে কিন্তু ঐ-সব অন্ধকার ঘরে—শুয়ে আছে, শুয়ে শুয়ে গল্প করছে অথবা

কেরোসিন না পুড়িয়ে। দেয়ালের ভাঙাচুরো জায়গাগুলোয় আর বালির জমাট ধরানো হয়নি, চুনের একটা পোঁচ টানা হয়নি বাড়ি তৈরির পরে। হোলির দিনে সেবার মানুষ তাক করে পিচকারি মারতে গিয়ে একটা জায়গায় রং লেগে গিয়েছিল—সেই চিহ্ন অবধি নজরে আসছে। মানুষগুলোও সে আমলের। আশুবাবু, তারিণীবাবু, সতীশবাবু…আরে, বিনুই তো! তখন কলেজে পড়ত—এই আড্ডায় সকলের সঙ্গে সমস্বরে যখন গ্লাম হাঁকছে, বিনুও তবে ইতিমধ্যে কোন অফিসে ঢুকে পড়েছে।

দরজার সামনে ছায়ামূর্তির মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে, কিন্তু ঘরের মানুষদের ফুরসত নেই বাইরে তাকিয়ে দেখবার। ত্রিদিব একবার ভাবল যাই ফিরে যেমন এসেছি চুপিচুপি। এমন সময় খড়ম খটখট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন জংবাহাদুর অর্থাৎ ভুজঙ্গ বাড়ুয্যে।

জংবাহাদুরও, দেখা যাচ্ছে, অফিসের কাপড় ছেড়ে কোমরে চেক-কাটা লুঙি বেড় দিয়ে ডাবা-হুঁকো টানতে টানতে সেই সে-আমলের মতো উপরে নিচে ঘুরে বেড়ান। খবরের কাগজে চাকরি করতেন ভদ্রলোক, এখনো হয়তো তাই। আগেকার মতোই প্রতি ঘরে ঢুকে খবরবাদ নেন, কার শরীর কি রকম, চিঠিপত্র এল কিনা—বাড়ির কে কেমন আছে?—বড়বাবু গোলমাল করেছে শুনে সদুপদেশ ছাড়েন, গঙ্গার ইলিশ ও ল্যাংড়া-আম হুজুরে পৌঁছে দিয়ে আসতে। এরই মধ্যে একবার বা রান্নাঘরে ঢুকে চাটনিতে কিসমিস দেবার তালিম দিয়ে এলেন ঠাকুরকে।

ত্রিদিবকে দেখে জংবাহাদুর হৈ-হৈ করে উঠলেন, পথ ভুলে নাকি ভায়া? গোঁ ভরে সেই বেরিয়ে পড়লে, রোজই তারপরে খবরের কাগজ খুঁজি—রাজা-উজির কি হয়েছ না জানি এদ্দিনে! আছ কোথায় আজকাল?

পরিপাটি পোশাকের দিকে বারম্বার দৃষ্টি দিচ্ছেন। আর কেউ হলে কথাগুলো ব্যঙ্গ বলে ভাবা যেতো, কিন্তু জংবাহাদুরের সঙ্গে

অক্ষত সে থেকে গেছে। নিজের সম্বন্ধে ত্রিদিবের যে ধারণা—তিনিও ত্রিদিবকে ঠিক তেমনি কেষ্টবিষ্টু ভেবে আসছেন বরাবর।

খেয়ে যাবে ভায়া, এখান থেকে—

আপসে নিমন্ত্রণ জুটে গেল। দয়াময় তুমি ভগবান। তা বলে এক কথায় হাঁ বলা যায় না। ঘাড় নেড়ে সে বলে, আজ থাক। ডিনার সেরে তবে তো এসেছি।

জংবাহাদুর জোর দিয়ে বললেন, আজকেই। খেয়ে এসেছ তো আবার খাবে। ফিস্টি আজ আমাদের। মাংস আর ইয়া-ইয়া গলদা-চিংড়ি—

ত্রিদিব বলে, আবার এক মুশকিল। দশটায় হোটেলের দরজা দিয়ে দেয়। বিষম চুরি হয়ে গেছে এর মধ্যে কিনা!

তা এখানেই থেকে যাবে, এটা কিছু জঙ্গল নয় ভায়া। ঘরবাড়ি বটে—মানুষজন থাকে। ছিলেও তুমি কতদিন। তবে আলাদা সিট দিতে পারব না। সিট খালি নেই। একটা রাতের মামলা—আমার সিটেই জড়াজড়ি করে দু-ভায়ে থাকব।

হাঁক দিয়ে বললেন, ঠাকুর মশায়, ফ্রেণ্ড আছে আমার।

ঠাকুর গজর-গজর করে, রাত দুপুরে ফ্রেণ্ড—এখন আবার ভাত চড়াব নাকি? মাছও গোণাগুণতি।

জং বাড়ুয্যের সঙ্গে চোপা করবে না বার দিগর। চাকরি থাকবে না ঠাকুর—এই একটা কথা বলে দিলাম। মাছ না থাকে, আমার ভাগের মাছ দিয়ে দিও ফ্রেণ্ডকে।

হঠাৎ হুঙ্কার থামিয়ে নরম সুরে বললেন, রামা-শ্যামা নয়, এক-ডাকে-চেনা মানুষ। এই মেসে থাকতেন। চারটে মেস আছে আমাদের রাস্তায়—আর কোন মেস বুক চিতিয়ে এমন গরব করতে পারে! শুধু বড় হয়েছেন তা নয়—বড় হওয়ার পরও খেয়ে যাচ্ছেন আজ এখানে। রাত্রিবাস করতেও রাজি।

ইতিমধ্যে অনেকেই বেরিয়ে এসেছেন ভূতপূর্ব মেম্বার এক-ডাকে-

চেনা মানুষটাকে দেখতে। বড় যে হয়েছে, বেশভূষাতেই মালুম। ঠাকুরও শিলের হলুদ-বাটা নেবার অজুহাতে বাইরে এসে আর নড়ে না —ফ্রেণ্ডের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে। নড়বড়ে এই ভাঙা বাড়িতে হেন পোশাকের মানুষ এই প্রথম ঢুকল।

জাঁক করেছেন জংবাহাদুর, কিন্তু ত্রিদিবের হালফিলের খবর তাঁরও জানা নেই। কথাটা মনে হল তাঁর। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি করা হয় ভায়ার আজকাল ?

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে পড়েছি।

ঠোঁটের আগায় যা এসে গেল। নামটা ঘর-ব্যাভারি নয়, অতএব শক্ত ব্যাপার হবে কোন-কিছু। এমন অদ্ভুত কর্মের মধ্যে থেকেও মানুষটা আর দশজনের পাশাপাশি মেজেয় বসে খাচ্ছে—সকলের বড় চিংড়িটা তার পাতেই পড়ল অতএব।

সকালবেলা ত্রিদিব বলে, সেই সব পুরানো দিন মনে আসে জং-বাহাদুর। কী আনন্দে যে ছিলাম!

আনন্দে এখনো থাকা যায়। রুখছে কে ? মনে চাইলেই হল।

বললেন যে সিট খালি নেই।

আমার সিট আছে। আপাতত এক সিটে চলুক। খাটে কাল অসুবিধা হচ্ছিল, খাট ছাতে বের করে দিচ্ছি। মেজেয় শোব দু-ভাই, তা হলে পড়ে যাবার ভয় নেই।

ঠাকুরকে ডেকে বললেন, ত্রিদিববাবু খাবেন। আজকে ফ্রেণ্ড নয়। ম্যানেজারকে বল, নামপত্তন করে নিতে। আমিই গিয়ে বলছি। নাম লিখিয়ে দিয়ে এসে বাজারে যাব। পাঁচটা টাকা দাও দিকি ভায়া অ্যাডভান্সের দরুন।

পাঁচ-টাকা দশ-টাকা এখনো দেওয়া চলে অক্লেশে। কিন্তু জোর লাগাও ত্রিদিবনাথ। টেলিফোনের গাইড দেখে ফর্দ করে ফেল, কোথায় কি সুবিধা হতে পারে। এক-একটা রাস্তা সারা করে ফেল এক-এক দিনে।

ল্যাবরেটারি চাই একটা। পুঁথিপত্র পড়ে এবং হিসাব কষে যা পাচ্ছে, সেই বস্তু পরখ করে দেখতে চায় হাতে-কলমে। মিথ্যা নয়, দিনের আলোর মতোই সত্য—পরখ করবার প্রতিটি প্রক্রিয়ার মধ্যে কি ঘটবে সমস্ত সে জানে। কিন্তু আপাতত ত্রিদিবনাথ তুচ্ছ এক মানুষ, লক্ষ কোটির একজন—কে দেবে তাকে সুযোগ? এতদিনে যা ঘোরাঘুরিটা হয়েছে, যোগ করলে পায়ে হেঁটেই তো রাদারফোর্ড-চাডউইকের কাছ বরাবর পৌঁছান যেত। অথচ আমল পাচ্ছে না কোথাও। বাজার-সরকারি বা কেরানিগিরির প্রার্থী নয়—তার প্রস্তাব বোঝেই বা ক'টা লোকে? মুখ তুলে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, হয়তো বা মনে মনে পাগল ঠাওরায়। বোঝে যারা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে নানান কথা শোনে—শুনে নিয়ে তারপর বিদায় করে দেয়। বটেই তো! ওঁরা ঐ কয়েকটি বিজ্ঞানবিশারদ আসর জমিয়ে আছেন—তার মধ্যে আর একটি এসে মাথা তুলতে চায়, কোন্ মূর্খ হেন ব্যাপার বরদাস্ত করবে?

কিন্তু ফিরে যাওয়া হবে না মুখ ভোঁতা করে। কিছুতে নয়। না হয় শহরের পাথুরে রাস্তায় মুখ থুবড়ে মরে থাকবে কোন এক অবসন্ন দুপুরে। কীটপতঙ্গ প্রতি মুহূর্তে কতই তো মরছে! ঝুমা আর মুকুল অনেক দূরের—মনে হচ্ছে আর এক জীবনে ছিল তারা।

॥ চার ॥

জংবাহাদুর একদিন কড়া হয়ে বললেন, এত যে ভারী ভারী কাজ-কর্ম—তা মাংনা খেটে মরছ নাকি? দেয়-থোয় কি?

ত্রিদিব ভরসা দিয়ে বলে, দেবে। দিতে শুরু করলে তখন লাখে লাখ—

ধারে কারবার? তা দশ টাকা বিশ টাকা নগদ ছাড়ুক না আপাতত। লাখ থেকে সেটা তখন বাদ দিয়ে দেবে। ম্যানেজার মুখ

কালো করছে—আমাকেও তাই মিথ্যুক-ধাপ্পাবাজ বলছে তোমার সঙ্গে সঙ্গে।

অর্থাৎ শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজছে না আর। টাকার দরকার। লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা মানুষে রোজগার করে, আমোদে-ফুর্তিতে দু-হাতে উড়ায়,—আর ত্রিভুবনের সব চেয়ে সস্তা মেসে নানান কথা শুনতে হচ্ছে দু-বেলা দু'টি পেটে খাওয়ার খরচা দিতে না পারায়। কথা শুনিয়েই যদি দেনা শোধ হয়ে যেত, ত্রিদিব তাতে গররাজি নয়। মানুষের মুখ তো—আজ যাকে থুতু দিচ্ছে, কালকেই করণাধারার মতো চাটুবাক্যে অভিষেক করবে তাকে। সে কিছু নয়। কিন্তু ম্যানেজারের মেজাজ উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে—যা গতিক, শেষ অবধি গলদেশে হস্তার্পণ না ঘটে! যাবে কোন্‌খানে তা হলে? মুফতে খেতে দেবে, পাপ কলিযুগে এমন গুণগ্রাহী কে? টাকা আয়ের পথ কেউ বাতলে দিতে পার? ধর্মাধর্মের কথা ছেড়ে দাও—যীশুকেই তো পেরেক ঠুকে মেরেছিল অধর্মাচারী বলে। বোকারাই ভেঙে পড়ে ধর্ম-অধর্মের নাম শুনে। কিন্তু মুশকিল হল, দুস্তর জন-সমুদ্রের মাঝে কোথায় যে চর—কিছুতে সে ধরতে পারে না। ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, ভর দিয়ে দাঁড়াবার জায়গাটা নিশানা করতে পারে না।

বিষম ঘুরছে। একটা কিছু জোটাবেই। খবরের কাগজের অফিস দেখে থমকে দাঁড়াল। দরজার উপর বোর্ড টাঙানো—'চাকরি খালি নাই'। ক্ষেতে ক্ষেতে যেমন শিয়াল তাড়ায় চুন-মাখানো খোলা-হাঁড়ি টাঙিয়ে দিয়ে। তা হোক—চাকরি নয়, অনেক বেশি জরুরি কাজ এখানে।

সেই কখন থেকে বসে আছে কাগজের অফিসে। নিষ্কর্মা আছে বসে পাখার তলে। আমেরিকার অ্যানুয়াল রিভিয়ু-অব-ফিজিক্সে তার লেখা বেরিয়েছে প্রোটন সম্পর্কে, লেখাটার তারিফ করেছে

ওদেশের মানুষ—এই খবর বাংলা কাগজে ছাপা হওয়া চাই। বিদেশের হাততালি না শুনলে দেশি কুম্ভকর্ণদের ঘুম ভাঙে না যে! কিন্তু সম্পাদকের আজকে হল কি বল তো? এগারোটা বাজে—কুম্ভকর্ণ হয়ে বাসাবাড়িতে মগ্ন এখনো সুখনিদ্রায়?

বার তিনেক ইতিপূর্বে খবর নিয়েছে। চতুর্থবারে করুণার্দ্র বেয়ারা বলে, আমি ঠিক বলতে পারব না। ঢুকে পড়ুন দরজা ঠেলে।

একটি মেয়ে—কি আশ্চর্য, উৎপলা বসে সম্পাদকের চেয়ারে!

সম্পাদক আজ আসবেন না। বলুন কি দরকার।

খসখস করে কি লিখে যাচ্ছিল। মুখ তুলে দেখে কলম বন্ধ। আর ত্রিদিবই বা কাজের কথা কি বলবে এর কাছে? উৎপলা দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। চোস্ত পোশাক, ব্যাক ব্রাশ-করা চুল, জুতোর পালিশে মুখ দেখা যায়—পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ত্রিদিব ঘোষ, বছর চারেক আগে ঠিক যেমনটি দেখত। বয়স একটুও বাড়েনি তারপর। একটুও সে বদলায়নি।

এসেছ ক'দিন?

তা মাস তিন-চার হল বই কি!

এত দিনের মধ্যে মনে পড়ল না আমাদের?

অভিমানের সুর কণ্ঠে। সে তো হবেই। কিন্তু উৎপলার ভাই সুবোধ তো নেই, যাবে এখন কার কাছে? ও-বাড়ি পা দিতে মন কি চায়! সে আমলের এক কৌটা খুকি তুমি—পড়াশুনা, গানবাজনা ও অমনি দশটা ব্যাপার নিয়ে থাকতে। গান শুনবার জন্য কালেভদ্রে একটু-আধটু যা আমল দিয়েছি। আজকেই দেখা যাচ্ছে, বুলি ফুটেছে তোমার মুখে। অবাক হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু এসমস্ত মুখে বলা যায় না, ত্রিদিব তাই কৈফিয়ত বানাচ্ছে।

সময় কোথা? ডক্টর অমর পালের নাম জান—তাঁর কাছে কাজ করছি। কাঁধে জোয়াল দিয়ে খাটান। রাতে ক'ঘন্টা বাসায় এসে থাকি, তা ঐ সময়টুকুও ল্যাবরেটারিতে শুয়ে থাকলে খুশি হন

বোধ হয়। এর থেকে আন্দাজ করে নাও, দরদ অঙ্গীভূত কি প্রকার।

অমর পাল মহা পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু স্বভাবে অত্যন্ত পাজি। তার নামটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—হেন ক্ষেত্রে ত্রিদিব থুথু ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করে। থুথুর সঙ্গে ধুলোয় পড়ে যাক পাল, মুখের মধ্যে ও-নামের একটু স্পর্শ না থাকে। কাজকর্মের জৌলুস দেখে ওসব মানুষকে দূর থেকে মাথা নোয়াও—সে ভাল, কিন্তু পরিচয় করতে অধিক কাছে এগিয়ো না। কত ছাত্রের গবেষণা যে মেরে বসে আছেন—মেরে মেরেই তিনি অমর পাল।

পালকে ছেড়ে ত্রিদিব তাড়াতাড়ি অন্য কথায় আসে। পালের প্রসঙ্গ বিরক্তিকর তো বটেই, তা ছাড়া জেরায় পড়বার আশঙ্কা আছে। পলিকে সেই ছোট বেলা থেকে দেখছে তো—বড্ড ডেঁপো মেয়ে, ভারি বুদ্ধি।

খবর কি তোমার? পাশ করেছ এম. এ.? গান-টান চলছে কি রকম?

উৎপলা বলে, গানে মন ভরে। পেট ভরাবার জন্য কাগজে ঢুকেছি—এই তো দেখতে পাচ্ছ।

পাশ-করা মেয়েদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ পথ মাস্টারি। তার বদলে জার্নালিজম নিয়েছ, বুদ্ধির তারিফ করি। নশ্বর সংসারে কাম্য শুধু নামযশ; আর নাম বাজানোর জয়ঢাক হল খবরের কাগজ। 'ক' লিখতে কলম ভাঙে সেই মানুষেরা মান্য হয়ে যাচ্ছে কাগজের মহিমায়। যিনি যত বড় হোন, তোমাদের তোয়াজ না করে উপায় নেই।

শুধু বড়রাই বুঝি! ডাইং-ক্লিনিঙের ধোপা অবধি কাপড় কেচে দাম নিতে চায় না। বলে, আমাদের নামে এক কলম লিখে দেবেন কাগজে।

উৎপলা খিল-খিল করে সেই আগের দিনের ছেলেমানুষি হাসি হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে, রাত্রে খাবে আমাদের বাড়ি।

উঁহু, ডক্টর পাল বলে দিয়েছেন—

রান্না করে উৎপলা বলে, বুঝতে পেরেছি। বড় সমাজে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আমাদের নিচু দরজায় টুপি খুলে ঢুকতে অপমান হবে।

ত্রিদিব কলরব করে ওঠে, বল কি গো! অপমান করতে যাব কোন্ সাহসে! ঢাক পেটাব কাকে দিয়ে তুমি যদি চটে থাক? ড্রাইং-ক্লিনিঙের খোপার যে বুদ্ধি—বলতে চাও, সেটুকুও আমার নেই?

তারপর তার মুখের উপর দৃষ্টি তুলে বলল, বরাবর আমায় 'আপনি' বলতে পলি। হঠাৎ যে 'তুমি' শুরু করে দিয়েছ?

আর তুমি আমাকে 'তুই' বলতে ত্রিদিব-দা। আজ দেখলাম, মান্যগণ্য 'তুমি' হয়ে গেছি।

সে তো অনেক দিনের কথা। এখন প্রায় পুরোপুরি এক মহিলা হয়ে দাঁড়িয়েছ—'তুই' বলতে মুখে আটকে যায়।

ঠিক তাই। দিন বদলে গেছে। দাদা মারা গেলেন। জান, একজন আপন মানুষের জন্য বাবা হাহাকার করে মরছেন। দাদাকে 'তুমি' বলতাম—তোমাকেও ত্রিদিব-দা, 'আপনি' বলে দূরে রাখতে মন চাচ্ছে না।

ত্রিদিব যেন অভিভূত হয়ে যায়। মুখে ভালমন্দ কথা নেই। তারপর বলে, দূরে থাকতে দিতে তোমার আপত্তি সেই ছেলেবেলা থেকেই—যখন জুতো লুকিয়ে রেখে বাসায় আটকাতে। কিন্তু আটকে রাখা যায় না চেষ্টা করে। কত চেষ্টাই হয়েছিল—রাখতে কি পারলাম আমরা সুবোধকে?

উৎপলার ঘনপক্ষ্ম চোখ দুটোয় ছায়া নেমে আসে। কাতর কণ্ঠে সে বলে, থাকগে ত্রিদিব-দা। যা চুকে-বুকে শেষ হয়ে গেছে, সে সব কেন খুলিয়ে তুলছ আবার?

তবু কিন্তু ভাবছে সেই দুর্যোগ-রাত্রির কথা। দু-জনেই ভাবছে মনে মনে। সন্ধ্যা থেকে ঝড়-জল। গলিতে এক হাঁটু জল জমে গেছে, বৃষ্টির তবু বিরাম নেই। জল ভেঙে ত্রিদিব গেল ডাক্তারের বাড়ি। ফলাফল বোঝাই যাচ্ছে, তবু হাতে-পায়ে ধরে ডবল ফী কবুল করে ডাক্তারকে

নিয়ে এল। হরিদাস এক সময়ে মামজাদা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন; স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে কি রকম হয়ে গেলেন—বুদ্ধির আলো নিভে গেল যেন একেবারে। একমাত্র ছেলের এখন-তখন অবস্থা, নিচের ভাড়াটে ঘরের মেয়েটা পর্যন্ত এদের সঙ্গে সমানে রাত জাগছে, তিনি কিন্তু নিজের ঘরে নিঃসাড়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারের সাড়া পেয়ে উঠে চলে এলেন।

ভাল আছে, কি বল ডাক্তার? সারাদিন দিব্যি ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমুচ্ছে।

ডাক্তার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সায় দিলেন, ভাল—

হরিদাস প্রসন্ন হাস্যে বললেন, বল তাই। আমিও সেই কথা বলছিলাম এদের। আজকে আর জেগে বসে থাকতে হবে না, ঘুমুতে যা।

বলে আবার নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে খিল এঁটে দিলেন।

শেষ রাত্রে বৃষ্টি-বাতাস থেমেছে। মৃতদেহ আগলে আছে তারা—এপাশে ত্রিদিব, ওপাশে উৎপলা ও নিচের ভাড়াটে ঘরের মেয়েটি, নাম তার সুধাময়ী। শিয়রে ধোঁয়ায় কালিতে আচ্ছন্ন হেরিকেন। আলো দপদপ করছে, দেয়ালে ছায়া পড়েছে—ছায়া নড়ছে নিঃশব্দচারী প্রেতদলের মতো। ভেজানো ছিল দরজা—হঠাৎ খুলে গেল। কি জানি হঠাৎ কিসে হরিদাসের ঘুম ভেঙে গেছে। থপ-থপ করে তিনি এলেন। উস্কোখুস্কো চুল—সেই এক ভয়াবহ বিচিত্র মূর্তি। ঘাড় কাত করে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তাকালেন এদের সকলের দিকে। মড়ার গায়ের উপর সন্তর্পণে হাত রাখলেন।

ঘুমুচ্ছে। ভাল আছে খোকা, কেমন শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। পরশু-তরশু অন্নপথ্যি দেওয়া যাবে, কি বলিস? সেই যে ঘরে গেলাম—তারপর বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ডেকেছি ঠাকুরকে। হঠাৎ এখন স্বপ্নে কে বলে দিল, একেবারে সেরে গেছে। তাই দেখতে এসেছি।

ধরা গলায় ত্রিদিব বলেছিল, হ্যাঁ মেসোমশাই, সেরেছে একেবারে।

সকালবেলা মড়া শ্মশানে নিয়ে যাবে, উৎপলাকে তখন আর কিছুতে ঠেকানো গেল না। ভাই আর বোন—ঐ যেমন উপমা দিয়ে বলে থাকে, এক বৃন্তে দুটো ফুল। বুককাটা আর্তনাদ করতে লাগল সে পাড়া মাথায় করে। হঠাৎ নজর পড়ল, বারান্দায় প্রতিবেশীদের ভিড়ের মধ্যে হরিদাস। হতভম্ব হয়ে গেছেন তিনি, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন—কিছুই বুঝতে পারছেন না যেন। ধপ করে তারপর বসে পড়লেন দেয়াল ঠেশ দিয়ে। সম্বিৎ নেই।

এর পরে ত্রিদিব দু-পাঁচ দিন মাত্র দেখেছে হরিদাসকে। মাটির মানুষ তিনি চিরদিনই—কত পাণ্ডিত্য, কথার মধ্যে জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়, কিন্তু দম্ভের আঁচ নেই। সেই মানুষ পর পর দুই বিষম শোকে জড়পুত্তলি হয়ে উঠলেন। স্ত্রী বা ছেলের নাম মুখাগ্রে আনেন না, কাঁদেননি তিনি কোন দিন—কিন্তু অন্য লোকের চোখে জল আসে, যারা আগে তাঁকে দেখেছিল।

ত্রিদিব নিজে থেকে আর কখনো হরিদাসের বাড়ি যায়নি। সুবোধ নেই, যাবে কার কাছে? উৎপলা বাপের নাম ধরে ডাকাডাকি করত, মান-অভিমান করত। কিন্তু ভয় করে। ওদের ছোট্ট বাড়িটা যেন শোকে থমথমে হয়ে আছে,—যত হাসি-মুখ নিয়ে যাও, উঠানে পা দিলেই নিংড়ে মুছে যাবে হাসি, বুকের উপর বিশ-মনি বোঝা—দম আটকে ভুঁয়ে পড়ে যাবে, এমনিতরো অবস্থা।

আজকেও উৎপলা বাপের কথা তুলল। বলে, তোমায় দেখলে বাবা বড্ড খুশি হবেন। যাবে কিন্তু।

ত্রিদিব ভয়ে ভয়ে হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিল তার উপরে এত বছর টিকে রয়েছেন, সে-ই তো পরমাশ্চর্য।

জবাব দিল, রাত একটু বেশি হয়ে যায় তো রাগ কোরো না পলি। কাজের বড় চাপ। ডক্টর পাল কি রকম মানুষ, বললাম তো তোমায়।

ঠিক বটে। কাজের যখন আদি-অন্ত নেই, নিমন্ত্রণ-বাড়ি সকাল-

সকাল যাওয়া কিছুতে হতে পারে না। সন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালের সামনে গড়ের মাঠের একটা বেঞ্চিতে বসে মনে মনে হাসছিল ত্রিদিব। কাজ নয় তো কি, মনোরথে বিশ্ব-বিচরণ। রাত্রের এই সময়টুকু একেবারে তার নিজের। যেমন সেই ইস্কুলের চাকরির সময়ে ছিল। তখন বই পড়ত—এখন পড়াশুনো বড় একটা হয় না, সেকালের সেই সব পড়া জিনিস নিয়ে নিঃশব্দ রোমন্থন। একটা দিন অতীত হয়ে যাচ্ছে। আকাশের তারা ছুটে গেল, তাই কেবল চেয়ে চেয়ে দেখছ ত্রিদিব ঘোষ। সময়ের বালি ঝুরঝুর করে নিঃশেষ হয়ে যায় যে ওদিকে! কোন সুরাহা হয় না। সমাজের যাঁরা মাথা, তার দরবার সেখানে প্রতিদিন। তাঁদের অতি-মূল্যবান সময় থেকে দু-পাঁচ মিনিট ছিনিয়ে নেওয়া সহজ কথা! বিস্তর খোশামুদি ও হাঁটাহাঁটির ফলে তা-ই যদি বা হল, শেষ অবধি কথা শুনবার ধৈর্য থাকে খুব কম জনার। উপহাসের হাসি হেসে মাঝপথেই আবেগ থামিয়ে দেন। আচ্ছা, বলুন তো—যে অলস ছেলেটা আনমনে কেটলির ধোঁয়া নিরীক্ষণ করত, কিম্বা আপেল মাটিতে না পড়ে আকাশমুখো কেন ছোটে না—হেন আজগুবি প্রশ্ন মাথায় ঘুরত যে সৃষ্টিছাড়া লোকের, গোড়ায় কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল তার অসামান্যতা? বড় বিজ্ঞানী মাত্রেই কবি। পড় জগদীশ বোসের লেখা, কিম্বা শোন মাদাম কুরীর কাহিনী।

টং-টং করে গির্জার ঘড়িতে ন'টা বাজতে ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। সময় হয়েছে। ডক্টর পাল যত কাজ-পাগলাই হোন, এতক্ষণে সহকারীকে ছুটি দেওয়া উচিত।

ছোট্ট বাড়ি। আলো নেভানো। একেবারে নিশুতি হয়ে গেছে। কড়া নাড়ছে ত্রিদিব। নাড়ছে তো নাড়ছেই। নীলমণি অবশেষে দরজা খুলে দিল। তখনই নীলমণি বুড়ো ছিল, এখন প্রায় অথর্ব। এ বাড়ির সঙ্গে মানিয়েছে বেশ ভাল। দন্তহীন মাড়ি বের করে—

এই যোগ হয় তার হাসি—বলল, এত দেরি করলি, খুকি রাঁধাবাড়া করে আমাদের খাইয়ে দিয়ে, বসে বসে শেষটা ঘুমিয়ে গেছে। আছিস ভাল? খুব নাকি বড় হয়েছিস, সকল জায়গায় খাতির? রাতে ভাল দেখিনে—দিনমানে যদি আসতিস, একটাবার ভাল করে দেখে নিতাম।

প্রতিবাদ করে নীলমণির কাছে ছোট হবার মানে হয় না। অবশ্য বিনয় দেখানো উচিত। ত্রিদিব বলে, খাতির যেখানে যতই হোক, তোমাদের কাছে তার কি! এই তোমার কাছে, মেসোমশায়ের কাছে! সময় পাইনে নীলমণি-দা। তা আসব একদিন বেলাবেলি—তুমি যখন বলছ, আসতেই হবে।

অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে ভিতরে। পা ফেলতে ভয় হয়। বাইরের ঘর। ভাইবোনের জুলুমবাজিতে অনেক রাত কাটিয়ে যেতে হয়েছে এ-বাড়ি। খাওয়া দাওয়া সেরে এসে এই বাইরের ঘরে শুতো। সুবোধ আর সে এক বিছানায়। সারা রাত গল্পগুজব চলবে —হরিদাস টের পেয়ে তাড়া দেবেন, তাই এই নির্বিঘ্ন ঘরে তারা নেমে আসত।

নিচে আজকাল ভাড়াটে নেই বুঝি?

নীলমণি বলে, ভাড়াটে ছিল আবার কবে! খোকা একজনাদের নিয়ে এসেছিল—তাদের কষ্ট দেখে ঠাঁই দিয়েছিল। ভাড়া না দিয়ে কিছুতে থাকবে না, তাই হাত পেতে নিতে হত কিছু-কিছু।

খোকা হল সুবোধ। আ-মৃত্যু সে খোকা ছিল নীলমণির কাছে। ত্রিদিব এই যে নীলমণি-দা বলে ডাকছে, সে-ও সুবোধের দেখাদেখি।

নীলমণি বলে, এখন তাদের দিন ফিরেছে। পচা বাড়িতে থাকতে যাবে কি জন্য? তেমহলার উপর আছে শুনতে পাই—ভাল কাজকর্ম করে।

সে মেয়ে সুধাময়ী। ত্রিদিবের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছিল। নেত্রকোণার সেই বড় মারামারি-কাটাকাটির সময় তারা চলে আসে।

সুবোধ আর শেখরনাথের কাছে ত্রিদিব তাদের অবস্থার কথা শোনে। সুবোধদের দরিদ্রভাণ্ডার তখন জোর চলছে, শেখরনাথ দরিদ্রভাণ্ডারের বড় পৃষ্ঠপোষক। মেয়েটা কিন্তু সাহায্য নিল না কিছুতে। বাপে মেয়ের তাই নিয়ে কী ঝগড়া। সুবোধ তখন হরিদাসের মত নিয়ে ভাড়াটে হিসাবে তাদের বাড়ি এনে আশ্রয় দিল। তা বেশ হয়েছে— ভাল আছে তারা, আনন্দের সংবাদ। সুধাময়ী মেয়েটা বড় ভাল, বড় সরল ও আত্মসম্মানী।

আলো জ্বেলে দাও নীলমণিদা, সিঁড়ি দেখতে পাইনে।

নিচের বাতিটা খারাপ হয়ে গেছে, নতুন আর লাগানো হয়নি। দরকার হয় না তো—সন্ধ্যের পর কেউ নামে না। তা দেখি, ম্যাচবাক্স আছে বোধ হয় আমার ঘরে।

যাকগে, অত হ্যাঙ্গামা করতে হবে না। অভ্যাস নেই, তাই একটু ছোপ-ছোপ লাগছে। ঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ো না তুমি।

উঠে গেল ত্রিদিব। সিঁড়ির প্রত্যেকখানা ইট, রেলিঙের প্রতিটি শিক, দরজা-জানলা, কড়ি-বরগা, দেয়ালে-পোঁতা প্রেকটি অবধি তার সুপরিচিত। চোখ বুজেও সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতে পারে। দুমদাম করে কতদিন এই সিঁড়ি থেকে চেঁচাত, চায়ের জল চাপা রে পলি। আর কি দিবি—তৈরি আছে কিছু? শুধু জোলো চায়ে হবে না কঠিন কিছু চাই।

অনেক দিনের পর কিনা! সুবোধ নেই, এ বাড়ির উপর তাই জোরও নেই তেমন। উঠছে নরম পায়ে চোরের মতো। সিঁড়ি আরো তো পুরানো হয়েছে, ভেঙেচুরে না পড়ে! দরদালান— দালানের প্রান্তে গোলাকার পুরানো টেবিলটা রয়েছে। ঐ টেবিলে খাওয়া দাওয়া হত। আজকেও টেবিলে খানা পাতা, বাটিতে বাটিতে ঢাকা-দেওয়া তরকারি। তাই তো, দর বাড়াতে গিয়ে অসুবিধা ঘটানো হয়েছে বড্ড বেশি। পলি বেচারীর ভারি কষ্ট হয়েছে, বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে বড় ঘরে খাটের উপর।

ঘরের মাঝখানে কম-জোরের সবুজ আলো। বাতাসে বিদ্যুৎ-আলোর জার দুলছে, আলো যেন ঢেউ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে উৎপলার আলুল চুল, ক্লান্তিভরা মুখ ও সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে। নিশিরাত্রে নিষুপ্ত ঘরে সঙ্কোচ-হীন দৃষ্টি মেলে দেখছে মেয়েটাকে। রঙে গোলাপি আভা বরাবরই—তার উপর অঙ্গে অঙ্গে ছাপিয়ে পড়ছে ভরা যৌবন। এমনি হয়েছে উৎপলা এই ক-বছরে! বিধাতাপুরুষ ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে তুলেছেন। সামান্য গয়না—ডান হাতে তিনগাছা চুড়ি, বাঁ-হাতে একগাছা। তার মানে ঘড়ি পরে বেরোয় ঐ বাঁ-হাতে। কানে দুল—ঝিকমিক করছে, হীরে-বসানো বোধ হয়। কিম্বা ঐ মুখখানার পরে যা-ই কিছু ঝুলিয়ে দাও, হীরে হয়ে ওঠে। চোখ ফেরানো যায় না রূপবতীর দিক থেকে। আহা, নিজে রাঁধাবাড়া করেছে কতক্ষণ ধরে। খাবার সাজিয়ে আরো কতক্ষণ পাহারায় ছিল। তারপর ঢুলতে ঢুলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

শব্দসাড়া করছে, তবু ঘুম ভাঙে না। বলিহারি এদের বুদ্ধি-বিবেচনা। বাড়ির মধ্যে বুড়ো বাপ আর কচি মেয়ে। আর পাহারাদার হল নীলমণি—বিনা লাঠিতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তাকে কে দেখে ঠিক নেই। এই যে ত্রিদিব দাঁড়িয়ে আছে—মানুষের মন অরণ্যবিশেষ, হঠাৎ যদি হিংস্র জন্তু বেরিয়ে এসে হামলা দিয়ে ওঠে! বড় ঘরের দরজাটা অন্তত বন্ধ করে ঘুমানো উচিত ছিল উৎপলার। বোকাসোকা এরা—যেদিন অঘটন ঘটবে, টের পাবে তখন।

মাঝের কোঠায় সম্ভবত হরিদাস। বরাবরই থাকতেন তিনি ঐ-ঘরে। দালান পার হয়ে দরজার কাছে এসে ত্রিদিব ডাকে, মেসোমশায়—

এক ঘুম এতক্ষণে হয়ে গেল উৎপলার। এতদূরের ঐটুকু ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

এসে গেছ? উঃ, বড্ড দেরি করেছ। বাবাকে ডেকে কি হবে, তাঁর তো রাত দুপুর।

দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খিঁউরে উঠল।

দুপুররাতের বাকিও নেই বড়। ল্যাবরেটারির কাজ এই রাত্রি অবধি?

রাত্রিবেলাটা ডক্টর পালের সঙ্গে নিরিবিলি আলোচনার সময় পাওয়া যায়। ছাড়তে চান না মোটে তিনি।

উৎপলা দ্রুত স্টোভ ধরাল। ত্রিদিব দেখছে ঘুমটুম কোথায় উড়ে গেছে, লুচি ভাজতে বসল সে এখন।

ত্রিদিব বলে, খাসা লুচি বেলে দিতে পারি আমি।

উৎপলা বলে, আমি বেলতে পারি আর ভাজতে পারি একসঙ্গে এক হাতে। বসে পড় এবার। হারিয়ে দাও দিকি কেমন পার। লুচির যোগান যখন দিতে পারব না, তখনই হার।

তার চেয়ে দেরি করি আর একটু। দুজনে একসঙ্গে বসব। খেয়ে কে কাকে হারাতে পারে, দেখা যাবে।

উৎপলা রাগ করে বলে, ভারি অবাধ্য হয়ে এসেছ ত্রিদিব-দা। ঠাণ্ডা লুচি খাওয়া যায়? তা হলে তো ভেজেই রেখে দিতাম। যা হয় না, মিছে বকো না তা নিয়ে। হাত ধুয়ে বসে পড় বলছি।

খাওয়ার সময় যেসব কথা উঠবে, ত্রিদিব আগে থেকে তার আগা-গোড়া মনে মনে তালিম দিয়ে এসেছে। খুব তারিপ করল সে নিজেকে নিয়ে। উৎপলার সঙ্গে সবিস্তারে বলল এই ক'বছরের জীবন কথা, এবং এখনকার যাবতীয় কাজকর্ম। অর্থাৎ নিছক গল্প কথা, আসলের সঙ্গে একটুও মেলে না। গল্প-রচনার এতদূর ক্ষমতা—যা সমস্ত অনর্গল বলে গেল, লিখে ফেললে দিব্যি এক উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। মিথ্যে বলতে পারে বটে বেধড়ক, কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে লিখবার যে ধৈর্য নেই। তা হলে লেখক হিসাবেও অসাধারণ হওয়া যেত। মস্ত এক গবেষণা ফেঁদে বসা গেল পলির কাছে অ্যাটম-তত্ত্ব সম্বন্ধে। দেখা গিয়েছে, যে যত কম জানে—কথায় সে তত নিরঙ্কুশ। একটুখানি

বই-পড়া বিদ্যে, একটু বা মুখে শোনা—দুই বিদ্যের মাঝখানে মন-গড়া গল্পের সংযোগ করে দাও, শুনতে চমৎকার হবে।

পলির তাক লেগে গেছে, মুখ-চোখের ভাব দেখে বুঝে নিয়েছি। অ্যাটম-তত্ত্বের পর ভ্রমণ-কাহিনী—ভারতবর্ষের হেন জায়গা নেই, যেখানে না গিয়েছি দুষ্প্রাপ্য জাতের মৃত্তিকা-সংগ্রহের জন্য। অণু-পরমাণুর মধ্যে অমোঘ শক্তি—সেই শক্তি টেনেহিঁচড়ে আদায় করবার জন্য জীবনপাত করছি। এই আমার দিন-রাতের কাজ। উৎপলা নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছে, সন্দেহ করেনি।

কিন্তু আসল পরিচয় জানতে যদি—মফস্বল শহরের ইস্কুল-মাস্টারটির কথা। মোনাজাইট বালু নয়—টাস্কের খাতায় ট্রানস্লেসনের ভুল খুঁজে বেড়িয়েছি আমি এতাবৎ।

রাত্রি অনেক—তা কি হবে। তুমি উল্লাসিনী গান শোনালে খাওয়ার পরে। তোমার ঘরখানায় ছবি নেই, আসবাবপত্র নেই, পলস্তারা খসে দেয়ালের ইটগুলো হাঁ করে আছে—ঘর বোঝাই শুধু বই-কাগজ আর বাজনার যন্ত্রপাতি। কাজের মাঝখানে গান গেয়ে ওঠ হঠাৎ। গানের অনন্ত নীলাম্বর—মনের খুশিতে আলোক-ধারায় সেখানে স্নান করে বেড়াও। অন্ধকার বাড়ির কক্ষ থেকে সুরের প্লাবন বয়ে যায় অলক্ষ্য গিরিদরী থেকে প্রবহমান স্রোতস্বতীর মতো, বনান্তরালের অদৃশ্য নীড় থেকে পাখির কাকলীর মতো। সংসারের বেদনা ও দারিদ্র্য নিস্তব্ধ করতে পারেনি তোমায়। চতুর্দিকের এরা সব সামান্য ও সাধারণ—এদের অনেক উপরের মানুষ তুমি উৎপলা। তুমি উৎপলা এবং পথে পথে ঘুরে-বেড়ানো আমি ত্রিদিবনাথ—অসামান্য দু-জনেই।

মেসের দরজায় এসে পৌঁছল ত্রিদিব। মাঠের হাওয়া খেতে খেতে দিব্যি পায়ে পায়ে চলে এসেছে। এত রাত্রে ট্রাম-বাস নেই, কি করবে? থাকলেও অবশ্য কি করত বলা যায় না। মস্তিষ্কে বিদ্যাবুদ্ধির অফুরন্ত ভাণ্ডার সন্দেহ নেই, কিন্তু পকেট-ভাণ্ডারে

সাকুল্যে আনা আষ্টেক। আসা এবং ফিরে যাওয়া, দুইবার ট্রামের বিলাসিতা এই অবস্থায় সম্ভব নয়।

ত্রিদিবের আলাদা সিট—মেসের পুরাদস্তুর মেম্বার সে এখন। জং-বাহাদুরের সঙ্গে এক ঘরেও নয়।

ঝুমা···ঝুমারাণী—দরজার ফ্রেমে-আঁটা সেই ছবি সারারাত ত্রিদিবকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। আর মুকুল—মুখের ভিতর দুটো আঙুল পুরে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে মায়ের গা ঘেঁসে। একবার বা এগিয়ে আসে একটু। ধরতে যাও—কোলে ওঠায় তার বিষম আপত্তি, পিছলে যাবে, মা'কে বেড় দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। দাও না ধরে ঝুমা। আমি পারব কি করে ওর সঙ্গে ? পা যেন পাখির দুটো পাখনা—হেঁটে নয়, উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সোনার পাখি নাগালে পাচ্ছিনে—ধরে দাও, একটু আদর করি···

সকালবেলা জংবাহাদুর এসে ধরলেন। মেসের মবলগ বাকি, ম্যানেজারকে ভাঁওতা দিয়ে দিয়ে ঠেকাচ্ছি। বাইরে মেরে ঘর সামলাচ্ছ—সে-ও তো নয়। তোমার দেশের বাড়িতেও ছুঁচোর কেত্তন—

ত্রিদিব চমকে তাকায়। গাঁয়ের খবর ইনি জানবেন কেমন করে ?

জংবাহাদুর বলেন, বউমার চিঠি এসেছে। টাকা পাঠাও না—করবেন কি না লিখে ? পুরানো ঠিকানা বলে চিঠি এইখানে ছেড়েছেন। আমাদের লিখেছেন, এই দেখ, কোথায় আছেন জানা থাকিলে সেইখানে পত্র পাঠাইয়া দিবেন।'

পোস্টকার্ডের চিঠি। ঝুমার মতো মেয়ে অভাব জানিয়ে লিখল—আহা, কী দশায় পড়েছে তা হলে।

তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে ত্রিদিব ভ্রূকুটি করে বলল, টাকার কথা কোথা ?

আছে—আছে বই কি ভায়া! পড়ে দেখ ভাল করে। এই যে ···'যাওয়ার পর কোন খবর দাও নাই—'মেয়েমানুষের অভিধানে

খবর মানে হল টাকা। খবর কথাটার জায়গায় টাকা বসিয়ে নাও, তা হলেই মিলে যাবে। আরে, টাকার টান না থাকলে এমন আব্দারে চিঠি লিখতে যাবেন কেন ভদ্রলোকের মেয়ে ?

॥ পাঁচ ॥

মেসের তাগিদ কড়া হয়ে উঠল। সকালে সন্ধ্যায়—এমন কি রাত দুপুরেও জংবাহাদুর ফিঙে লেগে আছে। আগে বলত হেসে হেসে, এখন মুখ কালো করে। কথার সুরও পালটে গেছে।

অতএব নিরুদ্দেশ ত্রিদিব। যেন কর্পূর হয়ে বাতাসে উবে গেল। মেসের এতগুলো মেম্বার—কেউ কোথাও তার ছায়া দেখতে পায় না। ফোলিও ব্যাগটা হাতে করে শুধু গেছে। বিছানাপত্র যথারীতি সিটের খাটিয়ায়, বৃহৎ স্যুটকেশ শিয়রে।

হয়তো গেছে কোন বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণে। কিম্বা টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছে। দিন দুয়েক এমনি আশায় আশায় কাটল। না, ফিরবার লক্ষণ নেই। পাকাপাকি ডেরাডাণ্ডা তুলল নাকি মেস থেকে? তা-ই বা কি করে হয়—জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে এখানে। গাড়ি চাপা পড়ল রাস্তায়? পড়ে পড়ুকগে, কিন্তু দেনা মিটিয়ে গেলে ভদ্রতা হত। মবলগ টাকা বাকি। আর বিপদ হয়েছে জংবাহাদুরের—মুখ ছোট হয়ে যাচ্ছে সকলের কাছে।

কোথায় ফৌত হলেন আপনার এক-ডাকে-চেনা মানুষটা—

কাজে-কর্মে আটকে পড়েছে কোথায়। সর্বস্ব ফেলে গেছে—আসবে বই কি, নিশ্চয় আসবে। টাকা মারা যাবে না।

সকলকে প্রবোধ দিচ্ছেন, কিন্তু নিজের মনে ভরসা পান কই? একদিন সকলের অলক্ষ্যে ত্রিদিবের গুটানো বিছানা ছড়িয়ে ফেললেন। কি কাণ্ড—শ্মশান থেকে মড়ার সম্পত্তি কুড়িয়ে এনেছে না কি? তেল-চিটচিটে শতচ্ছিন্ন তোষক—ছুঁতেও ঘৃণা হয়। অথচ, দেখ, নিচে

উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি, উপরে মনোরম বেড-কভারে মোড়া। ঠিক ঐ ত্রিদিবেরই মতো—বেশভূষা ও কথাবার্তায় মালুম হবে নবাব খাঁজে-খাঁর নাতি। এক নাগাড় এতগুলো চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে—এতখানি শোচনীয় দশা তা কে ভাবতে পেরেছে?

তারপর সুযোগ মতো একদিন তালা ভেঙে স্যুটকেশও খুলে ফেললেন। অবস্থা তথৈবচ। জীর্ণ কোট একটা, গোটা তিনেক ছেঁড়া সার্ট আর বিস্তর খাতাপত্র। মেসে আসার প্রথম মুখটায় রকমারি স্যুট পরত ত্রিদিব, হাতে ঘড়ি বাঁধত, কলমের ক্লিপ ঝিকমিক করত পকেটের মাথায়—ইদানীং সে সব কিছুই দেখা যেত না। স্যুটকেশে কিছুই তো নেই—গেল কোথায়? বেচে খেয়েছে তবে?

কাগজগুলো জংবাহাদুর নেড়েচেড়ে দেখলেন—বর্তমান আস্তানার যদি হদিস মেলে। হিজিবিজি অঙ্ক আর পাতার পর পাতা অর্থহীন ইংরেজি লেখা। এই পাগলামিতেই মেতে ছিল, কাজকর্মের সময় কোথা? স্রেফ ভাঁওতা দিয়েছে। মুশড়ে গেলেন জংবাহাদুর। স্যুটকেশ আর বিছানা বেচে কত হবে—টাকা পনের বড় জোর। পাওনা যোগ করে দেখেছেন—বিরাশি টাকা কয়েক আনা। সর্বনাশ, এত বড় দেনা চেপে পড়ে যে এখন তাঁর ঘাড়ে! তিনি মেসে এনে ঢুকিয়েছেন, যত্রতত্র জাঁক করে বেড়িয়েছেন—কিছু জানি না বললে এখন কে মানবে? দশের চোখে কেবল বেকুব বনে যাওয়া।

ম্যানেজারকে বললেন, জরুরি খবর পেয়ে ত্রিদিব দেশে চলে গেছে। ঘাবড়াবার হেতু নেই—তাকে না পাওয়া যায়, ভুজঙ্গ শর্মা রয়েছেন। তিনিই দেবেন টাকা।

কলিকাল—মানুষ যা বলে, তার বেশি কিছু ধরে নিতে হয়। জংবাহাদুরের কথায় বোঝা যাচ্ছে, ত্রিদিব যাবতীয় হিসাব তাঁর কাছে মিটিয়ে গেছে। টাকা মেরে উনিই এতদিন খানাইপানাই করছিলেন—আড়ালে ভুজঙ্গের সম্বন্ধে সবাই এইরকম বলাবলি করে। মান বাঁচাতে গিয়ে এ যে আবার উল্টো ফ্যাসাদ। অতগুলো টাকার দায় চেপেছে

ছাড়ে, উপরন্তু বদনামের ভাগী হলেন। মানে কিছু কিছু করে দেবেন, যে প্রস্তাবে ম্যানেজার রাজি হয় না। অর্থাৎ ত্রিদিবের হয়ে টাকা দিয়ে দিচ্ছেন না উনি—ত্রিদিবের টাকা উগরে দেওয়ার গড়িমসি।

অনেক ভেবেচিন্তে জংবাহাদুর চিঠি লিখলেন মাধবীলতা দেবীকে। মাধবীলতা অর্থাৎ ঝুমা আমাদের। চোখে দেখেননি ঝুমাকে, তাই লজ্জা বলে লিখতে কলম আটকাল না।

কল্যাণীয়া বধূমাতা, তুমি আমায় চিনিবে না। ত্রিদিবনাথ ভায়ার সহিত আমার সবিশেষ দহরম-মহরম। তোমার চিঠি পাইবার পর ব্যস্ত হইয়া বোধ হয় সে দেশে চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন তাহার সংবাদ না পাইয়া নিরতিশয়—

জবাব এসে গেল ঝুমার কাছ থেকে। ত্রিদিব এই কলকাতা শহরেই আছে, ঠিকানা দিয়েছে। সর্বনেশে মানুষ বটে! আছে বহাল-তবিয়তে, অত দূরে পরিবারের সঙ্গেও চিঠি চালাচালি হচ্ছে—ভুলে মেরেছে কেবল এই মেসের পথটুকু। পেলে হয় একবার—আর তা পাবেনই তো! ঠিকানা যখন মিলেছে, নিশ্চয় পাবেন। এমনি ভাল মানুষ, কিন্তু রাগ হলে জংবাহাদুরের জ্ঞান থাকে না। আচ্ছা করে শোনাবেন, দরকার হলে পুলিশ নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে ভুজঙ্গ ঝুমার চিঠি পেলেন। তারপরে তিলার্ধ আর দেরি নয়। অফিসের কাপড় ছাড়বার সবুর সয় না, প্রায় ঐ ধুলো-পায়েই উঠলেন ট্রামে। অনেক দূর—কলকাতা শহরের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হয়। শহরতলীর পতিত জায়গা ছিল আগে—এখন নতুন শহর গড়ে উঠছে। ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে হয় অনেকখানি। তা ঠিক জায়গাই বেছেছে—এখানে কোন খোলার বস্তিতে মাথা গুঁজে থাকলে যমরাজও খুঁজে বের করতে পারবে না। সারা পথ জংবাহাদুর কথায় সান দিয়ে এসেছেন—কি বলবেন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। চেঁচামেচি হবে—তা কিছু হতে পারে বই

কি। কিন্তু রেহাই দেবেন না আজ কিছুতেই। ওঁদের বকা সেরে এসে জুয়াচোরটা আবার কোন্ ভাল মানুষকে ফাঁসাবার তালে আছে, ঠিক কি!

এ পাড়ায় শহর জমবে যখন এই সব রাস্তা তৈরি শেষ হবে, দু'ধারে বাড়ি উঠবে ঝকঝকে থামের উপর বসানো বিদ্যুতের বাতিগুলো জ্বলবে রাত্রিবেলা। অনেক দেরি তার এখনো। মাটি খুঁড়ে পাহাড় জমিয়েছে, ইট-পাথর-খোয়া গাদা করেছে এখানে-ওখানে—পা ফেলে এর মধ্য দিয়ে এগুনো দায়। তার উপর বাড়ি এখানে একটা আর ওখানে ওই একটা—সাবেক বস্তিগুলো আছে, আবার নতুন বাড়িও উঠছে। নম্বর এখনো ঠিক হয়নি। কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবে—কিন্তু মানুষ কোথা? নির্জন শহরতলী অন্ধকারে থমথম করছে।

শেষটা মিলল এক পান-বিড়ি সিগারেটের দোকান। মাধবীলতার চিঠি বের করে কেরোসিন-কুপির আলোয় জংবাহাদুর ঠিকানাটা আর একবার দেখে নিলেন। দোকানের সামনে বেঞ্চির উপর বসে জন-তিনচার আড্ডা দিচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে। ঠিকানা শুনে একজন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

কি মুশকিল, অনেক দূরে ফেলে এসেছেন সে বাড়ি।

দোকানদার সদয় হয়ে বলে, ওঠ তুই গোপলা, সঙ্গে করে নিয়ে যা। বুড়োমানুষ বিস্তর কষ্ট করেছেন।

গোপাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন।

যেতে যেতে জংবাহাদুর প্রশ্ন করেন, মেস-বাড়ি ওটা?

এই গোপাল নিজে এক সময় মেসের চাকর ছিল। সে আশ্চর্য হয়ে বলে, মেস কেন হবে? সাহেব মেসে থাকবেন—কী যে বলেন।

এখনো তবে সেই প্রাথমিক পর্ব চলছে, ত্রিদিব যে সময়টা ঘোরতর সাহেব, টাকা খোলামকুচির মতো ছড়ায়। জংবাহাদুরের

মেরে গিয়ে গোড়ায় আর এই পদ্ধতিই ছিল। টের পাওনি তো বাচ্চু সাহেবের বাইরের জৌলুষের তলে শুধুই খড় আর মাটি। জৌলুষ ধুয়ে গিয়ে বেরোক আসল মূর্তি, তখন বুঝবে।

নতুন পাকা বাড়ি—একতলা—বাড়ির কাজ শেষ হয়নি, ভারা বাঁধা আছে বাইরে। চুনকাম-করা দেয়াল ঝিকমিক করছে। বারাণ্ডায় পা দিয়ে জংবাহাদুর আরও তাজ্জব। এমন বাড়িতে এসে রয়েছে শুধু মাত্র কথার ঝকমকি খেলিয়ে? তা হতে পারে না। একটা-কিছু জুটিয়েছে ঠিক। মন ঘুরে যায় মুহূর্তে। এলেমদার ছোকরা—তাতে তো সন্দেহ নেই। টাকাকড়ি হয়েছে, তা নইলে এতদূর ঠাটঠমক হয় না।

কে কে থাকে এ-বাড়ি? শাড়ি-পরা ঐ যে একজন—

গোপাল বলে, মেম সাহেব। সাহেব আর মেমসাহেব—আর কেউ নেই। আর এই আমরা ক'জন।

ধাঁধা লেগে যায়। মেম সাহেবটি কে হলেন আবার? চিঠিতে মাধবীলতা ভুল ঠিকানা দেয়নি তো? না, নিজেই সে বাসায় এসে উঠেছে ইতিমধ্যে? কিন্তু আজকে চিঠি পাওয়া গেল, চিঠির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় এসে পড়ে কি করে?

বাবুর নাম ত্রিদিব ঘোষ তো বটে—হ্যাঁরে গোপাল?

জবাবের প্রয়োজন হল না, সুসজ্জিত বৈঠকখানা থেকে ত্রিদিব হাঁক দেয়, কদ্দূর গিয়েছিলি রে? এতক্ষণ লাগে এক টিন সিগারেট আনতে?

জংবাহাদুরকে দেখে বলে উঠল, এসে গেছেন আপনি? বড্ড ভাল হল। ক'দিন থেকে যাব-যাব করছি, সময় করে উঠতে পারিনে। ল্যাবরেটরির কাজে একদম ফুরসৎ নেই। আবার বাইরে যাবারও একটা তালে আছি, তার তোড়জোড় করতে হচ্ছে। সে যাক গে। মেসের কিছু দেনা রয়ে গেছে—কত হবে বলুন তো? শ'খানেকের বেশি বোধহয় নয়—

ভড়বড় করে বলে যাচ্ছে—যেমন ত্রিদিবের স্বভাব। কিন্তু কথাবার্তায় শোধ নয় আজকে—ড্রয়ার থেকে মনিব্যাগ বের করল। এবং আরও আশ্চর্য, ব্যাগের ভিতর এক গাদা নোট। একশ' টাকার একখানা নোট অবহেলায় জংবাহাদুরের হাতে দিয়ে বলে, কুলিয়ে যাবে তো, না বেশি ?

জংবাহাদুর ঘাড় নাড়লেন। হেন তাজ্জব দেখে মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। কিছু কায়দা-কানুন শিখে ফেলল নাকি, যাতে রমারম নোট বানানো যায় ? বলি, জাল নোট নয় তো এখানা ? এই কয়েকটা মাসের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে, নবাব-বাদশা বনে গেছে পুরোপুরি।

অনেক রাতে জংবাহাদুর ফিরলেন। না খাইয়ে ছাড়ল না ত্রিদিব। আর রাত্রিবেলা উপস্থিত মতে যে খাওয়ান খাওয়ালো তাতে ঐ ট্রাম-রাস্তা অবধি অতটুকুও পায়ে হাঁটা দায়। ট্রামে যেতে ত্রিদিব বারণ করে দিয়েছে। ওদের এই নির্মীয়মাণ রাস্তায় গাড়ি আসতে পারে না—বলে দিয়েছে, বড় রাস্তায় উঠে ট্যাক্সি নিতে। ট্যাক্সি ভাড়া আন্দাজ মতো আলাদা দিয়েছে মেসের দেনা ঐ একশ' টাকা বাদে। জংবাহাদুর ট্যাক্সি নেননি, ট্রামের কয়েকটি পয়সা বাদে বাকিটা মুনাফায় দাঁড়াবে। মুনাফা আরও আছে—মেসের দেনা একশ'র পনের-বিশ টাকা কম। মনে তাই অশেষ স্ফূর্তি। সকালবেলা ম্যানেজারের নাকের ডগায় সগৌরবে মেলে ধরলেন ত্রিদিবের নোটখানা। কি হে, বলিনি আমি, ত্রিদিব ঘোষ হল কোহিনুর-মণি ? কয়েকটা দিন কেবল কাদা-চাপা পড়ে ছিল।

যাকে পাচ্ছেন তার সঙ্গে সবিস্তারে গল্প করছেন ত্রিদিবের ঘরবাড়ি আসবাবপত্র ও ঐশ্বর্যের কথা। দেশের সীমানার মধ্যে অত বড় প্রতিভা সামলে রাখা যাচ্ছে না—সমুদ্রপারের তা-বড় তা-বড় বিশ্বজন ডাকাডাকি লাগিয়েছে—ঐ ঠিকানাতেও ক'দিন থাকে, তাই দেখ ! কিন্তু এত বড় আনন্দের ব্যাপার শুধু বাইরের লোককে বলে

শান্তি পাওয়া যায় না—সহধর্মিণীরও জানা আবশ্যক। ঘরে গিয়ে তিনি মাধবীলতার নামে এক চিঠি ফাঁদলেন—কল্যাণীয়াসু, বউমা—

॥ ছয় ॥

ইতিমধ্যে ত্রিদিব পুরী গিয়েছিল ক'দিনের জন্য। উত্তাল সীমাহীন সমুদ্র—কিন্তু এক ঢোক তেষ্টার জল পাবে না। শান্ত হয়ে অবগাহন-স্নান চলবে না—সতর্ক চোখে কখনো তাকাতে তাকাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, কখনো পালাতে হয় পিছনমুখো। উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ—ঢেউয়ের পিঠে চড়ে তীরবেগে অনেক দূর ছুটে যাওয়া, আবার ফিরে চলে আসা। যেন সৈন্য হয়ে লড়াই করছে সে—ঘরবাসী মানুষ নয়। প্রিয়জন নেই—আছে বিরুদ্ধ প্রতিযোগী, নিতান্ত পক্ষে উদাসীন জনতা।

উঁহু, রয়েছে একজন—তার নাম সুধাময়ী। ছায়ার উপমা মনে আসতে পারে। ছায়া কিন্তু ঠিক-দুপুরে কিম্বা রাত্রিবেলা থাকে না—সুধাময়ী দিনরাত্রি সর্বক্ষণের। তবু ত্রিদিবের মন ফাঁকা, বুমাকে বড্ড মনে পড়ে। দিনমানে পল্লীতে বিস্তর মিস্ত্রিমজুর খাটে, বিষম হৈ-চৈ—সন্ধ্যার পর একেবারে নির্জন। ছ-পাঁচটা বাড়ি খাড়া হয়েছে—নতুন প্ল্যানের ঝকঝকে বাড়ি, ছবির মতো। মালিকের এসে বসত করবার মতো হয়নি এখানে—বাতিল কাঠকুটো জ্বালিয়ে হয়তো বা একটা ঘরে রুটি বানাচ্ছে পশ্চিমা পাহারাদার। জনহীন নিঃশব্দ প্রান্তরের মধ্যে তারার আলোয় এ অঞ্চলটা রূপকথার রাক্ষসে-খাওয়া পুরীর মতো মনে হয়।

আজকে ভারি দুর্যোগ। কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! বিকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে—পৃথিবী ভাসিয়ে একাকার করে দিয়ে যাবে, থামবার কোন লক্ষণ নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অন্ধকারের

বৈঠকখানায় ত্রিদিবনাথ পড়াশুনো করছে—দেয়ালের ধারে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে একপ্রান্তে। কিন্তু কি পড়ছে, মনে তার স্পর্শ লাগে না। পাতা জুড়ে আছ বসে তুমি ঝুমা। ঘর আর ল্যাবরেটরি, বই আর গবেষণা, আরাম আর আলস্যের মধ্যে পাগল হয়ে আপন-জন খুঁজে বেড়াই। ঝুমা তুমি হেসে ওঠ খিলখিল করে। আমাদের এই বড় বড় ভাবনা কত যে অসার, বুঝিয়ে দাও তোমার এক হাসিতে……

দরজা ঠেলে ঝুমা ঢুকে পড়ল। কি আশ্চর্য, মনের ভাবনা মূর্তি হয়ে এলো নাকি? ঝুমা এই রাত্রে গ্রামের ঘরে শুয়ে আছে—সে গ্রাম তো তিন শ' মাইল এখান থেকে। একা নয়—মায়ের কোলে চড়ে মুকুলবাবুও এসেছেন দেখি। বৃষ্টি-বাদলায় ভিজে গেছে। এলে তোমরা কোত্থেকে—বাসা চিনে আসতে পারলে?

যাকগে, জিজ্ঞাসাবাদ পরে হবে, পরে শোনা যাবে। ভিজে কাপড় বদলাও আগে ঝুমা। কিন্তু মুকুলবাবু পরবেন কি? ব্যাক্স-পেঁটরা সঙ্গে দেখছি নে যে?

সে সব রেখে এসেছি তোমার পুরানো মেসে ভুজঙ্গবাবুর ঘরে।

তাই বল! জংবাহাদুর ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়েছেন। নইলে এ জায়গায় আসা চাট্টিখানি কথা নয়।

ত্রিদিব তাড়াতাড়ি শুধার শাড়ি একখানা এনে দিল। আর আলোয়ান একটা—মুকুলের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হোক, নইলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে।

ঝুমা শাড়ি পরল না, পা দিয়ে সরিয়ে দিল। ভ্রূকুটি করে তাকাল ত্রিদিবের দিকে।

এ শাড়ি কার?

একটা মেয়ের—

মেয়েরা শাড়ি পরে, তা জানি। কে মেয়েটা?

ত্রিদিব কঠিন হয়েছে। তুমিও ঝুমা আর দশটা নীচমনা মেয়ের

মতো—স্নেহ-সঙ্গ যেন জগতের সমস্ত-কিছু, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা। এর উপরে কিছু আর থাকতে নেই।

মেয়েটির নাম হল সুধাময়ী। তার বেশী জেনে লাভ আছে?

ঝুমা বলে, লাভ কিছুই নেই, সেটা জানি। শুধু চোখের দেখা দেখতে এসেছিলাম।

দেখা তো হয়নি এখনো। সুধা, রান্না-বান্না রেখে এস একটু এদিকে। দেখে যাও কারা এসেছে, তোমায় দেখতে চায়।

সুধাময়ী কথাটা বুঝতে পারেনি। উঠানের ওদিক থেকে জিজ্ঞাসা করে, কি বলছ?

ঝুমার গলা কাঁপে। বলে, দরকার নেই—আসতে হবে না। ভুজঙ্গবাবুর চিঠির পরেও একেবারে ভরসা ছাড়িনি, খবর হয়তো বা মিথ্যে! পরের ভাল যারা দেখতে পারে না, তাদেরই চক্রান্ত। ডেকো না ওকে—যাচ্ছি আমরা, চলে যাচ্ছি। এসে হয়তো অপমান করে তাড়িয়ে দেবে ঘর থেকে।

সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ঝুমার মতো মেয়ে—তার ভাবনা হচ্ছে, পড়ে না যায় ত্রিদিবের সামনে এই মেঝের উপর। তাতে অপমান, বিষম অপমান। এসেই দরজার খিল এঁটে দিয়েছে জলের ঝাপটার জন্য। আরও কি ভেবেছিল, কে জানে! খিল খুলে ফেলল—ঝড়ের কি মাতামাতি বাইরে! দড়াম করে দেয়ালে আছড়ে পড়ল কপাট দুটো। উল্টোপাল্টা বাতাসে কপাট এদিক-ওদিক ঘা দিচ্ছে। ঝুমা নিস্পন্দ এক প্রতিমার মতো। কে যেন তবু নিদারুণ ব্যথায় দাপাদাপি করছে ত্রিদিবের চোখের সামনে, মাথা খুঁড়ছে ত্রিদিবের পায়ের তলে।

ঝড়ের মত্ততা, মেঘের হুঙ্কার, বৃষ্টির প্লাবন—তারই মধ্যে ঝুমা নেমে পড়ল। কোলে মুকুল। চক্ষের পলকে একেবারে অদৃশ্য। ত্রিদিব বাধা দেবে, দরজা আটকে দাঁড়াবে—কিন্তু কী যেন তার হয়েছে, উঠতে পারল না চেয়ার ছেড়ে, দেহ যেন আটকে আছে

কাঠের চেয়ারের সঙ্গে। ঝাঁপ করবে ঝুমাকে—কিন্তু গলা কাঠ, অনেক কষ্টে অর্থহীন এক আর্তধ্বনি বেরুল, কোন কথা নয়।

বহুক্ষণ পরে বিস্তর চেষ্টায় খাড়া করাল দেহটাকে। আহ্বানও বেরিয়েছে কণ্ঠে—ঝুমা, ঝুমা-আ-আ—

ছুটে বেরুল রাস্তায়। আকাশে ঝিলিক দিল—অনেক দূর অবধি নজরে আসে সেই আলোয়। ঝুমা নেই কোন দিকে। সোজা রাস্তা অনেক দূর অবধি গেছে—বাঁকচুর নেই। ঝড়ের বেগে ঝুমা বোধ হয় ছিটকে পড়েছে কোন বিপথে। আড়াই বছরের ঘুমন্ত মুকুল বুকে। ভয় খেয়ে বাঁচবে কি বাচ্চা ছেলেটা? পাষাণী মা—ঈশ্বর, এমন মায়ের কোলে কেন দাও অবোধ নিষ্পাপ শিশু?

সুধাময়ী এল এতক্ষণে।

কে এসেছে?

ত্রিদিব ফিরে এসে যথারীতি মুখের উপর বই ধরে বসল। বলে, দরজায় ঠকঠক করছিল—ভাবলাম, কেউ এল বা!

সুধা বলে, রাতের মধ্যে বৃষ্টি থামবে বলে মনে হয় না। পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে। এমন অবস্থায় মানুষ বেরুতে পারে?

ত্রিদিব ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

আমিও তাই বলি। মানুষ কি করে হবে? ভূত-প্রেত—হয়তো বা একটা দুঃস্বপ্ন—

তুমি ভালবাস, এতক্ষণ বসে বসে পেস্তার বরফি করছিলাম।

ত্রিদিব বলে, করোগে তাই। একটু ক্ষীর দিও, খেতে আরও ভাল হবে। কাল সকালে চায়ের অনুপান তোমার ঐ নতুন খাবার।

॥ সাত ॥

কী দুর্যোগ! সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। খরবেগে জল পড়ছে—আকাশের জল, পাতালের জল। সর্বগ্রাসী জলস্রোত দংষ্ট্রা মেলে

অট্টহাসি হাসছে যেন। গাছের মাথায়, ঘরের চালে, অট্টালিকার চূড়ায় মানুষ। অসহায় দৃষ্টি মেলে মানুষগুলো তাকাচ্ছে চতুর্দিকে—এই বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যায় শেষ আশ্রয় থেকে।

মাঠের গায়ে ডিঙি বেয়ে যায়—ঠিক সেই রকম বোটের আওয়াজ। দিগন্তে দেখা যায় কি যেন। আসছে এ দিকে—তর-তর করে চলে আসছে এক ভেলা। জীবনে যাদের কলঙ্কের রেখা মাত্র নেই, এমনি সব মানুষ খুঁজে খুঁজে ভেলায় তুলছে। বোঝাই ভেলা অদৃশ্য হল দৃষ্টি-সীমানার পারে—উন্মত্ত আবেগে আছড়ে পড়ে সাত সমুদ্রের সকল জল। বিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবী বড় নোংরা হয়ে গেছে—মহাবন্যায় ধুয়ে মুছে সাফ সাফাই হচ্ছে।

খাপছাড়া এমনি সব স্বপ্ন দেখছে ত্রিদিব। ঘুম ভেঙে গেছে বারম্বার মেঘের ডাকে, আচমকা এসে-পড়া বৃষ্টির ঝাপটায়। আবার এসেছে ঘুম। অন্ধকার নিশীথে বেগবান রেলগাড়ির জানালার আলোর মতো কত অলীক স্বপ্ন পিছলে পিছলে গেছে। তারই মধ্যে···ঐ যে ঝুমা, ঐ আমার মুকুল! নাম ধরে আর্তনাদ করে উঠেছে। মনে হল বটে আকাশ-ভাঙা হাহাকার—কিন্তু গলা দিয়ে ক্ষীণতম শব্দ বেরোয় না। যন্ত্রণা আরো অসহ সেইজন্য। মা আর ছেলে অন্ধকারের আবর্তে নিঃশেষে তলিয়ে গেল—ছুটে গিয়ে ধরতে পারল না, মুখ ফুটে একবার ডাকতেও পারল না অসহায় ঘুমন্ত মানুষ···

শেষরাতে ঝড়বৃষ্টি থামল। উঠে বসল ত্রিদিব; ভেবেছে, সকাল হয়ে গেছে। জানালা খুলে দিল। ঝিকমিকে তারা ফুটেছে আকাশে। সকাল না হলে বেরুনো যাবে না, ভয় করে—জনহীন অঞ্চলটা অশরীরী প্রেতের আস্তানা বলে মনে হচ্ছে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সে রাতটুকু কাটিয়ে দিল।

ভোরের আলোয় তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিককার অবস্থা দেখে। পাড়াটা যেন হামানদিস্তায় ছেঁচে রেখে গেছে। গাছ উপড়ে পড়েছে, বস্তি-বাড়িগুলোর টিন গেছে উড়ে। খানাখন্দ ঘোলা জলে ভরতি—

বর্ষাকালের ব্যাঙ ডুব দিচ্ছে তার মধ্যে। জলস্রোত কলকল শব্দে ছুটেছে রাস্তার উপর দিয়ে। জলকাদা ভেঙে বিস্তর কষ্টে ত্রিদিব ট্রাম-রাস্তায় এসে উঠল।

ট্রাম চলছে না, তার ছিঁড়েছে কোথায়। মেরামত না হওয়া পর্যন্ত মূল-শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। ট্যাক্সিও মেলে না এত সকালে এদিকে। হাঁটো ত্রিদিবনাথ—কি এমন হঠাৎ-নবাব হয়ে গেলে এই কয়েকটা মাসে।

অবশেষে জংবাহাদুরের মেসে পৌঁছানো গেল। রোদ উঠে গেছে। জংবাহাদুর গভীর মনোযোগে বাজারের ফর্দ করছেন।

আপনার অতিথজনেরা কোথায়?

গলা শুনে ভুজঙ্গ চমকে উঠলেন। এ যেন অচেনা কে একজন বলছে। বড় ছুটে এসেছে—হাঁপাচ্ছে তাই।

অবাক হলেন যে—বলুন, যাদের চিঠি লিখে আনিয়েছেন কোথায় তারা? মুকুল আর তার মা। ঝুমা—ঝুমা—আপনার বউমা, মাধবীলতা গো।

জংবাহাদুর বলেন, চলে গেছে। সন্ধ্যের সময় এসে জিনিসপত্র রাখল আমার ঘরে। তোমার বাসা কোথায় জেনে নিল ভাল করে। আমি সঙ্গে যেতে চাচ্ছিলাম, তা বলল, দরকার হবে না। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—তখন আবার দরজা ঝাঁকাচ্ছে। কি বৃত্তান্ত? না, কাজকর্ম মিটে গেছে—চলে যাচ্ছি।

যেতে দিলেন কেন? কুকুর-বিড়াল বেরোয় না ঐ অবস্থায়—আর দেড় জন ওরা এসেছে অজ পাড়াগাঁ থেকে। কিছু জানে না, কিছু বোঝে না।

জংবাহাদুর চাপা উল্লাসে সংশোধন করে দেন, উঁহু, আড়াই। তোমার বাচ্চা হল আধ। আর রইলেন বউমা, আর তোমার বড় সম্বন্ধী।

কে?

[illegible]। তিনিই তো সর্বেসর্বা রেখলায়। হুকুমহাকাম ঝাড়ছেন, তাঁর কথা মতোই সমস্ত হচ্ছে। তা আটকানো তোমারই উচিত ছিল ভায়া। কাজ না মিটিয়ে দিলেই আটক হয়ে থাকছেন, আবার কি!

ভুজঙ্গর কাছে কাজের অর্থ টাকাকড়ি। অসঙ্গত নয়—বিস্তর দেখে শুনেই সার বস্তু বুঝে নিয়েছেন। কথাটা আরও প্রাঞ্জল করে বলেন, ওই যত দেখছ ভায়া, টাকার মত আঠা কোন কিছুতে নেই। হাতে যতক্ষণ টাকা, সবাই লেপটে আছে—তাড়ালেও যাবে না। টাকা ছেড়ে দিয়েছ কি, কোন শর্মার আর টিকি দেখবে না।

মেম্বাররা যে যেখানে ছিল, এসে জমেছে। ত্রিদিবের ঐশ্বর্যের কথা জংবাহাদুর শতকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন এই ক'দিন। তাকে ঘিরে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে কেন ত্রিদিববাবু, বসুন। না হয় চলে আসুন আমার ঘরে। গদি-আঁটা চেয়ার আছে, বসে বেশ জুত পাবেন।

বিশু বলে, চা এনে দেব ত্রিদিব-দা? মোড়ে ত্রিভঙ্গমুরারীর দোকানে বেড়ে চা করছে আজকাল।

ত্রিদিব কাউকে যেন চোখে দেখছে না, কারো কথা কানে যাচ্ছে না তার।

তারা কোথায় চলে গেল, জানেন কিছু?

যেমন প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, তাই ঘটেছে তবে? এই রকমটাই ভুজঙ্গ আন্দাজে ভেবেছিলেন। কণ্ঠস্বরে একটা উদাসীন ভাব এনে বললেন, মেয়েছেলে যাবে আর কোথায়? গাঁটে টাকাপয়সা বেঁধে আবার গিয়ে কোটে উঠেছে। তোমায় কিছু বলে যায়নি ভায়া?

গ্রামের কোটরবাসী কবুতর কলকাতার বাড়ি-গাড়ি-আলোর অরণ্যে হারিয়ে গেল। কোন্‌খানে সে খুজে খুঁজে বেড়াবে? তার চেয়ে জংবাহাদুরের আশ্বাসই মেনে নেওয়া যাক—গেছে ফিরে আবার তাদের গ্রামে। যেমন আর দশটা মেয়ে অদৃষ্টের লিখন শান্ত ভাবে মেনে

নিয়ে দিনরাত ঘরকন্না করে। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের আদিকাল থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—কোন্ বাঘ নিরামিষাশী হয় বলো? সদাসতর্ক হবে তারাই, পশুকে যারা ঘরে নিয়ে বাঁধে, পশুকে পোষ মানাতে চায়।

ঝুমা আলাদা মেয়ে, সৃষ্টিছাড়া – কিন্তু যে দাদাটি সঙ্গে এসেছে, সে কিছু বুঝসমঝ করে দেবে না? দাদাটি কোন্ ব্যক্তি, সেটা আপাতত মালুম হচ্ছে না। ত্রিদিবের এই শহরবাসের আমলে দাদা রূপে কে সমুদিত হলেন ঝুমা হেন মেয়ে যার হুকুম নিয়ে চলে?

লেক-পাড়ায়, মনে হবে, এক জলের জাহাজ টেনে তুলে পিচঢালা রাস্তার ধারে বসিয়ে দিয়েছে। এ পথে চলতে গেলে এক নজর চাইতেই হবে জাহাজ-বাড়ির দিকে। ত্রিদিবের হাসি পায়—অসহ্য লাগে টাকাওয়ালা মানুষগুলোর [illegible] এই স্থূলতা। আরে বাপু, জাহাজ এমন কি দুর্লভ বস্তু যে ইটে-গাঁথা [illegible] জাহাজে বসবাস করতে হবে? যাও না সমুদ্রে—ছ-মাস খা [illegible] জলের উপর জাহাজের দোলা খেয়ে এসো। সমুদ্র পাহাড় আকাশ—কোন্‌টা আজ মানুষের অজানা—কোথায় যেতে আজ সে ভয় করে?

বাইরে যেমনই হোক, তবু রক্ষা, ভিতরেও জাহাজের ডেক-ক্যাবিন বানায়নি। ঝকঝকে সুমসৃণ মেজে—এক কণিকা ধুলো-ময়লা নেই-সারাবাড়ির মধ্যে। মার্বেল-পাথরে মোড়া সিঁড়ি সোজা গিয়ে উঠেছে উপরের হলঘরে। সব লোকের জন্য হয়তো নয়—কিন্তু ত্রিদিব সোজা গিয়ে উঠে বসে সেখানে। শেখরনাথ আর সে কলেজে চিরকাল পাশাপাশি বসেছে। সেই খাতির ইতিমধ্যে ভাল রকম ঝালিয়ে নিয়েছে। আগের চেয়েও বেশি।

যতবারই ত্রিদিব এবাড়ি আসে, তাজ্জব হয়ে শেখরনাথের তারিপ করে। মুখে যেটুকু বলে, মনে মনে বলে তার শতগুণ। কলেজি আমলে নিতান্ত গোবেচারা শেখরনাথের থাকবার মধ্যে চেহারাটাই ছিল শুধু।

বউমার দাদা। তিনিই তো সর্বেসর্বা দেখলাম। হুকুম-হাকাম ঝাড়ছেন, তাঁর কথা মতোই সমস্ত হচ্ছে। তা আটকানো তোমারই উচিত ছিল ভায়া। কাজ না মিটিয়ে দিলেই আটক হয়ে থাকতেন, আবার কি!

ভুজঙ্গর কাছে কাজের অর্থ টাকাকড়ি। অসঙ্গত নয়—বিস্তর দেখে শুনেই সার বস্তু বুঝে নিয়েছেন। কথাটা আরও প্রাঞ্জল করে বলেন, ওই যত দেখছ ভায়া, টাকার মত আঠা কোন কিছুতে নেই। হাতে যতক্ষণ টাকা, সবাই লেপটে আছে—তাড়ালেও যাবে না। টাকা ছেড়ে দিয়েছ কি, কোন শর্মার আর টিকি দেখবে না।

মেম্বাররা যে যেখানে ছিল, এসে জমেছে। ত্রিদিবের ঐশ্বর্যের কথা জংবাহাদুর শতকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন এই ক'দিন। তাকে ঘিরে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে কেন ত্রিদিববাবু, বসুন। না হয় চলে আসুন আমার ঘরে। গদি-আঁটা চেয়ার আছে, বসে বেশ জুত পাবেন।

বিনু বলে, চা এনে দেব ত্রিদিব-দা? মোড়ে ত্রিভঙ্গমুরারীর দোকানে বেড়ে চা করছে আজকাল।

ত্রিদিব কাউকে যেন চোখে দেখছে না, কারো কথা কানে যাচ্ছে না তার।

তারা কোথায় চলে গেল, জানেন কিছু?

যেমন প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, তাই ঘটেছে তবে? এই রকমটাই ভুজঙ্গ আন্দাজে ভেবেছিলেন। কণ্ঠস্বরে একটা উদাসীন ভাব এনে বললেন, মেয়েছেলে যাবে আর কোথায়? গাঁটে টাকাপয়সা বেঁধে আবার গিয়ে কোটে উঠেছে। তোমায় কিছু বলে যায়নি ভায়া?

গ্রামের কোটরবাসী কবুতর কলকাতার বাড়ি-গাড়ি-আলোর অরণ্যে হারিয়ে গেল। কোন্‌খানে সে খুজে খুঁজে বেড়াবে? তার চেয়ে জংবাহাদুরের আশ্বাসই মেনে নেওয়া যাক—গেছে ফিরে আবার তাদের গ্রামে। যেমন আর দশটা মেয়ে অদৃষ্টের লিখন শান্ত ভাবে মেনে

নিয়ে দিনগত ঘরকন্না করে। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের আদিকাল থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—কোন্ বাঘ নিরামিষাশী হয় বলো? সদাসতর্ক হবে তারাই, পশুকে যারা ঘরে নিয়ে বাঁধে, পশুকে পোষ মানাতে চায়।

ঝুমা আলাদা মেয়ে, সৃষ্টিছাড়া – কিন্তু যে দাদাটি সঙ্গে এসেছে, সে কিছু বুঝসমঝ করে দেবে না? দাদাটি কোন্ ব্যক্তি, সেটা আপাতত মালুম হচ্ছে না। ত্রিদিবের এই শহরবাসের আমলে দাদা রূপে কে সমুদিত হলেন ঝুমা হেন মেয়ে যার হুকুম নিয়ে চলে?

লেক-পাড়ায়, মনে হবে, এক জলের জাহাজ টেনে তুলে পিচঢালা রাস্তার ধারে বসিয়ে দিয়েছে। এ পথে চলতে গেলে এক নজর চাইতেই হবে জাহাজ-বাড়ির দিকে। ত্রিদিবের হাসি পায়—অসহ্য লাগে টাকাওয়ালা মানুষগুলোর রুচির এই স্থূলতা। আরে বাপু, জাহাজ এমন কি দুর্লভ বস্তু যে ইটে-গাঁথা নকল জাহাজে বসবাস করতে হবে? যাও না সমুদ্রে—দু-মাস বা দু-বছর জলের উপর জাহাজের দোলা খেয়ে এসো। সমুদ্র পাহাড় আকাশ—কোন্‌টা আজ মানুষের অজানা—কোথায় যেতে আজ সে ভয় করে?

বাইরে যেমনই হোক, তবু রক্ষা, ভিতরেও জাহাজের ডেক-ক্যাবিন বানায়নি। ঝকঝকে সুমসৃণ মেজে—এক কণিকা ধুলো-ময়লা নেই- সারাবাড়ির মধ্যে। মার্বেল-পাথরে মোড়া সিঁড়ি সোজা গিয়ে উঠেছে উপরের হলঘরে। সব লোকের জন্য হয়তো নয়—কিন্তু ত্রিদিব সোজা গিয়ে উঠে বসে সেখানে। শেখরনাথ আর সে কলেজে চিরকাল পাশাপাশি বসেছে। সেই খাতির ইতিমধ্যে ভাল রকম ঝালিয়ে নিয়েছে। আগের চেয়েও বেশি।

যতবারই ত্রিদিব এবাড়ি আসে, তাজ্জব হয়ে শেখরনাথের তারিপ করে। মুখে যেটুকু বলে, মনে মনে বলে তার শতগুণ। কলেজি আমলে নিতান্ত গোবেচারা শেখরনাথের থাকবার মধ্যে চেহারাটাই ছিল শুধু।

তা সে চেহারার ষোলআনা মূল্য সে উশুল করেছে। রায় বাহাদুর কীর্তিধর চাটুজ্যে মেয়ে দিলেন তার ঐ চেহারার গুণে। আর বুড়ো সুবিবেচকও বটে। বিয়ের পরে চটপট দেহত্যাগ করে মেয়েকে যাবতীয় ঘরবাড়ি ও টাকাকড়ির মালিক করে গেলেন। এবং মেয়ে মানে জামাইও। যা জামাই শেখরনাথ, আলাদা করে কিছু দিতে গেলে সে-ই আড় হয়ে পড়ত। মঞ্জুলার সঙ্গে দেহ আলাদা করে দিয়েছেন ঈশ্বর—তার উপরে হাত নেই—সেজন্য যেন মরমে মরে আছে সে।

বাবু কোথায় রে ?

প্রশ্নের উত্তরটাও সুনির্দিষ্ট—কালেভদ্রে কদাচিৎ হেরফের হয়।

মায়ের কাছে—

মঞ্জুলার অয়েল-পেন্টিং দেয়ালটার আধাআধি জুড়ে। বিশাল ছবি—দৈত্য-দানো ছাড়া মানুষ কখন অত বড় হতে পারে না। সামনা-সামনি না হলেও ত্রিদিব দেখছে মঞ্জুলাকে। ছোটখাট মানুষটি—বার মাস একটা না একটা রোগ আছেই। রোগ না থাকলেও বলতে হয় আছে রোগ—নইলে সে শান্তি পায় না। অথচ সেই রোগী মানুষটা যখন হাঁক পাড়ে, বাড়িসুদ্ধ লোকের থরহরি কম্প। এমন যে শেখরনাথ—তিনি অবধি। সুধাময়ী মঞ্জুলার কাছে নার্স হয়ে ছিল কিছুদিন—তার কাছে ত্রিদিব শুনেছে : সুধা বাজে কথা বলবে না। রূপকথায় আছে সূতোশঙ্খ সাপের কথা—সূতোর মতো দেহধারী এক জীবের গলা দিয়ে শাঁখের আওয়াজ বেরোয়। সুধাময়ী হেসে হেসে বলে, সেই জীব হল শেখরনাথের বউ মঞ্জুলা। বিয়ের পর যাকে শেখরনাথ মঞ্জুভাষিণী সম্বোধন করে হামেশাই চিঠি লিখিত। ঐ সব কবিত্বে ঠাসা অনেক চিঠি দেখেছে ত্রিদিব।

এ বাড়িতে এসে কাউকে কিছু বলতে হয় না—ত্রিদিবকে দেখলেই দারোয়ান ছুটে যায় ভিতরে খবর দিতে। রকমারি খাবার চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে, না খেলে শুনছে কে ? আমাদের উপর বাবু তা হলে বিষম খাপ্পা হয়ে যাবেন। সেবা করুন যাহোক কিছু—করতেই হবে।

আজকে হাজার অনুনয়-বিনয়ে ত্রিদিব একঢোক চা-ও মুখে তুলতে পারল না। অভিমানী ঝুমা শিশুকে বুকে চেপে কোন পথপ্রান্তে হয়তো মরে পড়ে আছে—তাদের কি গতি হল না জেনে খাবার কেমন করে সে মুখে দেয়?

ঘণ্টাখানেক পরে শেখরনাথ এলো। অন্য দিনের তুলনায় এসেছে তাড়াতাড়িই। ঐ যে চোখাচখি নামে পাখি আছে—দিনরাত্রি জোড় বেঁধে থাকে, এরা হল তাই। এ ব্যাপারটাও সুধাময়ী রটিয়ে দিয়েছে। কথাবার্তা বিশেষ নেই, বিয়ের পর এই তিনটি বছর চুপচাপ মুখোমুখি বসিয়েই তারা কাটিয়ে দিল। শেখরনাথ শুনে লজ্জা পায় না—বলে, মঞ্জুলাকে সামনে করে তিনশ' বছরও এমনি ধারা কাটাতে পারি; কিন্তু বড় দুঃখ যে ততদিন বাঁচা চলবে না। মঞ্জুলাকে ছেড়ে এই বৈঠকখানায় যেটুকু সময় বসতে হয়, চেয়ারের সামনাসামনি তখনও দেখ মঞ্জুলা—ছবির ঐ সুবিশাল মঞ্জুলা। আর নিতান্ত যদি কাজের গতিকে বাড়ির বাইরে যেতে হয়, আর এক অতিক্ষুদ্র মঞ্জুলা বুকের উপর দুলবে—ঘড়ির লকেটে-আঁকা মঞ্জুলা।

আর এ বাড়ির এক রেওয়াজ হয়ে গেছে—যত জরুরি ব্যাপারই হোক, কথাবার্তার গৌরচন্দ্রিকা হবে, কেমন আছেন আজকে? অর্থাৎ মঞ্জুলার স্বাস্থ্যের খবরাখবর নেওয়া।

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শেখরের চোখে জল আসবার মতো হয়, কণ্ঠস্বর গদ-গদ হয়ে ওঠে।

ঐ মেয়ে বলেই মঞ্জু হেসে ছাড়া কথা বলে না। আমি তো জানি আর ডাক্তারেও বলছে—অহরহ কি জ্বলুনি বুকের ভিতরে!

সুধা কিন্তু মুখ বাঁকিয়ে বলে, ছাই! জ্বলুনি বটে—সেটা অম্বলের নয়, মানুষজনের উপর হিংসা আর ঘৃণা—সমস্ত বিষ হয়ে রি-রি করে জ্বলে।

এ কিন্তু সুধার গায়ের ঝাল মেটানো। চিররুগ্ন মঞ্জুলাকে দেখে ভেবেছিল এখানকার নার্সের এই চাকরি তার পাকা—চিরজীবন ধরে

চলবে। কিন্তু একদিন কি কথা-কথান্তরের পর মঞ্জুলা মেজাজ হারিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল। সেই থেকে সুধা তার নামে নানান কথা বলে বেড়ায়। কিন্তু কে কানে নিচ্ছে কীর্তিধরের মেয়ের নামে হেন অপবাদ? ইদানীং শেখর তো অর্ধেক-নেতা হয়ে উঠেছে—দিন রাত্তির আছে দশের কাজ নিয়ে। কিন্তু কিছুই তার নিজের নয়। মঞ্জুলার ইচ্ছা, মঞ্জুলার পরিকল্পনা, টাকা মঞ্জুলা দিয়েছে—মঞ্জুলাই সমস্ত। মঞ্জুলা নিজে বাইরে না এসে তাকে দিয়ে করায়। মঞ্জুলার দেহ ও মনের সঙ্গে মিশে শেখর একেবারে অভিন্ন হয়ে গেছে।

কেমন আছেন ইত্যাদি চুকিয়ে ত্রিদিব বলে, কাল রাতে এসে পড়ল হঠাৎ—

কারা?

যাদের জন্য ভয়ে কাঁপি। দুনিয়ায় ভয়ের বস্তু তো আমার ঐ দু-জন। তা অহরহ শঙ্কায় থাকার চেয়ে চুকেবুকে যাওয়া মন্দ নয়। তাই কাল হয়ে গেল।

ব্যাপারটার আঁচ করে নিয়ে শেখরনাথ দুঃখ বোধ করে। আস্তে আস্তে বলে, কি বললেন?

আমার বাসার মধ্যে ঢুকে বেশি কি বলতে পারে? মেয়েলোকে পুরুষকে মুখে মুখে বলেই বা কতটুকু? অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যে ছিটকে বেরিয়ে গেল—সেই তো বড় বলা; দুশ্চরিত্র স্বামীকে সব চেয়ে যে কঠিন শাস্তি দিতে পারে নির্মম স্ত্রী।

একটু থেমে আবার বলে, ঝুমার চোখে জল নয়, ছিল আগুন। কিন্তু কোলের ছেলেটা অবোধ কিনা—সেই সময়টা খিলখিল করে হেসে উঠল। কি মিষ্টি যে হাসল শেখর! হাসতে হাসতে মায়ের কোলে চড়ে ঝড়ের মধ্যে নেমে পড়ল—ছেলের হাতের অপমানটা মুলতুবি রয়ে গেল বোধ হয় বয়সে বড় হবার অপেক্ষায়। অবশ্য, বড় হবার দিন অবধি বেঁচে থাকে যদি। মাথার উপরের ঐ ঝড়-জল

কাটিয়েও বেঁচে যাবে, এ তো মনে হয় না। অতএব আমি রক্ষে পেয়ে গেলাম।

শেখর বলে, কলকাতায় থাকা তোমার কিন্তু বুদ্ধির কাজ হয়নি। দূরে—অনেক দূরে কোনখানে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আমি বলেছিলামও তাই।

কিন্তু এখানে ডক্টর পাল, তাঁর ল্যাবরেটারির কাজ—লাভের খাতে আমার অনেক বেশি জমা ক্ষতি-লোকসানের চেয়ে।

কাজ করতে দেবে কি আর এখানে? এই ধর—কাজ করতে পারবে এখন পাঁচ-সাত দিন ল্যাবরেটারি গিয়ে? কুৎসা-অপবাদ আগুনের চেয়েও তাড়াতাড়ি ছড়ায়। বোঝ না কেন—কোন্ ধাপ-ধাড়া গাঁয়ে ওঁরা থাকেন, সেখানে পর্যন্ত কথাগুলো পৌঁছে গেছে।

পারসোন্যাল সেক্রেটারি অতুল এসে বলল, ইস্কুলের একটা মীটিং ডাকা দরকার—প্রেসিডেন্ট বলছিলেন। এইখানেই হোক তবে? কবে আপনার সুবিধা হবে, একটা তারিখ দিয়ে দিন—

শেখর বলে, এই দেখ, তোমাদের কাছে এনগেজমেণ্ট-বই, তোমরাই মালিক—আমার কাছে আরার কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করে দিয়ে দাও একটা তারিখ।

ত্রিদিবের দিকে চেয়ে আগের কথার জের ধরে বলল, মঞ্জু তোমার কথা বলছিল—এত বড় প্রতিভার মর্যাদা এখানে কে বোঝে? বাইরে চলে যাও তুমি। পাসপোর্ট তো হয়েই আছে—চিঠিপত্র যা লিখেছ, জবাব আসেনি কিছু?

ত্রিদিব বলে, এসেছে কয়েকটা। বাজে, উৎসাহ পাচ্ছিনে।

আমি বলি, বেরিয়ে পড় তুমি। ঘরে বসে যারা ঢেউ গোণে, ঘরেই পড়ে থাকে তারা চিরকাল। ঝাঁপিয়ে পড়লে কিনারা মিলে যায়। ট্রাভেল-এজেন্টদের সঙ্গে কথা বল, জাহাজের খবরাখবর নাও। মঞ্জুর বড় ইচ্ছে।

॥ আট ॥

ত্রিদিবনাথ নামল তাদেরই সেই গাঁয়ের স্টেশনে। জংবাহাদুর বলছিলেন, ঝুমারা দেশে গিয়েছে ফিরে। তাই ঠিক, নিশ্চয় তাই—তা ছাড়া যাবে আর কোথায়, কোন্ জায়গা চেনে সে? এই রাত্রে এখন তারা ঘুমুচ্ছে—ঝুমা আর তার ছেলে। যেমন সেবার হয়েছিল সেক্রেটারির ছেলের বিয়ের সময়। ত্রিদিব বরযাত্রী গিয়েছিল, সেক্রেটারির বাড়ির কাজ, না গিয়ে উপায় নেই! মফস্বলের বিয়ে—তিন দিন ধরে পড়ে পড়ে খাওয়া কনের বাড়িতে। সাজো-বিয়ের ভোজ, বাসি-বিয়ের ভোজ, বাসি ভোজ। তা ছাড়া আরও বিস্তর খুচরা খাওয়া—সেগুলো ভোজের হিসাবে পড়ে না। কী একটা পর্ব ছিল, সেই উপলক্ষে ইস্কুলের ছুটি। আর না থাকলেই বা! সেক্রেটারির ছেলের বিয়ে, মাস্টাররা বরযাত্রী—মফস্বল ইস্কুলে সেই তো সকলের চেয়ে বড় পরব। এত বড় ব্যাপারে তিনটে দিন ইস্কুলের ছুটি এমনিই হতে পারে। সে যাই হোক, ব্যাপার কিন্তু অন্য রকম দাঁড়িয়ে গেল। দেনা-পাওনার ব্যাপারে বরকর্তা-কন্যাকর্তার লাঠালাঠি হতে হতে থমকে গেল—সে কেবল বরপক্ষ সংখ্যাল্প বিধায় তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে পড়লেন বলেই। বরকে ঘিরে রেখেছে। ছাদনাতলায় একক সে বেচারী—কোন রকম হেরফের হলে গুরুতর পরিণাম ঘটবে, চতুর্দিক চেয়ে চেয়ে তাই সে নির্ভুল মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। সময়টা আবার বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে ভিজে আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গে জলকাদা মেখে ত্রিদিবনাথ এসে পৌঁছে তো বাড়ির দরজায় ঘা দিল। ঘুমুচ্ছিল ঝুমা, ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তারপর সেই রাত্রে সে রান্না চাপাবেই। ত্রিদিব মিথ্যে করে বলে, খেয়ে এসেছি গো—। মিছামিছি ঢেকুর তোলে; কপ করে ঝুমারই একটা সাজা-পান মুখে ফেলে দেয়। কিছুতে ঠাণ্ডা করা গেল না ও-মেয়েটাকে···

স্টেশন থেকে বাড়ি বেশ খানিকটা দূর। এগারোটার গাড়ি—ঠিক এগারোটা-সাতে এসে পৌঁছবার কথা। আজকে ঘন্টাখানেকের মতো দেরি করে এসেছে। ভাল, এই ভাল। নিশুতি, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। ত্রিদিব একটু বা যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে কোন গাছগাছালি ঠেসান দিয়ে, বসে পড়ছে হয়তো বা ভূঁয়ের আ'লের উপর। কি গরজ তাড়াতাড়ি পৌঁছবার? গোলযোগের মুহূর্তগুলো বরঞ্চ যতখানি পিছিয়ে নেওয়া যায়। কি বলবে ঝুমাকে, প্রবোধ দেবার আছেই বা কি? যা-সমস্ত দেখে এলে ঝুমা, মিথ্যে বলি তা কি করে? চলে যাচ্ছি অপরিচয়ের পৃথিবীতে অনেক—অনেক দিনের জন্যে। তোমার পুণ্য গৃহস্থালীর মধ্যে বসবাস করব বলে আসিনি। যাবার আগে একটুখানি চোখের দেখা—তোমাকে তো বটেই, আর আমাদের মুকুলকে। আমার উচ্ছৃঙ্খলতা ভুলে যেও না কিন্তু, বড় করে আরো ভারী করে মনে গেঁথে রেখো। বিদেশে ছুটোছুটির মধ্যে ঝগড়ার চোখাচোখা কথাগুলো মনে উঠবেঃ একজনেরা ভাবে এখনো আমাকে—ভাবছে ভালোবাসায় নয়, মনের ঘৃণায়।

কিন্তু যা ভাবছে, তেমনটা যদি না ঘটে! ঝগড়া না করে যদি আজকে কেঁদে ফেলে ঝুমা, অশ্রুর বন্যা নামে দাম্ভিক বধূর কপোল বেয়ে! যা হবার হোক, যেতে দেব না আর তোমায়। দরজার ফ্রেমের মধ্যে অপরূপ এক ছবি হয়ে পথ আটকে দাঁড়ায় যদি ঝুমা, আর মুকুলকে চোখ টিপে দেয়—দু-খানা বাহু মেলে তাড়া করে আসে মুকুল!

কী অপূর্ব জ্যোৎস্না ফুটেছে! জুঁইফুলের স্তূপ যেন আকাশ-ভুবন ব্যেপে। হাটখোলার রাস্তায় হয়তো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তারা বলবে, ও মশাই, ফিরে এলেন যে বড়! কী লাটবেলাট হয়ে এলেন? রাত্রিবেলা হলেও ঠাহর করা যাবে, ব্যঙ্গের হাসি প্রচ্ছন্ন ঠোঁটের কোণে। মুরুব্বিয়ানার সুরে বলবে হয়তো, ঢের তো দেখে-শুনে এলেন। আর কেন! এসে পড়লেন তো নড়বেন না। হেন মজা পাবেন না আর কোনখানে।

না হে, পরাজিত হয়ে সে আসেনি—ত্রিদিবনাথ পরাজয় মানবে না জীবনে। এই বদ্ধ গাঁয়ে ঝুমা আর মুকুল আবার ফিরে এল, পারে তো তাদেরই উদ্ধার করে নিয়ে যাবে নগরে। বড় রাস্তা ছেড়ে ত্রিদিব সঙ্কীর্ণ গলিপথে ঢুকল। ঢুকে পড়ল কারো ভয়ে নয়—বিষম বিরক্তিকর এখানকার বাজে বাসিন্দাগুলো। কি বোঝে ওরা, কার যোগ্যতা আছে ত্রিদিবের সমকক্ষ হয়ে তার সঙ্গে কথা বলবার!

পাড়ার ভিতর এসে পড়েছে, এর ঘরের কানাচ ওর বাগিচার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ঘরবাড়ি সব নিশুতি। তবু ত্রিদিব পা টিপে টিপে সন্তর্পণে এগুচ্ছে। পদশব্দ কারো কানে না যায়, কেউ কিছু প্রশ্ন না করে। পুরানো জায়গায় এতদিন পরে যেন সে চোর হয়ে ঢুকল।

উঠানের পাশে বাদাম গাছ। পাতা পড়ে পড়ে তলায় রাশীকৃত হয়ে থাকে, পায়ের পাতা ডুবে যায়। পাতা উড়ে উড়ে আসে উঠানে। ঝুমার এই এক বড় কাজ ঝাঁটপাট দিয়ে দিনের মধ্যে অমন দশ বার উঠান সাফ করা। যেন আড়াআড়ি চলে প্রতিদিন। গাছ কত পাতা ছড়াবে ঝুমার উঠানে, আর ঝুমাদেবী গাছকোমর বেঁধে কত সাফ করবে উঠানের পাতা। কিন্তু আজকে এত পাতা উঠানে—ত্রিদিবের পায়ে পায়ে পাতা ছিটকে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না কাউকে, দাওয়ায় উঠে দরজায় ঘা দেওয়া অনাবশ্যক। ঝুমারা ফিরে আসেনি। সেই কালরাত্রে কোথায় যে চলে গেল—আর কি আসবে না কোন দিন এ বাড়ি?

ক্ষিধে পেয়ে গেছে ত্রিদিবের। এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে ডাকলে সোনা হেন মুখ করে খেতে দেবে। কিন্তু কি জন্যে যাবে সে নিজের ঘর-উঠান ছেড়ে? অভিমান আসে নিষ্ঠুর সেই দূরবর্তিনীর উপর। সেই কখন বেরিয়েছি বলো তো! কত ঝঞ্ঝাট পোহায়ে গাড়ি বদলা-বদলি করে এসেছি—ক্ষিধে পাওয়াটা অন্যায় হল নাকি? যাকগে—আমার ক্ষিধে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না তো কারো!

হাতের কাছে ছেঁড়া-মাদুর পেয়ে সেইটে বিছিয়ে ত্রিদিব গড়িয়ে পড়ল। দরজায় তালা দেওয়া—মাদুরটা না পেলে গড়িয়ে পড়ত মাটির উপরেই। এই মাটিতে—যেখানে থপথপ পা ফেলে মুকুল ঘুরে বেড়াত, ঝুমা শতেক কাজে এই জায়গা দিয়ে নিচের ঐ পৈঠা দিয়ে উঠা-নামা করত। আঙুলে কর গণে হিসাব করছে ত্রিদিব। মঙ্গলে মঙ্গলে আট—আর এক মঙ্গলে পনেরো; বুধ বিষ্যুৎ শুক্কুর মোট আঠারো হল। আঠারো দিনের মধ্যে এমন সোনার বাড়ি পুরোপুরি শ্মশানভূমি।

ঘুম হচ্ছে না। দিনমান বলে মনে হয়, এত জ্যোৎস্না! ত্রিদিব দিনে ঘুমোয় না। চাঁদের জ্যোৎস্না নয়—মাটি থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে জ্যোৎস্না যেন, গাছের পাতা থেকে পিছলে এসে পড়ছে। ঘুম আর জাগরণের মধ্যে দোল খাচ্ছে সমস্ত রাত। এক একবার মনে হয়, মরে গিয়েছে সে বুঝি! প্রাণ দেহ ফেলে মহাব্যোমে উধাও হয়, সেই চরম বিদায়ক্ষণে সে নাকি বাসভূমি বারকয়েক ঘুরে ঘুরে দেখে যায়। যতদূরে যে জায়গায় মরুক, আসতেই হবে একবার তাকে। নিশ্বাস ফেলতে পারে না, সে ক্ষমতা নেই যখন—জীবন্তকালের প্রিয় বস্তুগুলোর উপর শুধু একবার দৃষ্টির করুণস্পর্শ বুলিয়ে যাওয়া। ত্রিদিবেরও তাই হয়েছে, দেখাশুনা তো হয়ে গেল—চিরকালের মতো কালকেই সে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

ফিরতি ট্রেন অনেক বেলায়। রাতারাতি পালিয়ে যাওয়া অতএব ঘটে উঠল না। ঐ যে দাওয়ায় উঠে পড়েছিল, সেই জায়গা থেকে নামেনি আর মোটে। মুখ গুঁজড়ে বসে রইল এক জায়গায়। ঘণ্টা তিনেক এমনি কাটিয়ে দিয়ে যথাসময়ে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে।

তাই কি হবার জো আছে? মুখ-আঁধারি থাকতেই মানুষ। খাল-পারের হরেন ভদ্র অভিভাবক স্থানীয়। বরাবর দৃষ্টিসুখ দিয়ে এসেছেন। বাতাসে যেন খবর হয়ে গেছে; ঐ সাত সকালে বোধ করি সাঁতরে খাল পার হয়েই উঠানে এসে তিনি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন।

কখন এলে বাবাজি? বউমা তো মামা না মাসি কার বাড়ি চলে গেছেন। তা সারা রাত্তির এখানে পড়ে আছ, আমাদের ওখানে গিয়ে উঠলে না কেন?

ত্রিদিব আশ্চর্য হয়ে যায়। মামা বা মাসি কেউ নেই ঝুমার। একমাত্র মা—মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তিনি কাশীবাসী হয়ে আছেন। ত্রিভুবনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় বলতে ঐ একজনকেই জানে শুধু। ত্রিদিব ছিল না—সেই ফাঁকে বিস্তর আপন-লোকেরা আবির্ভূত হয়েছেন। কোন্ এক দাদাকে নিয়ে কলকাতায় জংবাহাদুরের মেসে উঠেছিল। তার উপরে শোনা যাচ্ছে এই সব মামা-মাসি।

এইসব বলে হরেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন; আসল কথা তিনি প্রকাশ করতে চাননি। কিন্তু প্রকাশ হল সেটা অন্য দশজনার মুখে। হল অনতিপরেই। ছোটখাট এক ভিড় জমে উঠল। নানান জনের নানা রকম প্রশ্ন।

ভাল আছ বাবাজি?

মুখ তুলে বিরস দৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে ত্রিদিব ঘাড় নাড়ল।

কি করা হয় এখন? সুবিধে-টুবিধে হল কিছু?

কথার জবাব তবু সে দিল না। ঠোঁটের উপর নিঃশব্দ হাসি। এর থেকে যা বোঝার বুঝে নাও।

কায়দায় পেয়ে গেছেন—সহজে কি রেহাই দেবেন ওঁরা? বটা চাটুজ্জে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দাওয়ার উপর উঠে অন্তরঙ্গ ভাবে পাশে এসে বসলেন।

ঘরবাড়ি ক'দিনের মধ্যে কসাড় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। হা রে সংসার!

অর্থাৎ সেই কথা আসন্ন হয়ে উঠেছে, এতক্ষণ ধরে যা এড়াবার চেষ্টা করছে। আর ঠেকানো যায় না।

শক্ত হও বাবাজি, মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে নিশ্বাস ফেললে আর হবে কি!

ত্রিদিব হেসে ওঠে।

বেঁচে থাকতে হলে নিশ্বাস তো ফেলতেই হয়। কিন্তু মাথায় হাত দিয়ে বসতে কখন দেখলেন আমায় কাকা?

গ্রামসুদ্ধ অঞ্চলসুদ্ধ মানুষ মাথায় হাত দিয়েছে, তুমি দেবে সে আর বড় কথা কি! বলিহারি স্ত্রীবুদ্ধি—পদ্মবন ছেড়ে পাঁকে বসত। তুমি কলকাতায় চলে গেলে, শঙ্কর তারপর একেবারে ষোলআনা হয়ে জেঁকে বসল। দাদা বলতে বউমার নোলায় জল সরে, তখনই সব মালুম হয়েছিল—

হরেন ভদ্র প্রবোধ দেন, কি এল গেল তাতে? গেছে চলে—নিজের কপাল নিয়ে গেছে। তোমার কাঁচকলা। কালকের ছেলে তুমি—আবার বিয়েথাওয়া করে সংসারি হও। ঘায়ের দাগ দু-দিনে মুছে যাবে।

আরও খানিকক্ষণ বসে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু আর চলে না—কানের ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করে শুনতে শুনতে। এত জনের দুশ্চিন্তা তাকে নিয়ে, এমন সব আত্মীয়সুহৃদ এই জায়গায় রয়েছেন পড়ে, ত্রিদিবের কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। দাওয়া থেকে সে নেমে পড়ল—হন-হন করে চলেছে, পিছনে তাকিয়ে দেখবার ভরসা নেই। হয়তো বা ছুটে এসে জাপটে ধরবেন, ভদ্রমহোদয়গণের ভালবাসা এতদূর! সোজা চলে যাবে একেবারে স্টেশনে। সেখানেও বসবে না। গাড়ির দেরি থাকে তো হাঁটতে হাঁটতে পরের স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে উঠবে।

নিচু চোখে দেখত ঐ সব মানুষজন—এইবারে তারা দিন পেয়েছে। এ ভারি তাজ্জব—ঝুমা যদি কদাচারী হয়, তার জন্য ত্রিদিব ছোট হয়ে গেল কিসে? তার অনুপস্থিতিতে শঙ্করের সঙ্গে ঝুমার মেলামেশা বাড়াবাড়ি রকমের হয়েছে—দল বেঁধে এসে চাপা উল্লাসে ত্রিদিবকে কেন তা শোনাতে এসেছ? তোমাদের কথা যদি ঠিক হয়, ভালই তো, পৃথিবীর পথ নিষ্কণ্টক হল ত্রিদিবের পক্ষে—পিছনে ডাকবার

কেউ রইল না। মুকুলও নেই—বেরিয়ে গেছে মায়ের সঙ্গে। সেই দুর্যোগের মধ্যে চলে যাবার সময়—কই, কেঁদে ওঠেনি তো সে একবার, দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে ত্রিদিবের কোলে উঠতে চায়নি।

মাসখানেক পরে।

হাওড়া স্টেশন। বোম্বে-মেল প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কামরার সামনে বড় সোরগোল। মানুষজনের অবধি নেই। মেয়েরাই বা কত! বছর বাইশ-চব্বিশের সুশ্রী সুঠাম এক ছোকরা বিলাত যাচ্ছে। কত মালা পরাচ্ছে তাকে, তোড়া হাতে দিচ্ছে। সবিনয়ে উপহার গ্রহণ করে সমস্ত একটা জায়গায় নামিয়ে রাখছে—ফুলের পাহাড় হল বার্থের উপরটায়।

ত্রিদিবও যাচ্ছে এই গাড়িতে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওদিকে, আর হাসে। কি রঙ্গ করছে ঐ ছেলেমানুষটাকে নিয়ে! তার বয়স বেশি, দেখাশুনা বিস্তর—হেন কাণ্ড তাকে নিয়ে হলে বরদাস্ত করত না কখনো। আর মানুষই বা কোথায়, তাকে ঘিরে ধরে অমন ভালবাসা জানবার! ভাগ্যিস নেই—নইলে প্লাটফরমের উপর শত চক্ষুর সামনে এমনি তো এক নির্লজ্জ নাটকের নায়ক হত! বাসা থেকে বেরিয়ে হাওড়ায় কি লিলুয়ায় যাই—কোন সম্বর্ধনার কারণ ঘটে না। আর হাওড়া স্টেশন থেকে বোম্বে, সেখান থেকে কয়েকটা সমুদ্র পার হয়ে বাইরে যাওয়া এমন কি বীরত্বের কাজ, যার জন্য গাড়ি-ভরতি ফুল আর চোখ-ভরতি প্রেমাশ্রু বয়ে এনে হুল্লোড় করতে আসে। হাসি পায় ত্রিদিবের। শিশু—নিতান্তই ছেলেমানুষ ওরা মনে মনে। বাইরের জগৎ সম্পর্কে এখনো অজ্ঞাত আশঙ্কা আর বিচিত্র বিস্ময়। অনেক কাল আগে কে এক দৃশ্য দেখেছিল অযোধ্যা ছাড়িয়ে এক গ্রাম্য স্টেশনে। স্টেশন-ভরতি মানুষ—মেয়েমানুষই পনের আনা—হাউ-হাউ করে সকলে কাঁদছে। কি বৃত্তান্ত—না, জন-কয়েক কলকাত্তা শহরে যাচ্ছে কামকা ওয়াস্তে। মানুষগুলোকে যেন

শূলে চাপানো হচ্ছে, এমনি চেঁচামেচি লাগিয়েছে। তাদের চেয়ে অধিক কি এগিয়েছে এরা ?

ত্রিদিবের আপন-জনের মধ্যে একমাত্র সুধাময়ী। হোল্ড-অল খুলে বিছানা করে দিচ্ছে রাত্রের মতো, কুঁজোয় জল ভরে আনল, কিছু ফল কিনে ভরে দিল বাস্কেটে—ছুরিটা ধুয়ে-মুছে ফলের সঙ্গে রাখল। একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দেবে, বিষম ব্যস্ত সুধাময়ী। ঐ একটি মানুষ ছাড়া আর কেউ আসেনি ত্রিদিবকে বিদায় দিতে। আসার কথাও নয়—চলে যাচ্ছে সে-খবর জানে ক'জনই বা! কী এমন অসামান্য ব্যাপার যে ঢাক পিটিয়ে জানান দিতে হবে ? শেখরনাথের বাড়ি আজ যেচে গিয়ে অভিনন্দন নিয়ে এসেছে। ফুল নয়—সত্য বস্তু, টাকা ; ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ড্রাফট। আর মঞ্জু-বউ সদিচ্ছা জানিয়েছেন—যেমনটা বরাবর হয়ে থাকে—শেখরের মারফতে। ওঁদের ঐ দু'জনের সদিচ্ছাটুকু বজায় থেকে তামাম জগৎ বিগড়ে গেলেও ত্রিদিব ডরায় না।

সুটকেস টেনে এনে ত্রিদিব তাড়াতাড়ি চাবি খুলছে। সুধাময়ী অবাক হয়ে বলে, কি ?

একটা চিঠি দিয়ে যাব তোমার কাছে—

বের করল এক সবুজ খাম। সবুজ রঙের দামি কাগজে পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা অক্ষরে ছবির মতো করে লেখা সুদীর্ঘ চিঠি। আগাগোড়া একবার চোখ বুলিয়ে ত্রিদিব হাসিমুখে চিঠিখানা সুধার হাতে দিল।

ভুল করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার গরজটা কি ? আর, গরজ পড়লে রইল তো তোমার কাছে! খুব যত্ন করে রেখে দিও, না হারায়।

সুধা হাত সরিয়ে নেয়। তীব্রস্বরে বলল, আমি ছোঁব না।

ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলে, ছিঃ, গরিব মানুষের রাগ করতে নেই। বোকারাই রাগে অপমানে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। কি শিখলে তবে অ্যাদ্দিন আমার মতন মহৎসঙ্গে থেকে ?

চোখ বড় বড় করে সুধাময়ী ত্রিদিবের দিকে তাকাল। চোখে অশ্রুর আভাস।

কি করব আমি এ চিঠি নিয়ে?

যত্ন করে রেখে দিও। ধর, বিদেশ-বিভুঁয়ে আমি মরে গেলাম। আর তোমার অল্পবয়স—কিছুই বলা যায় না সুধা—

ভ্রূকুটি করে সুধাময়ী বলে, কি?

পৃথিবীর পথ অতি পিছল। কার কি গতি হবে আগে থাকতে কেউ বলতে পারে না। এইটুকু বয়সে কম তো দেখলে না! সবুজ চিঠি হল দলিল। এটা যতক্ষণ আছে, আর যা-ই হোক, তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটবে না।

উৎপলার মতো—হ্যাঁ, উৎপলাই তো! প্রসঙ্গ বন্ধ হয়ে গেল। উৎপলা হন-হন করে অতি দ্রুত আসছে।

খবর পেলে কি করে উৎপলা?

খবরের কাগজের লোক, সেটা ভুলে যেও না ত্রিদিব-দা। খবর আমাদের খুঁজে বেড়াতে হয়।

ত্রিদিব হেসে বলে, নগণ্য অতি-নিন্দিত এক ব্যক্তি—আমায় নিয়ে খবর হয় নাকি কাগজের?

উৎপলা বলে, আজকে না-ই হোক, একদিন তুমি খবর হয়ে উঠবে—আমি নিশ্চিত জানি। এখন ছাপা না হোক, আর একদিন দরকার পড়বে তোমার এই বিদেশ যাবার বৃত্তান্ত—কি করে, কেমন অবস্থায় তুমি রওনা হয়েছিলে। সঠিক তারিখ নিয়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি হবে। সেদিন খ্যাতিমানের সঙ্গে আমার সামান্য নামটাও লোকের চোখে আসবে—সেই লোভে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

সন্ধানটা দিল কে? হাত গুণে টের পাও নাকি উৎপলা?

অভিমানের সুরে উৎপলা বলে, অদৃষ্টে ছিল তুমি ঠেকাবে কি করে ত্রিদিব-দা? এসপ্লানেডে সেই দেখা—আজে-বাজে কত কথা বললে—মুখ ফসকে একটা বার বেরুল না যে তুমি বাইরে চলে যাচ্ছ

সাংঘাতিক মানুষ তুমি। ভাগ্যিস গিয়েছিলাম শেখরনাথের ইস্কুলে। প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউসন সেখানে—নেমন্তন্ন করে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, রিপোর্ট ভাল ভাবে যাতে বেরোয়। নিজ মুখেই তিনি বললেন, গুণের সমাদর করেন তিনি কত। তোমার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ দেখে টাকা খরচ করে বাইরে পাঠাচ্ছেন।

উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে ওঠে উৎপলা। বলে, শুনেই মীটিং ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম স্টেশন-মুখো। শেখরনাথ কটমটিয়ে তাকাচ্ছিলেন—নেহাত অশোভন না হলে হাত ধরে টেনে ফের বসিয়ে দিতেন।

ঘণ্টা দিল, এইবার গাড়ি ছাড়বে। ত্রিদিব চকিতে তাকাল ছোকরার কামরার সামনে সেই জনতার দিকে—প্লাটফরমে নেমে এসে ছোকরা গুরুজনদের প্রণাম করল। কোলাকুলি করল সমবয়সি অনেকের সঙ্গে। একটি সুন্দরী মেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে—চোখে জল টলটল করছে। কাছে গিয়ে কি বলছে—ঝর-ঝর জল পড়ল মেয়েটির দু-গাল বেয়ে। সলজ্জে তাড়াতাড়ি মুছে সে হাসবার মতো ভাব করে।

ত্রিদিব এদিক-ওদিক তাকায়। আরও একজন খবর পেয়ে থাকে যদি দৈবাৎ! একজন কেন—মা ও ছেলে, ওরা দু-জন। হ্যাঁ—মুকুলও জ্ঞানবান বুদ্ধিমান শক্তিমান মানুষ একজন। প্লাটফরমের জনারণ্যে মুখ লুকিয়ে চুপি-চুপি দেখছে হয়তো তারা। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ত্রিদিবের ব্যাকুল দৃষ্টি চারদিকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

॥ নয় ॥

হল কত দিন? রওনা হবার সালটা অবধি ভেবে বলতে হয় এখন। তারপর আঙুলের কর গুণে হিসাব কর, ক'বছর হয়ে গেল। উদ্দাম তরঙ্গ-তাড়নায় ত্রিদিব ভেসে বেড়িয়েছে নানান দেশের ঘাটে ঘাটে। অবশেষে আবার একদিন বোম্বের বন্দরে এসে নামল। কত দিন—দেখ এবারে হিসাব কষে। দশ দশটা বছর পাখির ঝাঁকের মতো একের পিছনে আর এক—পাখনা মেলে উড়ে পালিয়ে গেছে।

এখনকার এই নতুন কাল। ত্রিদিবের নামে বুক ফুলে ওঠে একালের ছেলেমেয়েদের, তার গৌরব সকলে ভাগ করে নেয়। কিন্তু সেই কালের জানাশুনো লোকগুলো? নিতান্ত ভদ্রতা বশে গায়ের উপরে থুতু না ফেললেও ঘৃণা ছুঁড়ে মারে বুঝি চোখের দৃষ্টিতে। অত্যন্ত ইতর তুমি ত্রিদিবনাথ, নিরীহ স্ত্রী আর নিষ্পাপ শিশুকে অকূলে ভাসিয়ে সরে পড়েছিলে—মুখে আগুন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার, তোমার মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

একালের সম্ভ্রম আর সেকালের কুৎসা—এরই মধ্যে পা ফেলে ফেলে স্বদেশে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে।

হাওড়া স্টেশনে নেমে সে এদিক-ওদিক তাকায়। কাকে দেখতে পাবার প্রত্যাশা করছে? আসবার খবর জানায়নি কাউকে—পরম উপকারী শেখরনাথকেও নয়। বিদায়ের দিনে তবু তো দুটো মানুষ এসেছিল—সুধাময়ী আর উৎপলা। খবর দিলেও কি আসতে পারত আজ তারা? সুধার এখন গ্রামে বসতি—গোড়ার কয়েকটা বছর চিঠি লেখালেখি চলছিল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল, ত্রিদিবই সুধার চিঠির জবাব দেয় নি। ভুবনের ডামাডোলের মধ্যে হাবা মেয়েটা মন থেকে পিছলে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল, আজকে নির্বান্ধব নিজ দেশে পা দিয়ে আবার তার খোঁজ পড়েছে।

আর উৎপলা দেবী—সে-ই বা কোথায়, কে জানে! বিয়েথাওয়া করে খুব সম্ভব পুরোপুরি সংসারী সে এখন, ডাইনে বাঁয়ে ট্যাঁ-ভ্যাঁ করছে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। হরিদাস সেই তখনই তার বিয়ের জন্য হুলস্থুল লাগিয়েছিলেন—ত্রিদিবকেই বলেছেন কতবার। স্ত্রী মারা যাবার পরে ছেলের বিয়ের জন্য একবার লেগেছিলেন, সে তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! ফাঁকা সংসারে হরিদাস থাকতে পারেন না। চতুর্দিকে হৈ-হৈ গণ্ডগোল, দেবাসুরের লড়াই চলবে—তবেই তাঁর পড়াশুনা ও দার্শনিক সাধনা। শ্মশানভূমির মতো নিঃশব্দ ঘরবাড়িতে থেকে থেকেই তো তাঁর মাথা খারাপ হয়ে উঠল। বাপ-সোহাগী উৎপলা। আর কিছু না হোক, বাপের জন্যই সে ঘরসংসার জমিয়ে তুলেছে। আহা হোক তাই। শান্তির গৃহস্থালি গড়ে সকল মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাক। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে জীবনপাত করছ তুমি ত্রিদিবনাথ—বিপুল পরমাণুশক্তি খুঁজে বের করেছ। নরহত্যার জল্লাদ বানিয়ে তুলো না তাকে, আলাদিনের দৈত্যের মতো সে মানুষের হুকুমবরদার হোক। তোমাদের সাধনায় সুখের বন্যা বয়ে যায় যেন মানুষের সমাজে, অসুখ-অশান্তি দূর হয়ে যায় চিরকালের মতো।

শহর কলকাতায় এসে কোথায় এবার ডেরা বাঁধবে, কিছুই সে জানে না। অতএব মালপত্র স্টেশনে জমা রেখে বেরুল। যাবে কোথা—কোন এক হোটেলে, না পরম গুণগ্রাহী শেখরনাথের কাছে? ট্যাঁক প্রায় খালি। এদিক-সেদিক করতে করতে দেখা গেল, শেখরনাথের জাহাজ-বাড়ির সামনেই ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে।

নতুন সব লোকজন—তারা কেমন-কেমন চোখে তাকায়। কিন্তু ত্রিদিবের সিঁড়ি ভেঙে ওঠার রকম দেখে মুখ ফুটে কিছু বলল না। বৈঠকখানায় মঞ্জু-বউর ছবি—তেমনি হাসছে সমস্ত দেয়ালখানা জুড়ে দাঁড়িয়ে। সে আমলের চেনা মানুষ দেখা যাচ্ছে না যে নিজে থেকে ভিতরে গিয়ে ত্রিদিবের নাম বলবে। ছাপা-কার্ড তাই পাঠিয়ে দিল।

স্লিপিং-গাউন-পরা অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে শেখর ছুটে এলো। সবে ঘুম থেকে উঠেছে—চোখ কচলে দেখে সত্যি সত্যি সেই ত্রিদিব ঘোষ কিনা!

কবে এসেছ, কোন্ ট্রেনে? কাউকে জানতে দিলে না—চিরকাল একই ভাব তোমার! এত বড় হয়ে এসেছ, তবু এখনো তাই—

ত্রিদিব নিশ্বাস ফেলে ঘাড় নাড়ল, উঁহু—অনেক আলাদা।

সেইটে মনে রেখো। সেই আগের ত্রিদিব আর তুমি নও।

নামের কার্ডটা মেলে ধরে হাসতে হাসতে বলে, আগে-পিছে কত অক্ষর জুড়ে নাম এখন ডবল হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেই ওজন বুঝে সব সময় চলবে। বোম্বে নেমেই তার করা উচিত ছিল, আমরা স্টেশনে উপস্থিত থাকতাম।

বিয়ের বর আসছি যেন—তাই খবর দিতে হবে! বাজি-বাজনা করে বর তোমরা ঘরে তুলে আনবে।

ঠিক তাই। আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে এসেছ তুমি।

ব্যঙ্গের সুরে ত্রিদিব বলে, বটে?

ঠাট্টা নয়। বাইরের লোকের চোখে তুমি আমাদের ভারতকে বড় করে তুলেছ।

ত্রিদিব নিরীহ ভাবে বলে, বিশ্বাস করো ভাই, সে মতলব আমার ছিল না। চেয়েছিলাম শুধু নিজেকে বড় করতে। নিজেকে ছাড়া কাউকে আমি চিনিনে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঘরে বসে অত শত খবর তোমরা টের পাও কি করে?

শেখরনাথ বলে, স্টকহলমের নোবেল-ইনস্টিট্যুটে তুমি পেপার পড়লে, প্রোফেসার ব্লাকেট শতমুখে তার ব্যাখ্যান করলেন, চারদিকে হৈ-হৈ! মঞ্জুলা খবরের কাগজ থেকে আমায় দেখিয়ে দিল—দেখ, ডক্টর ঘোষের কাণ্ড। চিঠি লিখেছেন এই বক্তৃতার ঠিক চার দিন পরে। হল্যাণ্ডে কাঠের জুতো পরে বেড়ানো, ইণ্টারলাকেনে স্কি করা—চার পৃষ্ঠা জুড়ে বর্ণনার ঠাসবুনানি, আর সবচেয়ে বড়

ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ চিঠির কোনখানে নেই। আমাদের কি ভাবেন, তা হলে বোঝ। মঞ্জু সেদিন অনেক দুঃখ করেছিল।

চোখ বড় বড় করে ত্রিদিব বলে, বলো কি হে, দেশের ভোল বদলেছে তবে তো! রাজনীতির আর গণনায়কদের কথা ছাড়াও এইসব বাজে ব্যাপার ছাপে খবরের কাগজে, আর পড়ে তা মানুষে? বড় মুশকিল, কিছুই আর লুকো-ছাপা থাকে না ছোট্ট পৃথিবীটার ভিতর!

শেখর বলে, সকলের আগে যে-মানুষটি সেই খবর পড়েছিল, সবচেয়ে যার বেশি আনন্দ, সে আজকে নেই।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। পিছনে ফিরে তাকায় অয়েল-পেন্টিং-এর দিকে। বলে, মঞ্জু-বউ নেই এমন দিনে। এত আনন্দে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে ভাই। সে থাকলে এতক্ষণ কি কাণ্ডটা করত, দেখতে পেতে।

কাণ্ড হয়তো করতেন, কিন্তু দেখতাম কি করে! যখন বেঁচে ছিলেন, কখনো তো চোখে দেখিনি।

পাষণ্ড ত্রিদিব—এমন কথা এই জায়গায় বেরুলো মুখ দিয়ে! আবার টিপ্পনি কাটে, অবশ্য ত্রিদিবনাথ ঘোষের সামনে বেরোননি বলে যে ডক্টর ত্রিদিব ঘোষের সামনেও আসতেন না সেটা নিশ্চিত বলা যায় না।

শেখর খোঁচা দিয়ে বলে, চোখে না-ই দেখে থাকো, তোমায় বাইরে পাঠাবার মূলে সে—এটা তোমার না জানার কথা নয়।

ত্রিদিবও ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, তিনি মূল—সে তো একশ'বার জানি। আরও জানি, তাঁর সঙ্গে আমার চোখাচোখি না হয়, মুখোমুখি কোন কথা বলতে না পারি, সেটাও বরাবরের ইচ্ছা তোমার। আজকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত—এতক্ষণ ধরে গা এলিয়ে এখানে বসে তাই এত কথা বলতে পারছি।

দুই বান্ধবের নিতান্ত সাধারণ কথাবার্তা, কিন্তু এক তিক্ত অন্তর্ধারা

বয়ে চলেছে নিচে নিচে। শেখরনাথ ভ্রকুটি-দৃষ্টিতে তাকায়। ত্রিদিব আমলে আনে না। হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল, স্ত্রীকে তুমি অত্যন্ত ভালবাসতে, যাকে বলে প্রাণ-ভরা ভালবাসা—তাই না?

যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠে শেখর বলে, বাসতে মানে? ভালবাসি এখনও। চিরকাল বাসব। সাধারণ যাদের সর্বদা দেখতে পাও, মঞ্জুলা সে দলের নয়। স্বর্গের মেয়ে।

পাপ কলিযুগের মেয়ে নন, সে কথা মানি। অত ধনসম্পত্তি চোখ বুজে তোমার হাতে সঁপে দিলেন, তাকিয়েও দেখতেন না। আধুনিক এঁরা তো শুনতে পাই, বাসর-ঘরেই বরের চালচুলোর হিসাব নিতে লেগে যান। না, ভুল হল—তার বহুৎ আগে থেকেই—

উচ্ছ্বাস ভরে শেখর বলে চলেছে, ভরা সংসার ফেলে চলে গেল। এদ্দিন কবে একমুখো বেরিয়ে পড়তাম—কিন্তু পথের কাঁটা দুই মেয়ে। মঞ্জুলার স্মৃতি, ভাঙা বুকের উপর তাদের আঁকড়ে ধরে কোন রকমে বেঁচে রয়েছি।

ত্রিদিব তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। বলে, টাকাকড়ি নামযশ স্বাস্থ্য অফুরন্ত তোমার। কি জন্যে ভাঙা বুক বয়ে বয়ে বেড়াবে? মেরামত করে ফেল ভাই, তোমার পক্ষে তা মোটেই শক্ত হবে না।

শেখর বলে, তুমিই আগে চেষ্টা দেখ। আমার তো দুটো মেয়ে রেখে গেছে। তোমার কে আছে? ছেলেটাও তো সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

মুখের মতন জবাব। ত্রিদিবের মুখে যেন ছাই মেখে দিয়েছে। কেমন, যাবে লাগছে শেখরের সঙ্গে? সকলের চোখে বড় হয়েছে ত্রিদিব—কিন্তু শ্রান্ত অবসরের সময় কাছে এসে দাঁড়াবার একজন কেউ নেই।

না, আছে বই কি। সুধাময়ী। জোর তাগিদ দিয়ে সেই দিনই ত্রিদিব চিঠি লিখল—

চলে এসো। শেখরনাথের কাছ থেকে চাবি এনে ঘরের তালা খুলেছি। ছোবড়া বেরিয়ে-আসা খাটের গদিতে শুয়ে শুয়ে আরামে এতক্ষণ দেয়ালের জালের মধ্যে মাকড়সার নিঃশব্দ শিকারের কায়দা দেখছিলাম। আর কি কাজ। শুধুমাত্র তিন কাপ চা খেয়ে এসেছি বাইরের দোকানে গিয়ে। গোপলার আজও পাত্তা পাইনি—আছে কি এতদিনে মরে ফৌত হয়েছে, কে জানে? যাই হোক, তুমি তো বেঁচেবর্তে রয়েছ—শহরে এসে আবার রাজত্ব জমাও। অভাজনের নইলে ভারি মুশকিল···

সেই পুরানো বাড়ি—বিলেত যাবার আগে যেখানে থাকত। ঝুমা সেই তার ছেলে নিয়ে দুর্যোগ রাত্রে লহমার জন্যে এসে উঠেছিল। বাড়ির মালিক মঞ্জুলা দেবী অর্থাৎ শেখরনাথ। এই একটা মাত্র নয়, তাদের এমন গোটা সাতেক বাড়ি উঠেছে এই পাড়ায়। একটা দরোয়ান গোছের লোক আছে বাড়িগুলোর খবরদারি ও ভাড়া আদায়ের জন্য। এ বাড়ি কিন্তু ভাড়া দেয়নি, দশ দশটা বছর তালা দিয়ে রেখেছে। আশ্চর্য বন্ধুপ্রীতি বলতে হবে শেখরনাথের—এ বাজারে এমনটি আর দেখা যায় না।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সুধাময়ী এসে পড়ল। জমে উঠছে আস্তে আস্তে। ছিন্নসূত্রগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে আজকের জীবনটা কেমন আবার বেঁধে ফেলছে দশ বছরের পুরানো অতীতের সঙ্গে। সুধা বুড়িয়ে উঠেছে, বয়সে ত্রিদিবকে ছাড়িয়ে গেছে যেন।

গাঁয়ে যাবার উদ্ভট খেয়াল হল কেন সুধাময়ী? এখানে থাকলে নিশ্চয় এমন দশা হ'ত না।

থাকার জায়গা অবশ্য ছিল, কিন্তু খাওয়া জুটত কেমন করে?

খাওয়ার দুশ্চিন্তায় চলে গেলে? কি তোমার বুদ্ধি! কামধেনু দিয়ে গেলাম, দোহন করলেই তো সমস্ত-কিছু মিলত—

বুঝতে না পেরে সুধা অবাক হয়ে তাকাল।

ত্রিদিব বলে, ভুলেই মেরে দিয়েছে! সবুজ খামের সেই যে চিঠি দিয়ে গেলাম হাওড়া স্টেশনে।

সুধাময়ী জ্বলে উঠে বলে, সেই চিঠি দেখিয়ে টাকা আদায় করব, এত নীচ আমায় মনে করো?

নীচ তুমি নও—কিন্তু বোকা এক নম্বরের। ন্যায্য পাওনা ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়ে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়িয়েছ। তারই আবার গুমর হচ্ছে বড় গলায়। কিন্তু গাঁয়েই বা খাবার জুটত কি করে, জিজ্ঞাসা করি?

হঠাৎ ত্রিদিব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সুধাই এখন ঠাণ্ডা করে।

না খেয়ে কেউ বাঁচে না—অতএব খেয়েছি নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

ত্রিদিব বলে, নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছ, তার উপর লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ছ—বেঁচে যে রয়েছ তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু খাওয়ার উপায়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করছি।

কাজকর্ম করতাম এবাড়ি-ওবাড়ি। গাঁয়ের মানুষ বড় ভাল।

অর্থাৎ ধান ভানা, থালাবাসন মেজে দেওয়া, ছেলে ধরা—এই আর কি! তুমি আর আমি একেবারে আলাদা ধাঁচের সুধাময়ী, একটুও মিল নেই—অথচ কি আশ্চর্য দেখ, ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় মিলে গেছি।

একটা ল্যাবরেটারি মতন হবে বাড়িতে। এমন-কিছু ব্যাপার নয়—প্যাকিং-বাক্স ভরতি যা-সমস্ত কাস্টমস থেকে উদ্ধার করে আনছে, সেইগুলো বাইরের ঘরে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। শেখর কিন্তু এইটুকুতে খুশি নয়, মঞ্জুলার বিহনে সে আরও বেশি দরাজ হয়েছে। যত নাম বেরুচ্ছে, দশের কাজে ততই মেতে উঠেছে আরো। তার ঢালাও হুকুম, ল্যাবরেটারি সাজাও তুমি মনের মতো করে, যা-কিছু দরকার কিনে ফেল। খরচের দায় আমার। নিজে যদ্দুর পারি

দেব, বাকি টাকা বাইরে থেকে যোগাড় করে আনব। তোমার ভাবনা নেই।

কয়েকটা দিন ধরে কাস্টমসে খুব টানাপোড়েন চলছে। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে ত্রিদিব দেখল, টেবিলের উপর বড় এক লেফাপা তার নামে। খুলে ফেলল—মূল্যবান কিছু নয়, খবরের কাগজের একগাদা কাটিংস। একখানা তুলে নিল। সংবাদ তাজ্জব বটে! একবার পড়ে মাথায় ঢুকছে না, আর একবার পড়ল। তারপর আবার······

সুধা জলখাবার নিয়ে এসেছে। ত্রিদিব চুপচাপ বসে। চেহারা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে, দাদা—

মুখ তুলে ত্রিদিব সুধার দিকে তাকাল। বুঝি তার সম্বিত নেই। কাঁদো-কাঁদো হয়ে সুধা বলে, কি হয়েছে, আমায় বল—

ডাকে এল। কে পাঠাল ধরতে পারছিনে—

লেফাফাটা তুলে ধরে ত্রিদিব আবার উল্টে পাল্টে দেখে। বলে, দেওঘর থেকে কোন্ সুহৃৎ পাঠাল—নামটা খিচিমিচি করে লেখা, পড়া যাচ্ছে না।

উৎপলা পাঠিয়েছে। আমাকেও চিঠি দিয়েছে আজ। সমস্ত জানিয়েছে। চিনতে পারলে না? নাঃ, তুমি যেন কী! সুবোধ বাবুর বোন—সেই যে স্টেশনে গিয়েছিল তোমার যাবার দিনে। অমন মেয়ে হয় না। কী ভালো যে বাসে তোমায়—তোমার বাহাদুরি যেখানে যা-কিছু বেরিয়েছে, কেটে কেটে সব তুলে রাখে।

বাহাদুরি, তাই বটে!

কান্নার মতো হাসি হেসে ওঠে ত্রিদিব। একটা কাগজ তার চোখের সামনে মেলে ধরা—সুধা সেটা নিয়ে নিল।

এই দেখ, বার্মিংহামে ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেসের খবর—রাদারফোর্ড-চাডউইকের পাশাপাশি তোমারও নাম রয়েছে—

আর ও-পিঠে? উল্টে ধরো কাগজখানা—

ও-পিঠ তোমার পড়বার নয়।

পড়বার নয়, কি বল ? জবর খবর ঐখানে। এই যে মোটা হরফের হেডিং—'বিপ্লবিনীর শোচনীয় মৃত্যু'—

জায়গাটা পড়ে সুধা প্রশ্ন করে, মাধবীলতা দেবী মেয়েটা কে দাদা ? তোমার আপন কেউ ?

ত্রিদিব বলে, পরিচয় তো দিয়েই দিয়েছে। শঙ্কর মিস্তিরের স্ত্রী—আমার আবার কে হবে !

খাবার স্পর্শ করল না, দ্রুত সে রাস্তায় নেমে গেল।

রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে, দুনিয়াশুদ্ধ নিষুপ্ত। এই ভাল, নিরিবিলি নিজেকে নিয়ে থাকা যায়। নিজেকে ছাড়া কার দিকে কবে চেয়ে দেখছ ত্রিদিবনাথ ? ভাল ভাল বাক্য তো আউড়েছ মুখে—বিজ্ঞান, প্রগতি, বিশ্বমানবের কল্যাণ—এ সব শুনতে খাসা, আসরের মধ্যেও পশার বাড়ে। কিন্তু গতানুগতিকতায় গা না ঢেলে আলাদা ভাবে ভেবে দেখেছ পরিণামটা ? দেশে দেশে শিল্প-বিপ্লব—পুরো বছর লাগত যে-কাজে, গায়ে ফুঁ দিয়ে লহমার মধ্যে তা সমাধা হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির বিপুল শক্তি-ভাণ্ডার—হাজার-লক্ষ কুঠুরি সেই ভাণ্ডারের। এত দিনে মানুষ তার দুটো-পাঁচটা মাত্র খুলতে পেরেছে। তাতেই বিস্ময়ের অন্ত নেই; দম্ভ আকাশছোঁয়া। কিন্তু বন্দী ময়দানবদের মুক্ত করে এই যে কাজে লাগিয়ে দেওয়া—হাজার মানুষ মিলে যা করত, দানবীয় ইস্পাতযন্ত্র দিয়ে তাই করাচ্ছে, যন্ত্রচালক একটি মাত্র মানুষ—তা হলে ন'শ নিরানব্বুই জন যে বেকার হয়ে রইল, তাদের উপায় কি ? বেকার হয়ে, গণ্ডগোল পাকিয়ে বেড়াবে—অতএব কমাও মানুষ, মার, কেটে ফেল। এরই আইনসম্মত প্রক্রিয়ার নাম হল লড়াই।

ধরণীর বুক ক্ষতবিক্ষত করে বিশ গুণ ফসল আদায় করেও মানুষের দুঃখ ঘোচে না। একদিন কিন্তু সর্বংসহা মাটিও মুখ ফেরাবে—এক

কণিকা ফসল দেবে না! বিজ্ঞানীরা এখন থেকে সেই ভাবনা ভাবতে লেগেছেন! গোপন পাতালপুরীর যেখানে যেটুকু সম্পত্তি লুকানো আছে, দামাল মানুষ সমস্ত টেনে টুনে নিয়ে এসে ভোগ করতে চায়! গুপ্তধন একটু একটু করায়ত্ত হচ্ছে, মানুষ আরো ক্ষেপে যাচ্ছে সহস্রগুণ। সেই ক্ষিপ্তদলের মধ্যে ত্রিদিবও একটি, অভিধানের চোখা চোখা বিশেষণে আসল মূর্তি যতই চাপা দিতে চাও না কেন। দিনমানে দশের মুখে প্রশংসা-বাক্যগুলো মন্দ লাগে না, জীবনের ক্ষতি ও বেদনা দিব্যি ভুলে যাওয়া যায়। কিন্তু এই নিশিরাত্রে ব্যাপার এখন আলাদা। স্তাবকের চাটুবাক্য বিহনে—কি মনে হচ্ছে ত্রিদিবনাথ, খুব নাকি জিতে আছ তুমি? সভায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল, সম্প্রতি সে মালা ইজিচেয়ারের হাতলে ঝোলানো। সকালবেলা গোপলা ঘর ঝাঁট দেবার সময় ধুলা-আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেবে। একজন কেউ নেই, যার গলায় নিভৃতে এ মালা পরানো যেত ঐ চেয়ারের হাতলে না রেখে।

সামনের জমিটায় এখনও বাড়ি ওঠেনি। একপ্রান্তে বাঁশ পুঁতে তার উপর খান কয়েক পুরানো টিন ফেলে আইসক্রীম সিং গোয়ালা বসবাস করে। বছর দুই-তিন আছে এমনি, কেউ কিছু বলে না—অস্থায়ী ঘর, জমির উপরে পাকা বাড়ি তোলবার উদ্যোগ হলেই এই ঘর ভেঙে নিয়ে চলে যাবে। ঘরের একদিকে হাত তিনেক জায়গা নিয়ে ওদের খাটিয়া ও তৈজসপত্র, বাকি সমস্তটা গোয়াল। আইসক্রীম কিছুই নয়, লোকটার বিচিত্র নামই শুধু—আসল হল বউটা। সারাদিন ধরে কি খাটনিই খাটে! অবলা তিনটে গরুর নানান রকম খেজমত এবং ঐ গরুর মতোই নিরীহ স্বামীটিরও। স্বামী শুধু ফড়ফড় করে হুঁকো টানে আর ঘুমোয়। কদাচিৎ কুচো-খড়ে খৈল মিশিয়ে গরুর জাবনা মাখাতে বসে। সে-ও ভাল হয় না, বউ তাকে ঠেলে দিয়ে কনুই অবধি ডুবিয়ে দেয় জাবনার পাত্রের ভিতর। আইসক্রীম আর কি করতে পারে—শুয়ে পড়ে খাটিয়ার উপর, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও

পা নাড়ে সে প্রবল ভাবে। ঘরে বেড়ায় হাঙ্গামা নেই, বাইরে থেকে সমস্ত কিছু নজরে আসে। হাতে যখন কাজ থাকে না, এই সমস্ত বসে বসে দেখে ত্রিদিবনাথ। বিষম ধড়িবাজ বউটা—তিনটে গাইয়ের সবটুকু দুধ পাড়ার মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। সে কাজটাও বউ নিজের উপর রেখেছে। দুধ দিতে এসে হেসে ঘাড় দুলিয়ে সোহাগপনায় গদগদ হয়ে ওঠে। ওরই ফাঁকে দুধের গ্যাঁজলাসুদ্ধ চুঙিতে ভরে মাপে কম দেবে, ফাঁক পেলে জল মিশিয়ে দেবে—বজ্জাতির অন্ত নেই। ত্রিদিবনাথ, কেমন হ'ত বল দিকি যদি ঐ আইসক্রীম সিঙের মতো হতে পারতে? প্রায় তো তাই হয়ে গিয়েছিলে—মন্দির বানিয়ে সেকালে শিব-স্থাপনা করত, তাই তো প্রায় করে তুলেছিল তোমায় ঝুমা। জিতেছ কি ত্রিদিব, ঘর ছেড়ে দুনিয়ার মানুষ হয়ে গিয়ে? ভেবে দেখ দিকি এখন একবার।

খবরের কাগজের সেই টুকরো বের করে ঠাণ্ডা মাথায় আবার পড়তে লাগল। বিপ্লবিনীর শোচনীয় মৃত্যু—

যুদ্ধের সময় জনসাধারণের নিকট সত্য গোপন রাখা হইত, যুদ্ধান্তে এখন চমকপ্রদ বহু বৃত্তান্ত জানা যাইতেছে। চারি বৎসর পূর্বে ডায়মণ্ডহারবারে জোড়া খুন হয়, তৎসম্পর্কীয় বিবরণ যথারীতি আমাদের স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকবর্গের স্মরণার্থে সংক্ষেপে ঘটনার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

শঙ্করনাথ মিত্র নামক এক ব্যক্তি এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে লইয়া নদীতীরবর্তী এক গৃহে বাস করিতেছিল। ক্রমশ প্রকাশ পাইল, যুবতী শঙ্করের বিবাহিতা স্ত্রী নহে, উহাকে শঙ্কর হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। ভদ্রপল্লীতে এই শ্রেণীর লোকের বসবাস বাঞ্ছনীয় নহে, এই জন্য পল্লীবাসীরা পুলিশে খবর দিল। পুলিশও বিভিন্ন সূত্র হইতে সন্দেহের কারণ পাইয়াছিল। ১৮ই জুলাই প্রত্যুষে পুলিশবাহিনী স্থানীয় কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া খানাতল্লাসি এবং প্রয়োজনবোধে

গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বাড়ি ঘেরাও করে। শঙ্কর সেদিন গৃহে ছিল না, স্ত্রীলোকটি একাকী অবস্থান করিতেছিল। অকস্মাৎ সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে রিভলভার বাহির করিয়া গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে নদীর দিকে ছুটিয়া যায় এবং জল মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সুতীব্র স্রোতে মুহূর্তে সে জলতলে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। গুলির আঘাতে সাব-ইন্‌স্পেক্টর কৃষ্ণহরি সরকার এবং পতিরাম নাথ নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হন। উভয়েই পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। শঙ্করের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই; খানাতল্লাসী সূত্রে স্ত্রীলোকটির নাম জানিতে পারা গিয়াছে—মাধবীলতা দেবী।

এইরূপ বৃত্তান্ত আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন জানা যাইতেছে প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। শঙ্করনাথ মিত্র ও মাধবীলতা দেবী দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ দম্পতি; উভয়েই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরম অনুরাগী বিশ্বস্ত সৈনিক। আজাদ-হিন্দ ফৌজ দলের কয়েকজনকে নেতাজী সাবমেরিন যোগে ভারতে পাঠান, পুরীর নিকটবর্তী কোন স্থানে তাঁহারা অবতরণ করেন। গোয়েন্দা পুলিশ অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের ধরিতে পারে নাই। জরুরি কাগজপত্র ও বেতারের যন্ত্রপাতি তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারও সন্ধান হইল না। এদিকে যুদ্ধের অবস্থা সঙিন হইয়া ওঠায় ইংরেজ চতুর্দিক হইতে বিপন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদের রণনীতি ফাঁস হইয়া গিয়া সোনাগুের আজাদ-হিন্দ রেডিও হইতে বিশ্বময় প্রচারিত হইতে থাকে; সামরিক উপকরণবাহী জাহাজের উপর নির্ভুল হিসাব মতো বোমা পড়িয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। গোপন সংবাদ কাহারা সরবরাহ করে, বুঝিতে না পারিয়া ইংরেজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, এমনি সময় সংবাদ পাওয়া গেল একটি ট্রানস্‌মিটার ও কিছু কাগজপত্র শঙ্করনাথ মিত্রের গৃহে রহিয়াছে। পুলিশের জালবদ্ধ মাধবীলতা দেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ট্রানস্‌মিটার ও

কাগজপত্র সহ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বঙ্গের বীরকন্যার এইরূপে শোচনীয় সলিল-সমাধি হইল। দেশের মানুষ কিন্তু সেই সময় তাঁহাদের সম্পর্কে অন্যরূপ ভাবিয়াছিল। বস্তুত মাধবীলতা দেবী শঙ্করনাথ মিত্রের বিবাহিতা স্ত্রী—ইংরেজ সুকৌশলে কুৎসা রটনা করিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণের ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। আঠারোই জুলাই খরস্রোত নদীগর্ভে নির্ভয়ে আত্মদান করিয়া মাধবীলতা দেবী দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ঐ দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য……

আর, কি আশ্চর্য, আঠারোই জুলাই স্মরণীয় ত্রিদিবের জীবনেও। ঝুমা মরে অব্যাহতি নিয়ে গেল—সে তো আছেই। প্যারিসে সি-তে য়্যুনিভার্সিটির বিজ্ঞান-পরিষদে তার বক্তৃতা হয়েছিল ঐ দিনেই; —বছরটা অবশ্য আলাদা। তারিখ মনে ছিল না, মনের মধ্যে গেঁথে রাখবার মানুষ ত্রিদিব নয়। কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে উৎপলা তাঁকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করেছে, পলির সংগ্রহ থেকেই নির্ভুল তারিখটা পাওয়া গেল। বিজ্ঞান-বিচারে ঈশ্বরের ঠাঁই নেই—তবু কিন্তু মনে হয়, কোন এক বিষম শক্তিধর রসিকতা করছেন তাকে নিয়ে। শঙ্কর মিত্তিরের স্ত্রী মাধবীলতা পথ নির্বাধ করে দিয়ে মরে গেল, আর ঠিক সেই তারিখটাতেই ধরণী সমাদরের বাহুতে তাকে সকলের মাথার উপর তুলে ধরল। কেমন, এই চেয়েছিলে কিনা জীবনে, বল ত্রিদিবনাথ!

বস্তু আর শক্তি এতাবৎ আলাদা বলেই জানা ছিল অকাট্য রূপে, এবারে দেখানো যাচ্ছে, একেবারে এক তারা। বস্তুই রূপ পালটে হয় শক্তি; শক্তি হয়ে দাঁড়ায় বস্তু। আশ্চর্য ব্যাপার! তাবৎ ভুবনে যত কিছু ছড়ানো, সমস্ত যেন এক হয়ে আসছে। রূপে আর অরূপে একাকার।

বক্তৃতা বলবেন না তাকে—যেন সে সেদিন ঝুঁটি ধরে মানুষের

জ্ঞান-বুদ্ধি নাড়া দিয়ে দিল। বক্র বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো—কি মূর্খ হয়ে ছিলে সকলে এতকাল। আর দুনিয়ার এই মজা, যে যত বেপরোয়া গালিগালাজ করে, তার তত পসার। পশ্চিম জগতে কী হৈ-হৈ শুরু হল পর পর! কাগজে কাগজে ছবি আর গজের মাপের প্রবন্ধ। ভারতের এই মানুষটিকে বৈজ্ঞানিক না বলে কবি বলাই বোধ হয় সঙ্গত। ভারতের যাদুকর ও যোগীদের মতোই ডক্টর ঘোষের বিচিত্র কার্যকলাপ—আশ্চর্য ইনটুইশান—সেই শক্তিতে আগেভাগেই সে পূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, যুক্তিগুলো পরে আসে; যুক্তির অলিগলি হাতড়ে তাকে এগুতে হয় না। গবেষণা হয়তো অনন্যসাধারণ বলা চলে না, কিন্তু থিয়োরির উপর আশ্চর্য দখল—বিক্ষিপ্ত ঘটনাপুঞ্জ এক অবিভাজ্য নিয়মে চালিত হচ্ছে, যেন তৃতীয় নেত্রে সুস্পষ্ট দেখে নিয়ে সে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করে…

যা হবার হয়েছে। কিন্তু বাইরের ভিড় থেকে পালিয়ে নির্গোল নিজ দেশে চলে এল, সেখানেও যে প্রায় সেই অবস্থা। ছোটখাটো এক ল্যাবরেটারি তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে—শেখরনাথের সাহায্যে সেটা আস্তে আস্তে বড় করে তোলাও কঠিন হবে না। কিন্তু সময় কোথা কাজ করবার? সারাটা দিন এবং অনেক রাত্রি অবধি গুণমুগ্ধেরা ঘিরে থাকেন। ভরসা ছিল, এমন জোয়ারের বেগ বেশি দিন থাকবে না, সমাদর স্তিমিত হয়ে আসবে। কিন্তু পুরো মাস কেটে যায়, উৎসাহ কমে নাই মানুষের? ওদেশের মানুষ তবু বুঝে-সমঝে প্রশংসা করত, এদের একেবারে নির্জলা স্তাবকতা। বিদেশে হাততালি পেয়ে এসেছে, সে-ই যথেষ্ট। কেন, কি জন্য—জানবার প্রয়োজন নেই। বিদ্যাবুদ্ধিও নেই অধিকাংশের, সার্টিফিকেট দেখেই এরা সম্রাটের সমতুল্য আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

এ বজ্জাতি উৎপলার। যখন ছোট্ট ছিল সর্বদা তাদের পিছনে

লাগত, কত রকমের শত্রুতা করেছে তার অবধি নেই; সোয়াস্তিতে থাকতে দিত না। বেরিয়ে যাবে—দেখে, জুতো নেই। তারপরে খোঁজাখুঁজি এঘরে-ওঘরে উপরে-নিচে। আবার বসে পড়তে হয়। ঘণ্টা কয়েক পরে শেষ-ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে—তখন মালুম হল, পায়ের কাছেই তো জুতো; খাটে বসে অন্যমনস্ক ভাবে পা দোলাতে দোলাতে জুতোর উপর পা ঠেকে গেল। রাত্রিটা থেকে যেতে হল ও-বাড়ি। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচের ঘরে এসেছে সে আর সুবোধ। নতুন দাবাখেলা শিখেছে তখন, জবর নেশা। দু'জনে দাবা খেলে কাটিয়ে দেবে সারা রাত, সেই মতলব করে নিচে আসা।

খেলা জমেছে। ত্রিদিবের অবস্থা কাহিল—দুটো নৌকাই যায়-যায়, ঠেকানোর উপায় দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ পিছন দিক দিয়ে গম্ভীর গলায় দৈববাণীর মতো শোনা গেল, ঘোড়া মেরে আগে গিয়ে বোসো—

কি সর্বনাশ, শীতের নিশিরাত্রে হরিদাস কোন সময় এসে দাঁড়িয়েছেন? এক নজর তাকিয়ে দেখে দু'জনের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে। উঁচু দরের খেলোয়াড় হরিদাস—ত্রিদিবের সঙ্কটে স্থির থাকতে না পেরে জুত দিচ্ছেন। ছেলেকে বলেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে আর কি করবি? ঘোড়াটা দিতে হল, নয়তো মাত। বলতে বলতে বসেই পড়লেন ত্রিদিবের পাশে। তাড়া দিয়ে ওঠেন, কি চাল দিবি, দিয়ে ফেল। সারা রাত বসে বসে ভাবলে হবে?

সুবোধই বেকাদায় এখন। বাপে বেটায় ধুন্দুমার লেগে গেল। ত্রিদিব হরিদাসের হুকুম মতো হাত দিয়ে গুঁটি সরাচ্ছে, এই মাত্র। বাজিটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাস মারমুখী হলেন। রাত জেগে দাবা খেলা—আমি ভাবছি, শ্রীমানেরা নিরিবিলি একজামিনের পড়া পড়ছেন!

খুক-খুক—একটুখানি আওয়াজ দরজার বাইরে। বোঝা গেল, বিচ্ছু মেয়েটার কাজ। হরিদাসের চেঁচামেচি বেড়েই চলেছে। ঘুম

জেগে নীলমণি ছুটতে ছুটতে এল। কর্তা মশায়, আপনি উপরে চলে যান। আলো নিভিয়ে আমি পাহারায় রইলাম, দেখি কে আর জেগে থাকে! উৎপলার মা তখন বেঁচে, তিনিও এসেছেন। ত্রিদিবের সঙ্কুচিত মুখের দিকে চেয়ে স্বামীর উপর রুখে উঠলেন। কতদিন পরে দু-জনে এক বিছানায় শুয়েছে—একটু খেলাধুলো কি গল্পগুজব করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে নাকি? নিজেরা করনি এই বয়সে? আর এই যে হাড়বজ্জাত মেয়ে হয়েছে—দেখ দিকি কাণ্ড, বকুনি খাওয়াবার জন্যে ঘুমন্ত মানুষটাকে এই রাত্রে টেনে নামিয়ে আনল।

পলি ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল, মায়ের বকুনি খেয়ে তবে ঠাণ্ডা হল।

এখন এত বড় হয়েছে পলি, দুষ্ট বুদ্ধি কিন্তু ঠিক তেমনি। অন্যকে বিপদে ফেলে মজা দেখে দূর থেকে। সমুদ্র-পাহাড়ের ওপারে ভিন্ন রাজ্যে কি করে এসেছে না এসেছে, কে তার খবর রাখত! কিন্তু তা কি হতে দিল? খবর কেনাবেচা বাছাই-ছাঁটাই বানানো-বদলানো যাদের পেশা, এতকাল তাদের ভিতরে থেকে সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরি নিয়েছে। যেন সে অদৃশ্য সহচরী হয়ে ত্রিদিবের সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়েছে এই দশ বছর। তারপরে নিষ্ঠুর জনতার উল্লাস-বন্যার মধ্যে নিঃসহায় তাকে নিক্ষেপ করে নাগালের বাইরে সুদূরবর্তী হয়ে আছে। প্রায় সেই হরিদাসকে ভিতরে পাঠিয়ে দরজার বাইরে খুক-খুক করে হাসির মতন। উত্যক্ত হয়ে মরুক এখানে ত্রিদিবনাথ, আর সে ওদিকে দেওঘরের বেলাবাগানে নিরীহ ভালমানুষ হয়ে ঘরকন্না করছে। সে হচ্ছে না, তোর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবে—

ফটকের মুখে দেখা। বাজার করে ফিরছে উৎপলা তখন। মুটের মাথায় গন্ধমাদন তুল্য বোঝা। তাতেও কুলোয়নি। নিজের দুটো হাত ভরতি, কাঁধ থেকে ঝোলানো ব্যাগের ভিতরেও টুকিটাকি

জিনিস। ঘেমে গিয়েছে রোদে। তেঁতুলতলায় থমকে দাঁড়িয়ে ত্রিদিব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার দিকে।

সওদাগুলো ভুম করে মাটিতে ফেলে উৎপলা কাছে চলে আসে।

চিনতে পারছ না? দেখ দিকি ভাল করে।

ত্রিদিব তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখে ঘাড় নাড়ে। উঁহু, সে পলি আর নও তুমি। রোগা হয়ে গেছ, বিধাতা-পুরুষ ফ্যাক্টরিতে নিয়ে চোয়াল দুটো আর একবার পিটিয়ে দিয়েছে বুঝি! রঙও যেন একটু বেশি ফর্সা—

উৎপলা হেসে বলে, আমি ঠিকই আছি ত্রিদিবদা—অবিকল সেকালের মতো। তোমার চোখ বদলেছে, তাই চিনতে পারছ না।

ত্রিদিব আঙুল দিয়ে দেখায়, কপালের ঐ ফুটকি ফুটকি দাগগুলোও সেকালে ছিল নাকি পলি?

মা-শীতলা অনুগ্রহ করেছিলেন—যার নাম বসন্ত। একেবারে পাদপদ্মেই ঠাঁই দিতেন, কিন্তু দিদি টেনে-হিঁচড়ে ধরল। লড়াইয়ে হেরে কিছু কিছু করুণার চিহ্ন দেবী গায়ে-মুখে ছিটিয়ে গেলেন।

ত্রিদিব আশ্চর্য হয়ে বলে, দিদি? তোমার আবার দিদি কেউ আছেন, জানিনে তো!

উৎপলার কণ্ঠ গভীর হয়ে ওঠে: এ জন্মের না হোক, জন্ম-জন্মান্তরের দিদি। রক্তের সম্বন্ধ তার সঙ্গে নয়, প্রাণের সম্বন্ধ। আর পাঁচটা দিন আগে এলে দেখা হত ত্রিদিবদা। ইস্কুলে কাজ করে—সোমবারে ইস্কুল খুলেছে, রবিবারে চলে গেল। আমরাও যাব চলে এবার। অনেকদিন হয়ে গেল—বাবা আর থাকতে চাচ্ছেন না। কলকাতায় এখন গরম কমে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছে—না?

ত্রিদিব বলে, আছেন কেমন মেসোমশায়?

চোখেই দেখতে পাবে এসে পড়েছ যখন।

হঠাৎ সে হেসে উঠল। খিল খিল করে—সেকালের সেই ছেলেমানুষ পলির মতন। সত্যি, এটা কি হচ্ছে—বিশ্ববন্দিত

ডক্টর ঘোষের সঙ্গে পথের উপর দাঁড়িয়ে কথা। ভিতরে চলো ত্রিদিবদা।

চেনা মুটে আগেই রোয়াকের উপর উৎপলার সওদা নামিয়ে দিয়েছে। ঘর বেশি নয়, কিন্তু কম্পাউণ্ড যেন গড়ের মাঠ। ফটকের দু-পাশে প্রকাণ্ড দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ। কাঁকর-বিছানো পথ ফুল-বাগিচার ভিতর দিয়ে। পিছন দিকে আম-লিচু-আতার বাগান। কতগুলো মালি খাটছে না জানি—এতবড় বাড়ি এমন ঝকঝকে তকতকে রেখেছে।

উৎপলা বলে, দুলালচাঁদ নাগের বাড়ি এটা। আমাদের থাকতে দিয়েছেন। মানিকচাঁদ নাগের ছেলে। বাপ মরে গিয়ে ইনি এখন কর্তা। চিনতে পারলে না, সেই যে—

বাংলা দেশে জন্মে মাণিকচাঁদকে চিনবে না কোন মূর্খস্য মূর্খ ? যত দোর্দণ্ডপ্রতাপই হোন, ঐ একটা জায়গায় সকলে কেঁচো। খবরের কাগজের মালিক তিনি। প্রথম জীবনে নিছক সাহিত্যসেবার খাতিরে এক চটি মাসিক-পত্র বের করেন। সেই সঙ্গে তিনজন কম্পোজিটার নিয়ে এক ছাপাখানা। মেসিন ছিল না, ছাপিয়ে আনতেন অন্য প্রেস থেকে। সাহিত্যব্যাধি তার পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গিয়ে ভদ্রলোক ধাতস্থ হলেন। মাসিক ছেড়ে বের করলেন সাপ্তাহিক কাগজ—ক্রমশ দৈনিক। তা-বড় তা-বড় সাহিত্যিক তখন পদতলে গড়াগড়ি দেয়। সাহিত্যিক তো ছার, লাটবেলাট অবধি টেলিফোনে খোশামোদ করে মাণিকচাঁদকে। রাজনীতি হোক আর দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সঙ্গীতই হোক সকল সভায় সভাপতি হবার ডাক আসে—আর কিছু না হোক, কাগজে ফলাও করে ছবি ও খবর বেরুবে। একটা জীবনে মাণিকচাঁদ যে তাজ্জব দেখিয়ে গেছেন তা লোকে দশ জীবনে পারে না। ছেলে এখন সেই সুখ ভোগ করছে।

উৎপলা বলে, দুলালবাবুর আসবার কথা আজকে, কলকাতা থেকে সোজা মোটরে আসছেন। তাই এত বাজার। নইলে বাপ

আর মেয়ে—আমাদের এত কি দরকার? বাবা খাওয়াদাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন একরকম। ফাঁকি দেবেন এবারে হয়তো—সংসারে কেউ আমার থাকবে না ত্রিদিবদা।

গলা ভারী হয়ে উঠল। ত্রিদিব ইতস্তত করে বলে, বিকেলের গাড়িতে আমি তবে ফিরে চলে যাই পলি। অত বড়লোক দুলালচাঁদের পাশে নিতান্ত বেমানান।

উৎপলা বলে, আমিও ঠিক এই কথা বলতাম তুমি যদি সেকালের ত্রিদিব ঘোষ হতে। কিন্তু ডক্টর ঘোষ ভিন্ন মানুষ। ঐ দুলালই দেখো কত জ্ঞানের কথা বলবে তোমার সঙ্গে। হেসে ফেলো না কিন্তু খবরদার, আমাদের অন্নদাতা—চাকরি ওর কাগজে।

॥ দশ ॥

উৎপলার কাছে ত্রিদিব হঠাৎ প্রগলভ হয়ে উঠল। অনেককাল আগেকার সেই তরুণ ছেলেটি। সুবোধের সঙ্গে যখন এদের বাড়ি আসত, ছোট্ট মেয়ে উৎপলা ঘুরঘুর করে বেড়াত আর জ্বালাতন করত নানারকম দুষ্টামিতে। ঝুমা আসে নি তখন জীবনে, নামযশ হয় নি। আজকে এতদিন পরে আবার একবার সম্মান ও পাণ্ডিত্যের খোলস খুলে চলে এসেছে। দেওঘরের এই জনবিরল বেলাবাগানে তার মহিমা কে জানে? ভাগ্যিস জানে না, তাই বাঁচোয়া।

উৎপলা তাকে বাপের ঘরে নিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায় ত্রিদিব। আর্তনাদ গলা চিরে বেরুতে চায়, জোর করে চেপে নিল। শয্যার প্রান্তে পর পর গোটা তিনেক তাকিয়া সাজানো—তার উপরে গড়িয়ে আছে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার এক দেহ। দু-চোখে ঢাকা বাঁধা।

এ কি হয়েছে উৎপলা? এই নাকি মেসোমশায়?

আর বলতে যাচ্ছিল, বেঁচে আছেন? কথাটা ঘুরিয়ে বলল, জেগে আছেন তো? উহুঁ, জাগিয়ে কাজ নেই। চল—

উৎপলার কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে ওঠে, এই হল বাবার সব চেয়ে সজাগ অবস্থা। সেই মানুষ আজ কি রকম হয়ে গেছেন দেখ।

কাছে চলে গেল। মধুর মৃদু কণ্ঠে ডাকে, বাবা, বাবা গো—কে এসেছে জান?

পা থেকে মাথা অবধি যেন বিদ্যুৎস্পর্শে কেঁপে উঠল। চিৎকার করে উঠলেন। না শুনলে কিছুতে প্রত্যয় হয় না ঐ কণ্ঠের এমনিতরো আওয়াজ।

চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখে দিয়েছিস—জানবার উপায় আছে?

কানের কাছে মুখ নিয়ে উৎপলা বলে, ডক্টর ত্রিদিবনাথ ঘোষ—পৃথিবী ঘুরে এতদিনে দেশে ফিরলেন।

ডাক্তার? হরিদাস আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন: এদেশের যত ডাক্তার সারা হয়ে গিয়ে এবার বুঝি বাইরের আমদানি শুরু হল?

বাইরের কোথা? আমাদের ত্রিদিবদা যে!

এবার হরিদাস খাড়া হয়ে ওঠেন।

ত্রিদিবনাথ? বলিস কি! ওরে ত্রিদিব, তুই ডাক্তার হয়ে এলি নাকি? হেসে বললেন, কি সর্বনাশ! যা চটপটে, মানুষ ভুগে মরবে না তোর হাতে।

তারপর ব্যাকুল অনুনয়ের সুরে বললেন, চোখ খুলে দে পলি। ত্রিদিব এলো এত কাল পরে, তাকে একটা নজর দেখতে দিবিনে?

উৎপলা বলে, দুলালচাঁদ আজকে আসছেন বাবা, যে ডাক্তার চোখ বেঁধে গেছেন তাঁকেও নিয়ে আসছেন। ওঁদের বলব চোখ খুলে দেবার কথা।

তখন হরিদাস ত্রিদিবের কাছে অনুযোগ করেন, তারা ডাক্তার নয়—ডাকাত। চোখ দুটোয় এমনি যদিই বা ঝাপসা রকম দেখতাম, ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একেবারে সাবাড় করছে। তুমি ডাক্তার হয়ে এসেছ বাবা ত্রিদিব, বুড়ো মেসোকে বাঁচাও ওদের হাত থেকে। চোখ যাবার হয় তো নিজের লোকের হাতেই যাক।

ত্রিদিব বলে, ডাক্তার আমি বটে কিন্তু ফোঁড়া কাটার বিদ্যেও শিখে আসিনি মেসোমশায়, দুটো টাকা দিয়েও কেউ রোগ দেখাতে ডাকবে না। বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছি খানকয়েক ভুয়ো কাগজপত্র—

কিন্তু কানেই নিলেন না হরিদাস। বিড়বিড় করে বকতে লাগলেন আপন মনে। বিশ্বসংসারের উপর বিষম তিতবিরক্ত, এমনি একটা ভাব।

সেই পুরানো সেকালের কথা ত্রিদিবের মনে পড়ে যায়। কাজের খাতিরে হরিদাসকে শহরে কাটাতে হল, তার জন্যে চিরকাল দুঃখ করেছেন। বাপ-ঠাকুরদা গ্রামে থেকে চতুষ্পাঠী চালিয়ে গেছেন, পনের-বিশটা ছেলেকে বিদ্যাদান শুধু নয়, সেই সঙ্গে অন্ন এবং বসতি। কলকাতা শহরে এতদূর অবশ্য চলে না, তবু নিচের ঘর দুটোয় তিন-চারটে ছাত্র থেকে পড়াশুনো করত, হরিদাস তাদের খরচপত্র যোগাতেন। বলতে হবে হরিদাসের নাম করেই, কিন্তু আসল কর্তা উৎপলার মা। হরিদাসের অবসর কোথা সংসারের খবরদারি করবার? উৎপলার মা সেই ছেলেগুলোরও মা হয়েছিলেন। তেতলার ছাতের কোণে ছোট্ট ঘরখানা—পুঁথিপত্র বই-কাগজে বোঝাই, হরিদাস বাড়ি ফিরেই ঐ ঘরে ঢুকে পড়তেন। কেউ বড়-একটা সেদিকে যেত না, আপন মনে তিনি পড়াশুনোয় ডুবে থাকতেন। সে একদিন গেছে। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে হরিদাস আর একরকম হয়ে যেতে লাগলেন। আজকে অবশেষে এই হাল। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। সে মানুষটি একেবারে মরে গিয়ে বোধশক্তিহীন নিতান্ত এক শিশু।

দুলালচাঁদ বিকাল নাগাদ আসবেন, আন্দাজ করা গিয়েছিল। এসে পৌছুতে রাত দুপুর। দু'খানা মোটরে ছোটখাট এক বাহিনী। মোটর শব্দসাড়া করে ফটক পেরিয়ে কম্পাউণ্ডে ঢুকল। উৎপলা বারান্দায় বেরিয়ে এসে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে, আসুন, আসুন,

সমস্তটা দিন পথ তাকাচ্ছি। এই এতক্ষণ অবধি বাইরে বসেছিলাম—সবে কেবল দোর দিয়েছি। এত দেরি—কোন গোলমাল ঘটেনি তো পথে ?

ত্রিদিবেরও ঘুম ভেঙেছে। নিতান্তই মরে গেলে এত সোরগোলে তবে ঘুমানো যায়। কিন্তু শয্যা ছেড়ে উঠল না সে। তার কি মুনাফা, রাত দুপুরে বেরিয়ে সে কেন যাবে খাতির জমাতে ? শুয়ে শুয়ে শুনছে মজার কথাবার্তা। ভাগ্যিস যায়নি বাইরে! যা কাণ্ড—উৎপলার ঐ তোয়াজ দেখে হেসেই ফেলত হয়তো। অভিনয় করতে জানে বটে! গোটা মেয়েজাত ধরেই বলছে—অভিনয়ে ওদের জুড়ি নেই।

কি সব বলছে, শোন, ঐ উৎপলা। সমস্ত বিকাল ও অনেকটা রাত্রি অবধি তারা তো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। হাঁটুজল ভেঙে ধারোয়া নদী পার হয়ে রেল-লাইনের ধারে ধারে চলে গিয়েছিল প্রায় যশিডি অবধি। একবার বটে উঠেছিল দুলালের কথা। ঐ বাঁক পার হয়ে দুলালের নেভি-ব্লু কার হঠাৎ যদি সামনাসামনি এসে পড়ে। ঠিক আছে, হতভম্ব হয়ে যাবার পাত্র তারা নয়।—আপনার দেরি দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়লাম দুলালবাবু, ঘরে আর থাকতে নারলাম। পায়ে পায়ে এদ্দুর এই এগিয়ে চলেছি।

ঠিক এ কথারই রকমফের করে উৎপলা বলছে, এই এতক্ষণ অবধি বাইরে বসেছিলাম, সবে ঘরের দোর দিয়েছি···

দুলালের কথা একবার উঠে পড়ল তো সেই প্রসঙ্গই চলেছিল কিছুক্ষণ ধরে। কোনদিন একছত্র না লিখেও পিতৃপুরুষের ব্যবস্থায় সে নামজাদা সম্পাদক। লিখতে যাবে কোন দুঃখে (পারেও না অবশ্য)—দুটো দশটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিলে পরের নামে লিখে দেবার বিস্তর মানুষ আছে। ও-বছর এক কাণ্ড হয়েছিল—

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি লাগছিল। উৎপলা আর ত্রিদিব বসে পড়ল যশিডির রাস্তার পাশে এক আমগাছের ছায়ায়।

শোন, এই বছর দুই আগে ভারি এক মজার ব্যাপার হয়েছিল

ত্রিদিবদা। আমেরিকার একদল সাংবাদিক এলো কলকাতায়। এমনি তো দুলালের নাম খুব—তাকে এগিয়ে দিল সকলের মুখপাত্র হিসাবে। সে যে কী কষ্ট! কথাবার্তা বাড়ি থেকে আন্দাজি বানিয়ে দু-দিন ধরে মুখস্থ করে গিয়েছিল। ফিরিস্তির বাইরেও তবু দু-চার কথা এসে পড়ে। আমাকে তাই সঙ্গে নিয়েছিল। সর্বক্ষণ আগলে ছিলাম, দুলাল কিছু বলবার আগেই তার হয়ে সমস্ত বলে দিই। খাতির কি সাধে করে?

ত্রিদিব বলে, শুধুই খাতির? তার উপরে কিছু নয় তো?

পলি প্রশ্ন করে, আর কি হতে পারে বল?

মনে করতে পারে, উৎপলা যদি চাকরি ছেড়ে আর কোথাও চলে যায়! তখন অমন করে আগলে বেড়াবে কে? তার চেয়ে এমন কিছু হোক; কোনদিন যাতে ভেগে পড়তে না পারে।

মুখ টিপে হেসে উৎপলা বলে, সে যাই হোক উৎপলাকে নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন ত্রিদিবদা? সে মরুক, জীবন্ত থাক, কিম্বা দুলালচাঁদ চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলুক, তোমার তাতে কি যায় আসে?

এমনি সব কথাবার্তা। আবার এক সময়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে উৎপলা বলেছিল, এলো না দুলালচাঁদ—উঃ, বাঁচা গেল! তার নাম শুনেই তো তুমি চলে যাচ্ছিলে ত্রিদিবদা। মোটর অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে কোথায় হাড়গোড় ভেঙে পড়ে আছে—কালকের কাগজে দেখো ছবি বেরুবে। নিজের কাগজ, তাই সকলের চেয়ে বড় খবর হবে ঐটা।

সেই উৎপলা রাত দুপুরে উঠে এসে কি বলছে শোন। গদগদ হয়ে উঠছে—পদাবলী-গানের নির্ভেজাল শ্রীরাধিকা—'পথ চেয়ে চেয়ে অন্ধ দু'আঁখি।' উঃ, এতও পারে মেয়েরা! পুরুষ মানুষ হলে হেসে ফেলত ঠিক।

ঝুমাও এমনি। কত রকমারি ভূমিকায় অভিনয় করে গেল ঐটুকু জীবনে। কিশোরী মেয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে গ্রামময় ছুটোছুটি

করে বেড়াত, ক্ষণে ক্ষণে উলু দিয়ে উঠত উল্লাসিনী। ঢেঁকিশালে চিঁড়ে কুটছে—ভাড়ানিকে সরিয়ে দিয়ে নিজে উঠল ঢেঁকির উপর, পাড় দিচ্ছে দমাদম শব্দে, আবার তখনই দেখ কামরাঙা-গাছের মগডালের উপর। বাগের পুকুরে ভাঙা-ঘানার উপর ত্রিদিব ছিপ নিয়ে বসেছে, চারে মাছও লেগেছে, ফাতনা নড়ছে অল্প অল্প—এমনি সময় টুপ করে এক কামরাঙা পড়ল ফাতনার গোড়ায়।

এইও বাঁদর মেয়ে, দেখাচ্ছি মজা—

ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে ঝুমা পালাচ্ছে, ত্রিদিবও ছুটছে ধরবে বলে। হঠাৎ ঝুমা দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে পড়ল। থমকে দাঁড়ায় ত্রিদিব—কান্না প্রত্যাশা করা যায়নি ঐ মেয়ের কাছে। ও হরি, কান্না তো নয়—হাসি লুকিয়ে কান্নার অভিনয়। হাঁপিয়ে পড়েছিল—খানিকটা দম নিয়ে নিল এমনি কৌশলে। আবার দৌড়—

আর, ঝোড়ো রাতে ছেলে কোলে চেপে সেই ঝুমা যে বেরিয়ে গেল। পৃথিবী ঘুরেছে ত্রিদিব—কত দেশ, কত বিচিত্র মানুষের সমাজে তার গতিবিধি—তারই মধ্যে ঝিলিক দিয়েছে মেঘান্ধকার আকাশে বিদ্যুতের মতো স্ফুরিতাধরা এক মা, কোলে সদ্য ঘুম-ভাঙা বাচ্চা ছেলের সাদা দু'পাটি দাঁতের হাসি। আবার অনেক দিন পরে কাগজে পাওয়া গেল আদর্শ দম্পতি শঙ্করনাথ মিত্র ও মাধবীলতা দেবীর অশেষ গুণবর্ণনা, খরস্রোত নদীগর্ভে মাধবীলতার গৌরবময় আত্মবিসর্জন। উঃ, এইটুকু জীবনে এতও পারে একটা মানুষ! মেয়েমানুষ বলেই পেরেছে।

সকালবেলা ত্রিদিবের মোলাকাত হল দুলালচাঁদের সঙ্গে। বারাণ্ডায় দলবল নিয়ে সে টেবিল ঘিরে চায়ের অপেক্ষায় বসেছিল। ত্রিদিব দেখেই চিনল, পরিচয় করিয়ে দিতে হল না। নামের সঙ্গে চেহারার এমন মিল কদাচিৎ ঘটে। ওরা এসেছে সাকুল্যে পাঁচটি মানুষ—হাজার জন থাকলেও তার মধ্য থেকে দুলালকে বেছে নেওয়া

যায়। দু-হাতের আঙুলে মোট ছ'টা আংটি—দুটো বুড়ো এবং দুটো কড়ে আঙুল মাত্র বাদ। কিন্তু হাতে ঐ আংটিই শুধু মাত্র, মনের মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। ত্রিদিব বেরিয়ে আসতে দুলাল চেয়ার ছেড়ে একরকম ছুটে এসে তার হাত জড়িয়ে ধরল।

আপনার নামই শুনেছি এতকাল, আমার কাগজে রোজই প্রায় নাম দেখেছি, আজকে এই চোখে দেখলাম। পথে কাল বড় কষ্ট পেলাম। চাকা ফাটল। সেটার ব্যবস্থা করে হন্তদন্ত হয়ে এক নদীর ধারে এসে, স্যর, পাক্কা চার ঘণ্টা। মাঝি মেলে তো নৌকো মেলে না; আবার অনেক কষ্টে এক নৌকো জোটালাম তো পাড়ার মধ্যে তখন একটা মাঝি নেই, সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে। তা সে যা-ই হোক, সব কষ্ট সার্থক, অনেক লাভ হল এখানে এসে।

ভদ্রলোক ক'টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল একে একে। এই দু'জন হলেন ডাক্তার, আর ঐ দু'টি দুলালেরই কাগজের লোক। দুলালচাঁদ ছাড়া কারো সাধ্য ছিল না ডাক্তারবাবুদের এতদূর টেনে হিঁচড়ে এনে হরিদাসকে দেখানো। একজন হলেন নাম-করা চোখের ডাক্তার, অপর জন মানসিক ব্যাধির। হরিদাসের চোখের ভিতরেও বসন্তর গুটি উঠেছিল, সেই জের মিটছে না কিছুতে। আর সুবোধ মারা যাওয়ার পর থেকে মাথার গোলযোগ দেখা যায়, সেটা ইদানীং বাড়াবাড়ি রকমের হয়েছে।

ডাক্তারের ব্যাপার অবশ্য বোঝা গেল, কাগজের লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছে কেন? যেমন-তেমন লোকও নন, গাল-ভরা নামের চাকরি। আর চেহারায় মালুম হচ্ছে, মাইনেও ওজনদার বটে। উৎপলাও এসে জুটল এর মধ্যে। সেজেগুজে বের হয়ে আসতে দেরি হয়ে গেছে। পলিটা ইচ্ছে করলে এমন সুন্দর হতে পারে—ঝিকমিক করছে যেন দুলালচাঁদ আর এই লোকগুলোর সামনে। এমন রূপে দেখিনি তো আর কোন দিন—চোখ ফেরানো দায়। উঁহু, চোখ খুলে সোজাসুজি তাকানোই মুশকিল, আকাশের সূর্যের দিকে যেমন। আড়চোখে রেখে

ঢেকে দেখতে হয়। আর এমন সমস্ত কথাবার্তা বলছে দুলালচাঁদের সম্পর্কে—আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় এমন স্তাবকতা বেরোয় কি করে মুখ দিয়ে? সুবোধের বোন হরিদাসের মেয়ের কিছু মর্যাদাজ্ঞান থাকা উচিত। ত্রিদিব যে হাসি চেপে প্রাণপণে গম্ভীর হচ্ছে, সেটুকু অন্তত ঠাহর করা উচিত ছিল। অর্থাৎ দুলালের কাগজের ঐ যে দু'টি মোসাহেব এসেছে, উৎপলাও সেই ঝাঁকে মিশে গেছে। দুলালচাঁদের অনুগৃহীত তিন জন কর্মচারী—কোন রকম তফাত নেই ওদের মধ্যে।

চা খেতে খেতে দুলালচাঁদ জিজ্ঞাসা করে, জায়গাটা কেমন লাগছে ডক্টর ঘোষ?

চমৎকার!

সকলের দিকে সগর্ব দৃষ্টি হেনে দুলাল বলে, এই যে বাড়িটা দেখছেন, আমি নিজে মতলব খাটিয়ে বানিয়েছি। ইঞ্জিনিয়ার ডাকিনি, আগাগোড়া সমস্ত প্লান আমার নিজের।

ত্রিদিব বলে, রাস্তার যত ধুলো তাই ঘরের মধ্যে ঢোকে। আর পিছনে কসাড় জঙ্গল হয়ে উঠেছে—বাঘ লুকিয়ে আছে কি না কে জানে? কি বিশ্রী বাড়ি করেছেন এমন ভাল জায়গায়? সামনে বাগান করে ঘরগুলো পিছিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

দুলাল একটু মুশড়ে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ সে ভাবে থাকবার মানুষ নয়।

জায়গাটা ভাল তো বটে! ঝিরঝিরে ধারোয়া নদী, ওপারে উঁচু-নিচু তেপান্তর মাঠ, পিছনে নন্দন-পাহাড়—এরই মধ্যে প্লটখানা খুঁজে পেতে আমিই বের করেছি। বাড়ি করা সার্থকও হয়েছে। নতুন বাড়িতে উৎপলা দেবীরা সর্বপ্রথম এসে রইলেন। কর্তার যা অবস্থা হয়েছিল, এখন তো অনেকটা সেরেসুরে উঠেছেন। আপনি বাইরে ছিলেন ডক্টর ঘোষ, চোখে দেখেননি—ওরকম ভয়ানক বসন্ত ভাবতে পারা যায় না। বাপে মেয়ে বিছানায় পড়ে, এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই।

উৎপলা ঘোরতর প্রতিবাদ করে, কি বলছেন? আমার দিদি—

দুলালচাঁদ তাড়াতাড়ি বলে, তা সত্যি। নার্স আনা হল মণিমালা দেবীকে, শেষটা ওঁর দিদি হয়ে পড়লেন, তাঁকে না পাওয়া গেলে কি যে অবস্থা হত।

উৎপলা হেসে বলে, ভাগ্য বড় ভাল। সমস্ত দায় আপনারা ভাগ করে নিলেন। দু-দুটো রোগীর খেদমত আর সংসারের সকল দেখাশুনোর ভার দিদি এসে কাঁধে তুলে নিল—আর আপনার জন্যে রাজার হালে চিকিৎসাপত্তোর চলল, কোন দিন টাকা-পয়সার ভাবনা ভাবতে হয়নি। আপনার চেষ্টা-যত্নও কোনদিন ভুলতে পারব না দুলালবাবু।

দুলাল না না—করে ঘাড় নাড়ে। সে কি কথা। যত্ন এমন আর কি করেছি! ইচ্ছে থাকলেও কাজকর্মের ভিড়ে পেরে উঠিনে। দু-মাসে ছ-মাসে একটু খবরাখবর নেওয়া—তাই বা হয়ে ওঠে কোথায়?

উৎপলা বলে, তবু তো বার পাঁচেক এই এদ্দুর অবধি এসে দেখে গেলেন। ডাক্তারবাবুরাও বার বার কষ্ট করে আসছেন।

সকলেরই কিঞ্চিৎ অনতিস্ফুট প্রতিবাদ। দুলাল জোর দিয়ে বলে, এক বছরে পাঁচ বার আসা—সেটা খুব বড় কথা হল নাকি? অন্য অভিভাবক নেই,—সামনে বসে থেকেই দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশুনো করা উচিত। শুনুন একটা কথা—মণিমালা দেবী চলে গেছেন, আমি ঠাকুর-চাকর নিয়ে এসেছি—এবার রেখে যাব ওদের। রোগের দুর্বলতা যায়নি, সংসারের খাটাখাটনি করলে আবার আপনি বিছানায় পড়বেন।

খিলখিল করে হেসে ওঠে উৎপলা।

বছর হতে চলল, মুটিয়ে দিনকে দিন পর্বত হচ্ছি, এখনো রোগ?

রোগ বই কি!—কি বল হে ডাক্তার? বাইরে অমনি দেখা যায়। দুর্বল আছেন কি না, আপনি তার কি জানেন? ওসব ডাক্তারে বলবে।

দুপুরবেলাটা নিরিবিলি হল। গুরু ভোজনের পর দুলালচাঁদেরা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় ত্রিদিব চুপচাপ বসে। উৎপলা টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে এসে দাঁড়াল।

আজকেই যাচ্ছ ত্রিদিব-দা?

সন্ধ্যের গাড়িতে—

তাই যাও, কি আর বলি। সত্যি সত্যি এসে গেল যে ওরা। কষ্ট করে এসেছে, দু-পাঁচ দিন না থেকে নড়ছে না। তুমি কেন কষ্ট করবে এর মধ্যে পড়ে থেকে?

ত্রিদিব জবাব দেয় না। কানেই শুনছে না যেন। তা বলে উৎপলা থামে না। বলে, আমরা দয়া নিচ্ছি, মানুষটাকে তাই সইতেই হবে। না সয়ে উপায় কি? একটা কথা বলতে এসেছি ত্রিদিব-দা, তোমার কাছে এক প্রার্থনা। তুমি এসে গেছ, অকূল সাগরে ডাঙা দেখতে পাচ্ছি এবারে যেন।

একটু থেমে জোর করে সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বলে, বাবা সেই যে কথা বললেন, বাবার মেয়ে আমিও ঠিক তাই বলছি—বাঁচাও আমাদের। ইচ্ছে যদি কর, একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পার।

পাষাণ ত্রিদিব—সে বিচলিত হয় না। কৌতুক-চোখে চেয়ে অবস্থা পর্যালোচনা করছে। অর্ধোন্মাদ হরিদাস কি ভাবে বলেছেন, আর চতুরা মেয়েটা ঠিক সেই কথাই অন্য কি ভাবে বলে!

দুলালচাঁদ প্রেমে পড়ে গেছে মনে হয়—

বড়মানুষ—না খেটে আপনা-আপনি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে। কি করবে বসে বসে, একটা কিছু কাজ তো চাই।

একটু ম্লান হেসে উৎপলা আবার বলে, আমার তরফ থেকেও হয়তো গরজ ছিল প্রেমে পড়বার। সংসার ভারি কঠিন জায়গা। মানুষ দয়া করে কাউকে কিছু দেয় না, দায়ে পড়ে দেয়। দুলাল প্রেমে না পড়লে মুশকিল হত বাবাকে বাঁচিয়ে তোলা।

ত্রিদিব তখন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উৎপলার দিকে তাকিয়ে আছে। মৃদু

মৃদু ঘাড় নেড়ে বলে, তা দোষ দেওয়া যায় না বেচারাকে। ভাল করে নজর করিনি কখনো, কিন্তু মনে হচ্ছে দেখতে নিতান্ত খারাপ নও তুমি উৎপলা।

উৎপলা হেসে বলে, খারাপ নই—তা বলে ভাল? বাইরে থেকে ফিরে হঠাৎ বুঝি তোমার চোখ খুলে গেল ত্রিদিব-দা?

চোখের সামনে এক যে বিদ্যুৎ ঝলসাত আগে, কোন-কিছু দেখতে দিত না। একেবারে অন্ধ হয়ে ছিলাম পলি—

হাহাকারের মতো শোনায়। উৎপলার চমক লাগে, কথা ঘুরিয়ে নেয়।

রূপের চেয়ে কিন্তু আমার ক্ষমতাটাই দেখেছে দুলাল। চটপট ইংরেজি বলা, এক এক জবান ছেড়ে বিদেশি সাংবাদিকদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। রূপ কি আছে আমার? নেই। নইলে ধরো—

দ্বিধা হল একটু। কিন্তু আজকে উৎপলা মরীয়া। জীবন-মরণ ঝুলছে এই সুযোগটুকু ব্যবহারের উপর।

ধরো, সেই দশ বছর আগেকার একটা রাত। তোমায় নেমন্তন্ন করেছিলাম—মনে থাকবার কথা নয়—আছে মনে ত্রিদিব-দা?

ত্রিদিব ঘাড় নাড়ল।

আমি ঘুমিয়েছিলাম। বাবাও তাঁর ঘরের মধ্যে ঘুমে অসাড়। নীলমণি নিচের তলায়, দরজা খুলে দিয়ে সে শুয়ে পড়েছে। তুমি চুপিচুপি এসে বসে পড়লে আমার পাশে—

ত্রিদিব বলে, চমৎকার ঘুম তো তোমার! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এত সমস্ত টের পেয়ে গেলে—

উৎপলা বলে চলেছে, পাশে এসে বসলে দশ বছর আগেকার সেই নিরালা রাতে। তখন তো বয়স আরও কম—চেহারায় জৌলুস ছিল। গালের উপর হাত রাখলে তুমি, আমার রোমাঞ্চ হল।

রোমাঞ্চ নিতান্ত অকারণ—

উৎপলা রাগ করে বলে, হয়ই যদি, তুমি-আমি তা ঠেকাব কি করে? বয়স কম, মনে তখন কত রকমের রং—

ত্রিদিব বলে, তোমার কানে ছিল হীরের দুল। আবছা আঁধারে দুলের গোড়াটা ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না। শখ করে গালে হাত বুলোতে যাব কেন?

বলছি তো তাই। কাঁচা হাতের চুরি—বড্ড ব্যথা দিয়েছিলে তুমি দুল খুলতে গিয়ে। দুল পকেটে পুরেই বাবার ঘরের সামনে এসে গিয়ে হাঁক পাড়তে লাগলে—

ফিক করে হেসে বলে, বড্ড রাগ হয়েছিল তোমার উপর ত্রিদিব-দা। গয়না নিলে সেজন্য নয়—আলতো ভাবে হাত রেখে অমনি যদি বসে থাকতে আরও খানিক!

লক্ষণ ভাল নয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তোমার এমন সব মতলব পলি!

বৈরাগী পরমহংস মানুষ যে তুমি—তোমার তাতে কি যায় আসে?

ত্রিদিবনাথ উৎকট হাসি হেসে উঠল।

আজব সার্টিফিকেট দিচ্ছ—আমি নাকি বৈরাগী মানুষ! সকলে যা বলে তার একেবারে উল্টো।

সকলের চেয়ে বেশি জানি বলে।

তোমাদের বাড়ির সেই ভাড়াটে মেয়ে সুধাময়ী—মনে নেই তার কথা?

কেন থাকবে না? তুমি দেশে ছিলে না, তখন কতবার গিয়েছি তার কাছে।

তাকে আর আমাকে জুড়ে সারা শহর ছি-ছি করত এক সময়ে। শহর ছাপিয়ে কেচ্ছা গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নির্বিকার কণ্ঠে উৎপলা বলে, সমস্ত মিথ্যে ত্রিদিব-দা—

অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারবে না। সুধার গর্ভের সন্তানটা মরে গেল বটে, তবু হাসপাতালের খাতায় আমার পিতৃপরিচয় রয়েছে।

ভ্রূভঙ্গি করে উৎপলা বলে, হাসপাতালওয়ালারা অমন কত কি লেখে!

আমার নিজের হাতের সই। অন্য লোকের লেখা নয়।

উঃ, মজাদার এক গল্প রচে তার নিচে সই মেরে সকলকে কি ধাপ্পাটাই দিয়েছিলে ত্রিদিবদা—

ত্রিদিব চটে গিয়ে বলে, তা তো বটেই। আমার দোষ তুমি কিছুতে দেখবে না। তারই এস্পার-ওস্পার করতে এতদূর এলাম। খবরের কাগজ কেটে কেটে পাহাড় জমিয়েছ—তার দুটো-পাঁচটা পড়লে অতি-বড় শত্রুকেও ঘাড় নেড়ে মানতে হবে, বিস্তর মহৎ কর্ম করে এসেছি নানান দেশে—

করেছ, সে কি মিথ্যে?

আমার গবেষণার ভুল বের করে টিটকারি দিয়েছেন পণ্ডিতেরা, পচা-ডিম ছুঁড়ে মেরেছিল ছাত্রছাত্রীরা এক সভায়, ভাল ভাল কাগজে কলাও করে কত গালি দিয়েছে—কই, এ সবের একটাও তো নেই তোমার সংগ্রহে?

ভাল মানুষের ভাবে উৎপলা বলে, কই দেখিনি তো!

দেখবেই তো না? তোমার কাটিংসের যশোমাল্যে ও-সমস্ত থাকলে নিষ্কলুষ মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় যে! সত্যি বলো পলি, তোমার এত মাথাব্যথা কেন আমায় নিয়ে?

জান না, সেই যে আমাদের চিরকালের বিরোধ! যখন ছোট্ট এতটুকু ছিলাম তখন থেকে। কতবার জব্দ করেছি। এ-ও হল তাই, পাল্লা চলেছে আমাদের দু'জনের। মহাস্ফূর্তিতে তুমি নিজের কলঙ্কের ঢাক পেটাতে। তারপর বিদেশে চলে গেলে—আমি সেই সময় ফাঁক পেয়ে গেলাম।

উৎপলা সোজা হয়ে দাঁড়াল। রাজরাণীর মতো সগর্ব গ্রীবাভঙ্গিতে বলে, দেখা যাক কে হারে কে জেতে? এই বনবাসে পড়ে থেকে সুবিধে হচ্ছে না। তুমি ফিরে এসেছ, কোন ভয়ে আর পালিয়ে থাকব?

ত্রিদিব বলে, কবে যাচ্ছ বল দিকি?

হাওড়া স্টেশনে থাকবে?

উঁহু, তার আগে লম্বা দিতে হবে—

তীব্র শ্লেষের সুরে উৎপলা বলে, এমন ভয় আমাকে?

একজনে এত ভাববে আমায় নিয়ে, এ আমি সইতে পারিনে পলি। পুরানো পিপাসা আমার মিটে গেছে। খ্যাতি-যশ চাইনে, সকলে ভুলে যাক, আমার মৃত্যু হোক।

॥ এগার ॥

সেই সবুজ চিঠির খোঁজ পড়ল আজকে। ত্রিদিব বলে, চিঠিটা দাও আমাকে সুধা।

হঠাৎ?

ছিঁড়ে ফেলে দেব। জীবনে যা চেয়েছিলাম, সমস্ত পেয়ে গেছি। এর পরে চিঠি রাখবার মানে হয় না। তোমারও আর দরকার নেই।

সুধা বলে, আমার দরকার কোনদিন ছিল না। তুমি চলে যাবার পর কত কষ্ট পেয়েছি, কত রকম উঞ্ছবৃত্তি করেছি। চিঠি বের করিনি তবু। বাক্সেই রয়েছে, হাত ছোঁয়াতে ঘৃণা হত।

ত্রিদিব হা-হা করে হাসে।

লোকে শুনলে বিস্তর সাধুবাদ দেবে তোমায় সুধা। এমন মহৎ আত্মত্যাগ কলিযুগে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু আমি জানি, এক নম্বরের হাঁদারাম তোমরা—ভাল ভাল কথা আউড়ে ঘাড় নামিয়ে দাও। তুখড় ব্যক্তিদের তাই কাঁধে পা রেখে উঁচু হয়ে উঠবার সুবিধা হয়।

নিঃশব্দ দৃষ্টির এক খোঁচা দিয়ে সুধা চিঠি আনতে গেল। ত্রিদিব চেঁচিয়ে বলে, এক কাপ চা-ও এনো সুধারাণী। চিঠির দেরি হলেও ক্ষতি নেই—গলা খুসখুস করছে, চায়ের আগে দরকার।

একখানা মোটা বই সামনে খোলা। সাবধানে তার থেকে নোট টুকে টুকে নিচ্ছে খাতায়। মুহূর্তে আবার নিবিষ্ট হয়ে গেল।

কতক্ষণ কেটেছে। টং করে ঘড়ি বাজতে চমক লাগল। চায়ের পিপাসা জেগে উঠল আবার।

গোপলা!

ডাক দিয়েই হুঁশ হল, গোপাল তো বাজারে গেছে। মিষ্টি করে ডাকে, অ সুধারাণী, ভুলে বসে আছ কি দরবার করলাম?

চায়ের পিপাসা অদম্য হয়েছে। উঠে চলল সুধার খোঁজ নিতে, কি করছে সে এতক্ষণ ধরে?

বারান্দা পার হয়ে উত্তরের প্রান্তে সুধার ঘর। ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেশের সমস্ত জিনিসপত্র মেঝেয় ঢেলে ফেলেছে। তার পাশে সুধা গালে হাত দিয়ে বসে।

চায়ের কি হল?

সুধার যেন সম্বিৎ ফিরে এল। বলে, তাই তো! উনুনে জল চাপিয়ে এসেছিলাম, এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে।

তার পরে কেঁদে ফেলে আর কি! পাচ্ছিনে তোমার সে চিঠি—

কি সর্বনাশ!

স্পষ্ট মনে আছে, সুটকেশের খোপে ছিল। তুমি যত চিঠি দিতে সমস্ত ঐ একটা জায়গায় রাখতাম।

খোপের ভিতর থেকে চিঠি বের করে করে দেখায়: এই দেখ, যাবার সময় এডেন থেকে লিখেছিলে, জেনোয়া থেকে লিখেছিলে— সেই সমস্ত চিঠি অবধি রয়েছে। কত চিঠি! ঐ একখানাই শুধু নেই।

ত্রিদিব বিরক্ত সুরে বলে, আমার চিঠিপত্তোরের যাচ্ছেতাই হোকগে—কিছু যায় আসে না—সে চিঠি যে শেখরনাথের।

মনের উদ্বেগে নিজেও ঐখানে বসে পড়ে কাগজপত্র হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করছে।

কি ভয়ানক চিঠি, তোমার অজানা নেই। শেখর জানে, সব চিঠি পোড়ানো হয়ে গেছে। হয়েছেও তাই—ঐ একখানা ছাড়া। তোমার

ভবিষ্যৎ ভেবে নমুনা হিসাবে রেখে দিয়েছিলাম। যদি কোন দিন কাজে আসে।

বাইরের দিক থেকে হাঁক আসে, ঘোষ মশায় আছেন? ত্রিদিবনাথ, আছ নাকি বাড়িতে?

সুধার মুখের দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে ত্রিদিব বলে, মতলব করে সরিয়ে রাখনি তো?

এত বড় কথা বলছ আমায় দাদা?

হয় তো ভাবলে, এখন না হোক পরে কোন না কোন সময় কাজে লাগবে। তুমি বেহাত করতে চাও না। নয় তো পাখনা বেরিয়েছে কি চিঠির, উড়ে গেছে? খুঁজে রাখ, চিঠি আমি চাই-ই।

কি আশ্চর্য, বাইরের ঘরে জংবাহাদুর। এত কাণ্ডের পরেও বাড়ি বয়ে এসে তিনি আপ্যায়ন করছেন।

কি আনন্দ হয় যে ভায়া তোমায় দেখে! মেসের সেই একটা সিটে দু-ভাই জড়াজড়ি করে ঘুমিয়েছি। আজকে তুমি কত বড়। দেখে আনন্দ, শুনেও আনন্দ।

ত্রিদিব বলে, বড় হই যা-হই, আপনি করেছেন। নিরাশ্রয় হয়ে পথে ঘুরেছিলাম, মুখ ফুটে না বলতে আপনি জায়গা দিলেন।

ভুজঙ্গ বাড়ুয্যে হেঁ-হেঁ করে হাসেন, ওসব তুলে লজ্জা দাও কেন ভায়া? কত পুরানো ভাবসাব আমাদের! একটুখানি অসুবিধায় পড়েছিল বটে—কিন্তু আমি নির্ঘাৎ জানতাম, আগুন ছাইচাপা থাকবে না, দপ করে জ্বলে উঠবে। হলও তাই।

ত্রিদিব একই সুরে বলে চলেছে, উপকারের কি অন্ত আছে? ঝুমা—আপনার বউমা, মাধবীলতা বললে চিনতে পারবেন—গাঁয়ে পড়ে ছিল, চিঠি লিখে আনলেন তাকে। এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে ছেলেসুদ্ধ তাকে পাঠিয়ে দিলেন ঝড়বাদলের মধ্যে—

ভুজঙ্গ প্রতিবাদ করে ওঠেন: আমি চিঠি লিখেছিলাম? কোন্

আহাম্মক বলে এমন কথা? শত্তুরে তোমার কান ভাঙাচ্ছে ভায়া।

বলেছিল ঝুমা নিজেই। আহা, চাপতে চাচ্ছেন কেন? ভালই করেছেন—মেসে থাকতে দিয়ে যা করলেন, তার চেয়ে বেশি ভাল। আমার পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়ে মা আর ছেলে সরে পড়ল। অত বড় কাজটা কত সহজে কেমন কৌশলে আপনি করে দিলেন। আরও এক সুখবর দিই জংবাহাদুর, মা-টা একেবারে সরেছে। ছেলের খবর সঠিক পাইনি, কিন্তু মা কি আর ফেলে গেছে সেটাকে?

বলতে বলতে ত্রিদিব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমার সম্মান প্রতিষ্ঠা ধরতে গেলে, আপনারই দয়ায় সমস্ত। বসুন, জুতো খুলে আরাম করে বসুন সোফার উপর। রবিবার—আজকে তো অফিসের ঝামেলা নেই। খেয়ে যান এখান থেকে। দু'জনে একসঙ্গে স্ফূর্তি করে খানাপিনা করি।

হাসছে ত্রিদিব। ভুজঙ্গ অস্বস্তি বোধ করছেন। বললেন, আজকে বড় ব্যস্ত। আর একদিন হবে ভায়া। তোমার এখানে খাব, তাতে আর কথা কি! রবিবার বলছ—রবিবার বলে রেহাই নেই আমার, নতুন বাবু চোখে হারান। এই দেখ, তাঁরই এক কাজ নিয়ে এসেছি।

নিমন্ত্রণ-পত্র ত্রিদিবের হাতে দিলেন। বড় সাইজের কার্ড, বাহার করে ছাপা। এপাশে-ওপাশে একটু ছবিও আছে। নজর করে দেখবার মতো। দুলালচাঁদ নিমন্ত্রণ করছে তার কাগজের বার্ষিক উৎসব—বিরাট রিসেপসান বরানগরের বাগানবাড়িতে। তাই বটে, মনে পড়েছে,—জংবাহাদুরের চাকরি দুলালের কাগজেই তো! হিসাব-বিভাগের এক কেরানি তিনি। তখন মানিকচাঁদের আমল। বুড়ো মনিব মরে গিয়ে নতুন আমলে ভুজঙ্গ বেশ তালেবর হয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে। দুলালচাঁদ তাকে চোখে হারায়।

এক নজর চোখ বুলিয়ে ত্রিদিব চিঠিটা বাজে-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল। ভুজঙ্গ হাঁ হাঁ করে ওঠেন, যাবে না ওখানে?

হাঁ—

তবে ফেলে দিলে যে ?

তুলে দেখুন, ঐ দিন ঐ সময়ে অমন দশ-বারটা নিমন্ত্রণ আছে। সমস্ত জায়গায় যাব।

বলে ত্রিদিব হাসতে লাগল। বলে, চিঠিপত্র ঐ এক জায়গায় রেখে দিই। গোপলা নিয়ে গিয়ে উনুন ধরায়। আজকাল সে কেরোসিন কেনে না, কেরোসিনের পয়সা ক'টা মেরে দেয়।

ভুজঙ্গ আহত কণ্ঠে বলেন, কিন্তু অন্যের সঙ্গে দুলালবাবুর চিঠির তুলনা ?

ঠিক। চিঠিটা অনেক ভাল—মোটা কাগজে ছাপা, অনেকক্ষণ ধরে পুড়বে।

ভুজঙ্গ কাতর হয়ে বলেন, বাবু নিজে আসতেন, তা বড় মুখ করে আমিই তাঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এলাম। একলা একজন মানুষ তাবৎ শহর জুড়ে নেমন্তন্ন করে বেড়াচ্ছেন। আগ বাড়িয়ে গিয়ে তাই বললাম, আমার অতি-আপন মানুষ—আপনার চেয়ে আমার যাওয়ায় কাজ বেশি হবে, নির্ঘাৎ তাকে আনতে পারব।

তারপর আব এক কথা মনে উঠল ভুজঙ্গর। একটু হেসে বললেন, চায়ের কথা লেখা চিঠিতে—তাই ভেবেছ বোধ হয় নিরামিব চা। শুধু চায়েব নামে বরানগব অবধি যেতে চাচ্ছ না ?

ভাল মানুষের ভাবে ত্রিদিব বলে, আছে নাকি কিছু চায়ের উপরে ?

কিছু মানে ? গিয়েই দেখো, ঠকবে না। অঢেল আয়োজন। আমার আবার মুশকিল হয়েছে, ইংরেজি খাদ্যাখাদ্যের নাম বিলকুল ভুলে যাই। খেয়েদেয়েই শেষ নয়—তারপরে গান-বাজনা। সারা সন্ধ্যে জুড়ে হুল্লোড়।

মজা লাগছে। চিঠি হারানোর উদ্বেগ ভেসে গেছে মন থেকে। ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে আরো অনেকক্ষণ শোনা যেত, কিন্তু উৎপলা দরজায়। হাসতে হাসতে সে এসে ত্রিদিবের পাশে বসল।

ত্রিদিব শিউরে ওঠার ভঙ্গি করে বলে, এসে গেছ কলকাতায়? আরে সর্বনাশ—বাড়ি অবধি চিনে নিয়েছে! যশস্বী মানুষের কী দুর্গতি! এত দূরে শহরতলিতে এসে বাসা বেঁধেও আস্তানা গোপন থাকে না। কর্মনাশিনী এতদূর অবধি যখন হামলা দিয়ে পড়েছে, কলকাতা না ছেড়ে কোন উপায় নেই।

কলকাতা ছেড়ে যাবে কোথা শুনি? পৃথিবীটা বড্ড ছোট। পালিয়ে বাঁচবার জো নেই। সেই যে সাধুসন্তরা বলে, পদ্মপাতায় জলের মতন এতটুকু জীবন—হেলাফেলায় তার অনেক গেছে, অনেক গেছে। আর তোমায় ফাঁকে ফাঁকে থাকতে দেওয়া হবে না ত্রিদিবদা।

শেষ দিকটায় কণ্ঠ অস্বাভাবিক রকম ভারী। মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে সামলে নিল উৎপলা। ম্লান হেসে বলে, যাক গে—পরের কথা পরে। আপাতত কোন কু-মতলব নেই। তোমায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

কার্ড বের করতে জংবাহাদুর বলে উঠলেন, আমারও ঐ একই ব্যাপার। আজে বাজে নানান কথা বলছে আমায়। দেখুন, আপনি যদি পেরে ওঠেন।

ত্রিদিব বলে, ওঁকে নাকচ করে দিলাম তো তুমি এসে হাজির। তোমায় নাকচ করলে বুঝি খোদ মনিব দুলালচাঁদ এসে উদয় হবে?

উৎপলা ঘাড় দুলিয়ে বলে, আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না ত্রিদিবদা। তাই জেনেই তো এসেছি।

কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো, আমার উপরে এত হামলা কেন? টেনেহিঁচড়ে আমায় না নিয়ে গেলে যজ্ঞপণ্ড হবে, এমনিতরো ভাব দেখছি।

জংবাহাদুর খোশামুদি সুরে বলেন, নিরতিশয় গুণী ব্যক্তি যে তুমি।

এমন গুণী হাজার হাজার আছে।

উৎপলা বলে, কিন্তু ত্রিদিবনাথ ঘোষ একজন—এই একটি মাত্র।

জংবাহাদুর ঐ সঙ্গে জুড়ে দেন, কী মায়ায় বেঁধে ফেলেছ আমাদের

নতুন বাবুকে। গুণগরিমার যে ফিরিস্তি দিচ্ছেন, সে সব যদি নিজের কানে একবার শোন—

ত্রিদিব বলে, কিন্তু ত্রিদিব ঘোষ বিহনে তো উনিশটা উৎসব নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেছে। বিংশ বার্ষিকীতে না গেলেও দুলালের কাগজের রোটারি মেশিন অচল হয়ে থাকবে না।

উৎপলা বলে, যদি বলি আমারই জন্মবার্ষিকী ওটা—

তাই নাকি ? কার্ডখানা ত্রিদিব উল্টে-পাল্টে দেখে।

কার্ডে কি পাবে, ছাপার অক্ষরে থাকে কি সব কথা ? আমি বেঁকে বসলাম, আমার নামে কিছুতে উৎসব হবে না। তখন ঐ কাগজের বেনামিতে হল। কাগজের জন্মতারিখ চলে গেছে দেড় মাসের উপর।

কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে ত্রিদিব বলে, বটে ?

যা-ই ভাব তুমি, কথাটা সত্যিই এই। খবর নিয়ে দেখগে।

ভুজঙ্গকে দেখিয়ে বলে, ইনি তো অনেক কাল আছেন। বলুন দিকি, আর কখনো এই ধরনের উৎসব হয়েছে কিনা।

কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে উঠল। উৎপলা বলে, আমার জন্মদিনে আশীর্বাদ কোরো ত্রিদিবদা, সুখ-শান্তি আসে যেন জীবনে। লড়াইয়ের সিপাইর মতন দৌড়-ঝাঁপ করে করে আর পারিনে।

টেলিফোনের আওয়াজ এল। ফোন ধরতে ত্রিদিব ভিতরে গেছে। জংবাহাদুর বলেন, আপনার সঙ্গে খাতিরটা বেশি দেখা যাচ্ছে।

উৎপলা ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, মোটেই দেখতে পারেন না আমায়।

তাই বললে শুনব ? একই জিনিস—আমার চিঠি ছুঁড়ে দিল ঝুড়িতে, আপনার চিঠি দু-দুবার পড়ে পকেটে পুরল। অথচ ধরুন, সেই যখন মেসে থেকে পড়াশুনা করত, ভাই ভাই এক ঠাঁই তখন থেকে। আজকের কথা ? তার কোন খাতির হল না, রমণী বলেই আপনার এত সমাদর।

উৎপলা পুলকিত কণ্ঠে বলে, আপনার মেসে থেকে পড়তেন? আমাদের বাড়িতে খুব যেতেন সেই সময়টা। কলেজের কতটুকুই বা পড়া—কিন্তু বাইরের কত পড়াশুনো করতেন ঐটুকু বয়সে।

জংবাহাদুর বলেন, আর লম্বা-লম্বা কথা—হেনো করেঙ্গা, তেনো করেঙ্গা। কথা অবশ্য খানিকটা বজায় রেখেছে—দিগ্‌গজ হয়ে ফিরেছে বিদেশ থেকে। কিন্তু হলে কি হবে—অতিশয় হারামজাদা ব্যক্তি।

উৎপলা স্তম্ভিত হয়ে তাকাল।

জংবাহাদুর আরও জোর দিয়ে বলেন, এক দোষে সমস্ত মাটি। ওই যে বলে থাকে, কড়াই ভর্তি দুধে যৎসামান্য গোময়। বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে, অথচ খাতিরের মানুষ আপনিই কেবল জানেন না?

উৎপলা হেসে ফেলল। হেসে বলে, কেমন খাতির বুঝে নিন তবে।

জংবাহাদুর বলেন, গোপন করেছে আপনাকে। কিম্বা বিদ্যাধরী-ঘটিত ব্যাপার—লজ্জা হয়েছে আপনার কাছে বলতে। না-ই বলল—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কানে ছিপি এঁটে ঘোরাফেরা করেন? এত বড় ব্যাপার, নইলে তো, না শোনবার কথা নয়।

কানে শুনলেই কি সব বিশ্বাস করা যায়?

উত্তেজিত হয়ে ভুজঙ্গ বলেন, স্বচক্ষে দেখে নয়ন সার্থক করে আসুন তবে। আপনার ভিতরে যাবার বাধা নেই—ভিতরেই রয়েছেন দেবীটি। আমার সঙ্গে কত কালের চেনাজানা—তবু ছায়া মাড়াইনে। নতুন বাবু নেহাত বলে বসলেন—কি করা যায়—ঘেন্না-ঘেন্না করে আসতে হল।

ত্রিদিব ফিরছে দেখে থতমত খেয়ে চুপ করলেন। ত্রিদিব বলে, কি হচ্ছিল আপনাদের?

ভুজঙ্গ সুর বদলে বলেন, যখন মেসে থেকে কলেজে পড়তে সেকালের সেই সমস্ত পুরানো কথা। শুনতে চাচ্ছেন ইনি। অতিশয়

সৎ ছেলে—পানের খিলিটা অবধি মুখে দিতে না। এখনকার ড্যাঁদোড় ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলো দেখে সে আমলের আন্দাজ মিলবে না। যে চারা বড় হবে, তার একটা পাতা দেখে বোঝা যায়। আমরা তখন থেকেই জানি, এই মানুষের জুড়ি ভূ-ভারতে মিলবে না।

উঠে পড়লেন তিনি। ত্রিদিব বলে, আপনার নিমন্ত্রণ নিলাম জংবাহাদুর। যাব। দুলালচাঁদ বাবুকে বলবেন।

ভুজঙ্গ ভ্রূকুটি করে বলেন, আমার আর হল কোথায়? ছোট ভাইয়ের মতন আগলে রেখে ঝগড়া করে বেড়িয়েছি মেসের লোকের সঙ্গে। যাকগে যাকগে—যার নিমন্ত্রণে হোক, গেলেই হল। নতুন বাবুর বড্ড ইচ্ছে, তোমায় নিয়ে যাবার।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন—ত্রিদিব মনোরম গোছের কিছু বলে সান্ত্বনা দিত, তার সময় হল না। উৎপলা বলে, ভুল বলে গেলেন—উনি কিছু জানেন না। ইচ্ছে আমারই, আমার ইচ্ছেটাই বসিয়ে দিয়েছি দুলালচাঁদের মুখে।

মতলব কি বল দিকি?

নিয়ে গিয়ে উৎপলা দেবীর খাতিরটা দেখব, বড় বড় লোকে কত তাকে সমীহ করে! দেখে শুনে তোমারও যদি কাণ্ডজ্ঞান হয়—মনের মধ্যে একটুখানি যদি হিংসে আসে।

খিল-খিল করে তরঙ্গিত হাসি হাসে উৎপলা। ত্রিদিব বলে, ফোন করছিল কে জান? শেখরনাথ। সে-ও এক হাসির ব্যাপার। কোন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী ভর করেছেন তার শাঁসালো স্কন্ধে। অর্থাৎ, বোঝা গেল, বয়স যা-ই হোক—বুড়ো হয়ে পড়েছে শেখরনাথ। এতক্ষণ ধরে সেই মহাপুরুষের অলৌকিক গুণ-ব্যাখ্যান। উক্ত মহাপুরুষের আশ্রমে আমায় একদিন নিয়ে যেতে চায়।

যেও না ত্রিদিবদা, খবরদার! অতি ভয়ানক ঠাঁই। এই হল কায়দা। শিষ্যরা জপিয়ে জাপিয়ে ভালমানুষ ভদ্রলোকের খপ্পরে নিয়ে ফেলে। আড়কাঠির মতন ব্যাপার—কি পরিমাণ বখরা সেটা অবশ্য

বাইরে প্রকাশ পায় না। তারপরে জ্ঞানবুদ্ধি ধনসম্পত্তি সর্বস্ব গুরুপদে সমর্পণ করে দিয়ে কোমর বেঁধে তোমায় নাম জপে লাগতে হবে।

ত্রিদিব বলে, না নামজপের গুরু নয়। মডার্ন সাধু—ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের পাক করে যাঁরা তত্ত্ব ছাড়েন। আদায় কাঁচকলায় বেমালুম এঁরা মিশ খাইয়ে দেন। শেখরনাথের ইস্কুলের বাচ্চাগুলো নিয়মিত এই ধর্ম-বিজ্ঞানের মিকশ্চার সেবন করবে তারই আয়োজন চলেছে। কি পরিমাণ চিনি ও জল মিশ্রণে উদগার উঠবে না, আমার সঙ্গে তৎসম্বন্ধীয় নিগূঢ় আলোচনা।

উৎপলা বলে, সুধা কোথায়? ভিতরে বসে বসে করছে কি এখন? চেন তাকে?

তোমার চেয়ে বেশি চিনি, মনে হচ্ছে। এ বাড়ি চিনে এলাম আজকে নয়। তুমি বিলেত ছিলে, কতবার এসেছি তখন। তার পরে সুধা দরজায় তালা দিয়ে সরে পড়ল। পাড়াগাঁয়ের ভাত খেয়ে কেমন মুটিয়ে এল দেখি। দেখে নয়ন সার্থক করি গে।

ত্রিদিবকে ডাকে, এস না। একা কেন বাইরে থাকবে?

না, যাও তুমি। আমার কি দরকার?

কেমন উদাস ভাব ত্রিদিবের। কি ভাবছে? মোটা বইটা আবার খুলে বসল।

॥ বারো ॥

থমথমে মুখ সুধার। উৎপলা গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

কি হয়েছে? বল, বলতেই হবে। আমায় গোপন করে দুঃখ পুষে বেড়াবে, তা কি হয় কখনো?

আবার বলে, চুপ করে থেকে এড়াতে পারবে না আমায়। পেরেছিলে সেই আর একদিন?

চিরুনি নিয়ে সুধার উস্কোখুস্কো চুলগুলো পরিপাটি করে দিচ্ছে।

আদর পেয়ে সুধার ছ'চোখ ছাপিয়ে অশ্রু গড়ায়। কত দিন পরে, আহা, কাঁদছে সে আবার উৎপলার মুখোমুখি বসে।

বল—

সুধা বলে, দাদা যাচ্ছে-তাই করে বলেছে। একটা চিঠি হারিয়ে ফেলেছি—জরুরি চিঠি—তাই বলল, মতলব করে সরিয়ে রেখেছি নাকি আমি।

উৎপলা লঘুভাবে উড়িয়ে দেয়, এই? আমি ভাবছি না জানি কি-একটা ব্যাপার—

সুধা আশায় আশায় তার দিকে তাকায়।

দেখেছ সে চিঠি? সবুজ কাগজে লেখা, সবুজ রঙের খাম। জান, কোথায় আছে—কে নিয়েছে?

চিঠি আমার কাছে। নষ্ট হয়নি—পরম যত্নে রেখে দিয়েছি।

তুমি পেলে কি করে?

চুরি করেছি—

সুধা স্তম্ভিত হয়ে গেল। চোরের কিন্তু লজ্জা নেই, আরও জাঁক করে বলে, মতলব আমার খারাপ গোড়া থেকেই। কি ভেবেছিলে বল তো সুধা? তোমার মতন নিখুঁত পুণ্যবতী এক মেয়ে—কবে কি একটু রোমান্স করেছিল, সে ভুলের এখনো প্যানপ্যানানি গেল না—খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে আসতাম বুঝি নাকিকান্না শুনতে? কান্নার বড় অভাব কিনা সংসারে, কান্না শুনতে এতদূর তাই আসতে হয়!

সুধা বলে, আর দাদা ভাবলেন কিনা মতলব করে চিঠিখানা সরিয়ে ফেলেছি আমি। দাদাও এই যদি ভাবেন, সংসারে তবে কার মুখে তাকাই?

উৎপলার কোলের উপর মুখ ঝেঁপে পড়ে। কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ক্ষণ পরে উৎপলা তার মুখ তুলে ধরে চোখের জল মুছিয়ে দেয়। গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, এত

দিনেও বুঝলে না কি রকম খাপছাড়া মানুষ ত্রিদিবদা? রাগ করো না ওর উপর, করুণা করো। এত বড় প্রতিভা নিয়ে সকলের দরজায় দরজায় ঘুরেছে ছন্নছাড়া ভিখারির মতো। অবৈধ কথাটা নিয়ে চতুর্দিকে ঢি-ঢি পড়ে গেল, সকলে রংদার গল্প ছড়াচ্ছে। আমি চিনি ওকে—একা আমিই কেবল ঝগড়া করে বেড়াই—না, হতে পারে না কখনো এমনটা—

মুখ তুলে সুধা প্রশ্ন করে, কেন?

গাঁয়ের ইস্কুল থেকে পাশ করে সেই কলেজে পড়তে এল, তখন থেকে দেখছি ত্রিদিবদাকে। এই সব অতি-সাধারণ পাপ-অন্যায় ও-মানুষের দ্বারা হয় না। হয়নি যে—তার প্রমাণ আজকে আমার হাতের মুঠোয়। সন্দেহটা ঘোরতর হল তার নিজের উৎসাহ দেখে—নিজের দুর্নাম কেন অমন করে রটিয়ে বেড়ায়? ডাইনে বাঁয়ে যাঁকে পায় কীর্তি জাহির করছে তার কাছে। বুঝলাম 'কিন্তু' আছে। হাওড়া-স্টেশনে তোমায় পেয়ে গেলাম, নইলে খুঁজে-পেতে তোমার সঙ্গে পরিচয় করতে হত।

সুধাময়ী অভিমান ভরে বলে, মতলব নিয়ে ভাব করেছ উৎপলা—ভালবেসে নয়?

ভাল পরে বেসেছি। তাড়াতাড়ি চিঠি সরাতে হল—সাধু সদাশয় তোমরা, হয়তো বা ধর্ম রেখে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেবে। তোমার উপর যত অন্যায় হয়েছে, একদিন শোধ তুলব ঐ পাশুপাত-অস্ত্র দিয়ে।

সেই কথাই বাইরে এসে ত্রিদিবের সঙ্গে হচ্ছে। উৎপলা বলে, বিষম অন্যায় তোমার—মিছামিছি সন্দেহ করেছ। এত দিন ধরে দেখছ—সন্দেহ আসে তবু ওর ওপর! এখনো সুধার রাগ পড়েনি।

ত্রিদিব বলে, রাগ করতে জানে তা হলে? ভাল, ভাল। আমি ভেবেছিলাম, বরফে-গড়া মেয়েটা—তাপে গলে যায়, অগ্নিকাণ্ড ঘটে

না। কিন্তু এত বড় দুষ্কর্মে তোমার মতি হল কেন পলি? চুরি করা বড় দোষ, ছোটবেলা থেকে শিখে আসছ—

উৎপলা হেসে উঠল, কিছু না, কিছু না—মহাজনের পন্থা। ফুল-চুরির সময় তোমার হাত সাফাইয়ের কায়দাটা শিখে নিয়েছিলাম। শিক্ষাটা বড্ড কাজে এল। নইলে কি আর এমন মুঠোর ভিতর পেতাম তোমায়?

মুঠোয় গেছ পেয়ে? সরু সরু আঙুলগুলোর তো ভারি অহঙ্কার!

উৎপলা বলে চলেছে, চল্লিশ বছর বয়স হল—অপবাদ কাঁধে দিব্যি ফাঁকে ফাঁকে কাটিয়ে যাচ্ছ। চিঠি যে তোমার সকল ভণ্ডামি ফাঁস করে দেবে ত্রিদিবদা।

চিঠিতে আছে নাকি যে আমি নিষ্কাম নির্লোভ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির?

অমনভাবে না-ই থাকুক—সুধা আর নিজেকে নিয়ে পরম আনন্দে যা রটনা করে বেড়াতে, সেটা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেল। শেখরনাথ যে সে মানুষ নন। দাতাকর্ণ শেখরনাথ, সত্যসন্ধ শেখরনাথ, দেশ-প্রেমিক শেখরনাথ, স্বজাতিবৎসল শেখরনাথ—যত রকম গুণ থাকতে পারে সমস্ত একাধারে একটি মানুষের মধ্যে। সেই শেখরনাথ চিঠির মধ্যে লিখিতভাবে বলে দিচ্ছেন—তুমি যতই গলা ফাঠাও, কেউ তোমায় বিশ্বাস করবে না।

ত্রিদিব তর্ক ছাড়ে না তবু।

না হয় মিছেই হল সুধাময়ীর ব্যাপারটা। সুধা ছাড়াও মেয়ে আছে। দুনিয়ায় অন্নের অভাব—কিন্তু পুরুষের কাছে মেয়ে কোন দেশেই দুর্মূল্য নয়।

উৎপলা বলে, সে পুরুষ তুমি নও—আমি তার হলপ করে সাক্ষি দেব। নইলে, ধর, দশ বারো বছর আগেকার কথা—তখন হয়তো একেবারে খারাপ ছিলাম না দেখতে—তুমি তুল নিলে, কোমলভাবে গালের উপর হাত রাখতেও পারতে একটুখানি। আমি ঘুমিয়েছিলাম, কোন কিছুই জানবার কথা নয়।

ত্রিদিব হেসে উঠল, তবু এত সমস্ত জেনে রেখেছ। আমারও সন্দেহ হয়েছিল কপট ঘুম। হয়তো বলে দেবে। মনে মনে ছোটো-একটা গল্পও ছকে রেখেছিলাম।

উৎপলা আবদার করে, একটা গল্প বল দিকি শুনি।

এতকাল পরে তাই আর মনে থাকে। তখন যা অবস্থা, একটা কলঙ্ক-টলঙ্কও দিতে পারতাম। এই ধর দুল বেচে একটা প্রেমোপহার কিনে নিতে বলেছ আমায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড তুমি পরের দিন বললে, দুল জোড়া হারিয়ে গেছে।

উৎপলা কপাল চাপড়ায়, হায় হায়—সত্যিকথা কেন বললাম না রে!

বললে কিছুই হত না। আমার জবাব পেয়ে মেশোমশায় লজ্জায় ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিতেন।

উৎপলা বলে, কিম্বা লজ্জা ঢাকবার জন্যে হয়তো বিয়েই দিয়ে দিতেন তোমার সঙ্গে।

সর্বনাশ, বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছিল নাকি?

হাসিমুখে স্থির কণ্ঠে উৎপলা বলে, ইচ্ছে তো এখনো—

স্তম্ভিত বিস্ময়ে ত্রিদিব নির্বাক হয়ে যায়। উৎপলাই কথা বলে প্রথম।

কি ভাবছ?

বিয়ের বয়সই বটে আমার! মোটে চল্লিশ। বরের সজ্জায় চেহারাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি।

এগারো বছর আগে তোমার বয়স ছিল উনত্রিশ, আমার বাইশ। সেই পুরানো ছবিটারও আন্দাজ নিও। ভাবনা নেই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বয়সে এগিয়েছি।

আশ্চর্য বটে! মেশোমশাইর টাকাকড়ি আছে, তুমি লেখাপড়া জান, দেখতেও—না, একেবারে দুর-ছাই বলা চলে না। এগারোটা বছর নবেলি কায়দায় নিশ্বাস ফেলে ফেলে বুড়িয়ে এলে—কোন-একটি প্রেমিকের টনক নড়ল না?

উৎপলা বলে, মিছে কথা বোলো না ত্রিদিবদা। হাতফিক একটি তো চোখের উপরে দেখতে পাচ্ছ—দেওঘর অবধি পিছন ধরে গিয়েছিল, বেনামিতে আমার জন্মদিন পালন করছে। আর, যাচ্ছ যখন পার্টিতে—আরো হতাশ প্রেমিকের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে।

তবে?

পোড়াকপাল আমার! কাউকে পছন্দ হয় না। সেই যে আমাদের বাড়ি এক পাগল আসত, মনে আছে? কাপড় পরিস নে কেন রে পাগলা? না, পাড় পছন্দ হয় না। আমারও হল তাই। স্বামী বলতে মর্যাদায় বাঁধবে না, এমন মানুষ খুঁজে পাই নে।

একটু থেমে ফিক করে হেসে বলে, এক তুমি ছাড়া—

ত্রিদিবও হেসে বলে, লক্ষণ খারাপ।

শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় লক্ষণ মিলে যাচ্ছে ত্রিদিবদা। আমার ফুলের সঙ্গে সেদিন হিয়া-মন-প্রাণও চুরি হয়ে গেছে বলে ঠেকছে।

খিল-খিল করে উচ্ছ্বসিত হাসি হাসে। তারপর হাতঘড়ির দিকে এক নজর চেয়ে উঠে পড়ল।

কাণ্ড দেখ! কত জায়গায় নেমন্তন্ন বাকি—এখানে আড্ডা দিয়ে আমি সময় কাটাচ্ছি।

যেন ঝড় তুলে দিয়ে উৎপলা চলে গেল। হাসি, কথাবার্তা কণ্ঠস্বর —সমস্ত আজ আশ্চর্য। চেনাজানা পলি থেকে একেবারে আলাদা আজকের এই উৎপলা। যা সমস্ত বলে গেল, সত্যি না ঠাট্টা, ধরা মুশকিল। মুখভরা হাসি দেখে মনে হয়, ভারি এক রসিকতা। কিন্তু ঐ দৃষ্টিতে চেয়ে অমন উত্তপ্ত আকুল কণ্ঠে বলে যাওয়া—তখন নিসংশয় হতে হয়, কথা বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে নয়, গভীর অন্তর থেকে। অন্তর মিথ্যাবাদী হয় না মুখের মতো।

কত বেলা হয়ে গেল, তবু সেই একটা জায়গায় স্থাণু হয়ে আছে বসে। ভাবছে, হারানো কথা। এক ফোঁটা মেয়ে বাড়িময় দুষ্টুমি

করে বেড়াত, সুবোধ আর তাকে অপদস্থ করবার জন্য কতরকম ছলাকলা, হরিদাস বকুনি দিলে হি-হি করে হেসে ফেটে পড়ত। বিচ্ছু মেয়ে বলত তারা পলিকে, ও-মেয়ের কান দুটো আচ্ছা করে মলে রাঙা করে দিলে তবে রাগ মেটে। কিন্তু গায়ে হাত ঠেকাবার জো ছিল না নিজের সহোদর ভাই সুবোধেরও। চেঁচিয়ে লাফিয়ে কান্নাকাটি করে পাড়াশুদ্ধ এমন জানান দেবে, যেন এক ভীষণ খুনখারাবি হয়ে গেছে। সেই পলি কত বড় হয়ে গেছে এখন। আর কি আশ্চর্য! মনের তলে অঙ্কুরের মতন ভালবাসা লালন করে আসছে এতকাল ধরে, ডালপালায় শতেক কুসুম ফুটিয়ে প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে কিছুই জানতে পারেনি। অন্য কেউ হ'লে নজরে পড়তো হয়তো, কিন্তু দুনিয়ার ক্ষণজন্মা মানুষগুলো ছাড়া কার দিকে তাকিয়ে দেখেছ ত্রিদিবনাথ? নিজেকে ছাড়া অন্য কারও কথা ভেবেছ কবে?

ঠিক দুপুরবেলা অস্নাত অভুক্ত ত্রিদিবনাথ এসে হরিদাসের পুরানো বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে।

কে রে?

নীলমণির গলা। নীলমণি বেঁচে আছে, দেওঘরে উৎপলার কাছে শুনেছিল। বিক্রমও অপ্রতিহত আছে, গলার ঝাঁঝে সেটা মালুম হচ্ছে—

যা-যা, ভিক্ষে-টিক্ষে আজ আর হবে না। সারা দিন ধরে এই চলুক, আর কোন কাজকর্ম নেই।...এইও—আবার জ্বালাতন করবি তো লাঠি নিয়ে বেরুব এবার।

আমি ত্রিদিবনাথ। ভিক্ষে চাইনে—দুয়োর খোল দিকি।

হাতড়ে হাতড়ে নীলমণি খিল খুলে দিল। তারপর পুঁথি পড়ার মতন ত্রিদিবের মুখের উপরে চোখ দুটো রেখে দেখবার চেষ্টা করে। আরও বুড়ো হয়ে পড়েছে নীলমণি—ভ্রূ অবধি সাদা। দৃষ্টি প্রায় গেছে—সামান্য ঝাপসা রকম দেখতে পায়। থাকার মধ্যে আছে

গলাখানি। তাই লাঠির ভয় দেখায়। লাঠি সত্যি সত্যি তুলে ধরতে গেলে বোধ করি সেই ভারে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়বে।

ত্রিদিব বলে, পলি বাড়ি আছে? ডেকে দাও একটুখানি—

নীলমণি চটে উঠল

সে নেমে আসবে—কেন, তুমি উঠে-যেতে পারছ না?

যাবো উপরে?

নীলমণি বলে, উপরে বাঘসিংহী বুঝি? ও-হো, পায়াভারি হয়েছে আজকাল তোমার বটে! তা আমি উপর-নিচে করতে পারবো না—গরজ থাকে, তুমি হাঁক পাড়ো এখান থেকে।

উৎপলা বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে। কলকণ্ঠে সেখান থেকে বলে, কি ভাগ্যি— কি ভাগ্যি!

ত্রিদিবের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বলে, খাওয়া-দাওয়া হয় নি তোমার?

সুধা চটে রয়েছে। খাবার চাইতে সাহস হল না তার কাছে গিয়ে। নাটের গুরু তুমি, তোমার চুরির দায়ে সে বেচারী অনর্থক বকুনি খেলো। তাই ভাবলাম, আড়াই পহর বেলায় তোমার বাড়ি অতিথি হয়ে জব্দ করে আসি। ওঃ, তোমার যে চাকরি আছে—অফিসে বেরুচ্ছ বুঝি?

উৎপলা আচ্ছন্ন ভাবে তাকিয়ে থাকে ক্ষণকাল।

বোসো ত্রিদিবদা। চুলোয় যাক চাকরি, উচ্ছন্নে যাকগে অফিস—

পাখা খুলে দিয়ে সহসা ত্রিদিবের হাত ধরে ফেলে বসাল পাখার নিচে। বলে, সরবৎ নিয়ে আসছি। এত বেলায় আর চান করে কাজ নেই। একটুখানি গড়াতে লাগো। চট করে আমি ওদিককার ব্যবস্থা সেরে আসছি।

সরবৎ দিয়ে ছুটে বেরুল। লঘুপক্ষ এক পাখী যেন। অনতিপরে আবার এসেছে।

ভাত চাপিয়ে দিয়ে এলাম ত্রিদিবদা। আধঘণ্টা লাগবে না—

ত্রিদিব বলে, রান্নার হাঙ্গামে কেন গেলে? এসেছি কয়েকটা কথা বলতে খাওয়াতে চাও, দোকানের দু-একটা মিষ্টি এনে দিলেই পারতে!

খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে যত খুশি কথা বোলো। তখন শুনব। নিজে হাতে তোমার রান্না করে খাওয়ানো, একে হাঙ্গামা বলছ! আমার কত কালের স্বপ্ন, এমনিধারা হাঙ্গামা পোহানো তোমার জন্য। এতখানি বয়স কাটিয়ে সেই ক্ষণ পেয়েছি আজকে ত্রিদিবদা।

ত্রিদিবও অভিভূত হয়ে পড়েছে। জোর করে সেই মনোভাব তাড়াতে চায়। বলে, আজকে হল কি পলি? সেই কতকগুলো কি বলে এলে। ঠাট্টা তো বটেই, কিন্তু ঠাট্টাচ্ছলেও মুখ দিয়ে এসব বেরুল কি করে?

ঠাট্টা? চলে যাচ্ছিল উৎপলা, ফিরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি তাকাল। পুরো একটা জন্ম ধরে কেউ ঠাট্টা করে না ত্রিদিবদা। অবাক হয়ে গেছ—তাই বটে! আমার সকল লজ্জা ভাসিয়ে দিয়েছি তোমার কাছে। বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই সংসারের মধ্যে। তাঁর ঐ অবস্থা—আমার কথাগুলো কে তবে বলে দেবে আমি ছাড়া?

ত্রিদিব বলে, বাইরের জৌলুস দেখে সকলে তোমরা তাজ্জব হয়ে যাও। সকলকে ঠকিয়ে বেড়াই। কিন্তু সত্যি বলছি—আমার মতন পাষণ্ড দুনিয়ায় দ্বিতীয় নেই। তুমি বড্ড ভালো পলি, তাই ভয় করছে। আমার সমস্ত কথা সকলের আগে তোমার জানা দরকার।

উৎপলা ব্যাকুল স্বরে বলে, না গো ত্রিদিবদা, না। অতীতের কবর খুঁড়ে লাভ নেই। তুমি চুপ করো।

নিষেধ মানে না ত্রিদিব। বলতে লাগল, একদিন নেশার ঘোরে বেরিয়েছিলাম ঘর থেকে। বড় হবো, হিমালয় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু হবে। পিছন ফিরে তাকাইনি। নিজেকেই শুধু ভালবেসেছি সংসারে।

সংসারও তার শোধ নিল—প্রেত্তিনী হয়ে তাড়া করেছিল পিছু পিছু। জলে ডুবে মরেছে প্রেতিনী—আমি বেঁচে গেছি।

উৎপলা তাড়া দিয়ে ওঠে, আঃ—কি হচ্ছে? বাবা পাশের ঘরে, ঘুম ভেঙে যাবে যে তার—

ত্রিদিবের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কেমন সব আবোল-তাবোল কথা। উৎপলার ভয় করছে। কাছে এসে সে তার হাত জড়িয়ে ধরল।

কোন কথা নয়—হাত রাখো তুমি আমার মাথায়। জীবনভোর তপস্যা করে আজকে আমি বর পেয়ে গেলাম।

পদশব্দে সচকিত হয়ে তাকায়। যে ভয় করছিল, তাই। হরিদাসের ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভেঙে কখন নিঃশব্দে দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

উৎপলা চেঁচিয়ে ওঠে, সর্বনাশ করেছ বাবা, চোখের ঢাকা একেবারে যে খুলে ফেলেছ!

অর্ধোন্মাদ হরিদাস হি-হি করে হাসতে লাগলেন, চোখ আমার সেরে গেছে। চোখের ব্যারাম ছিল রে সত্যই—মেয়ের বিয়ের জন্য কত হারামজাদার তোয়াজ করে বেড়িয়েছি, আমার ঘরের মানিক চোখে দেখতে পাইনি।

ত্রিদিব এগিয়ে এসে বলে, বসুন মেসোমশায়। ঢাকাটা ভাল করে লাগিয়ে দিই।

না রে না—

হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে হরিদাস বললেন, মতলব বুঝেছি। চোখ-ঢাকা কলুর বলদ করে রেখে যুগল-মিলন দেখতে দিবিনে। ও চালাকি আর শুনছিনে।

॥ তেরো ॥

যেতে হবে—পলি নিজে এত করে বলে গেছে, যেতেই হবে ত্বলালচাঁদের উৎসবে। স্থূলরুচির ঐ মানষগুলোকে সহ্য করা দায়। কানাকড়ির ক্ষমতা নেই—বাপ-পিতামহ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের জোরে সম্পত্তি করে গেছে, তাই ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। খাওয়া শুধু নয়—সর্বগুণাধার হয়ে দশের উপর মোড়লি করে বেড়ায়। বড় বড় অনুষ্ঠানে সভাপতি কিংবা প্রধান-অতিথি—নিদেন পক্ষে সভা-উদ্বোধনের জন্য ডাক পড়ে। সে উপস্থিত থাকলে খবরটা ফলাও করে চিত্র সহযোগে সুনিশ্চিত ছাপা হবে। একটা বিপদ—সভাস্থলে ত্ব-এক কথা বলতেও হয় কখনো-সখনো। সে যেন শ্রোতাদের জ্ঞান-বুদ্ধির মাথায় লাঠি মারা। নিতান্ত নির্বোধ ভদ্র বাঙালী বলেই লোকে বসে শোনে—বড় জোর বিড়ি খাওয়ার ছুতোয় বাইরে চলে যায় মাঝে মাঝে।

তাই দেরি করে গিয়েছে। বাজে ঝামেলাগুলো চুকে যাক। ত্বলালের সাঙ্গোপাঙ্গোগুলো সরে পড়ুক—ত্বলালকে সঙ্গে নিয়ে সরে পড়ে তো আরো ভালো। তার কাজ শুধু উৎপলার সঙ্গে। অন্য লোকের চোখ-কান এড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলে আসবে, ছোট্ট একটু ঘর খুঁজছিলাম, খ্যাতির দিকে পিঠ ফিরিয়ে যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারি। যেমন এক ঘর কতকাল আগে এক ভোরবেলা ছেড়ে এসে-ছিলাম। ঘর বাঁধার স্বপ্ন তুমি আবার মনে জাগিয়ে দিলে পলি। অখণ্ড তোমার পরমায়ু হোক—আমার মৃত্যুর পরেও আরো অনেক, অনেক বছর যেন বেঁচে থাক। মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকব সেই আমার চিরকালের চেষ্টা। বাঁচতে চাই সভাস্থলে হাততালি-পাওয়া গদগদ বক্তৃতাবলীর মধ্যে নয়, ইটপাথরের স্মৃতিসৌধে নয়—তুমি যদি দিনান্তে কাজকর্মের শেষে এক-আধ ফোঁটা চোখের জল ফেল আমার কথা ভেবে।

মনে এমনিতরো ভাবনা—প্রায় যে কবি হয়ে উঠলে ত্রিদিবনাথ! কবিত্বের আর এক নমুনা, শ্যামবাজারের মোড়ে গাড়ি থামিয়ে মস্ত এক গোড়ের মালা কিনে নিল। উৎপলার জন্মদিনে নিরিবিলি একটুকু খুঁজে নিয়ে, এই মালা তার গলায় পরিয়ে দেবে।

যা আন্দাজ করে এসেছে, ঠিক তাই। সমস্ত লন জুড়ে চৌকো চৌকো বিস্তর টেবিল—টেবিল ঘিরে তিনটে-চারটে করে চেয়ার। সাকুল্যে জন কুড়িক এখন—এখানে একটি ওখানে একটি—চা ইত্যাদি খাচ্ছে। বাকি সব চেয়ার খালি। উর্দিপরা খানসামারা প্লেট ধুয়ে ধুয়ে এক পাশে রাখছে। প্লেটের কাঁড়ি দেখে মালুম হচ্ছে—আয়োজন বিরাট, বিপুল জন-সমাগম হয়েছিল। উঃ, কি ফাঁড়াটাই কেটেছে বুদ্ধি করে এই দেরিতে আসার দরুন! যত মানুষ জুটেছিল, প্রতি জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ত দুলালচাঁদ—অন্যে রেহাই ছিল না। নমস্কার বিনিময় এবং সেকহ্যাণ্ড বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কথাবার্তার বিস্তর বাজে খরচ।

তা যেন হল। কিন্তু চেনা মানুষ একজন কেউ যে নেই এদিকে! উৎসব সেরে কর্তাব্যক্তি সবাই চলে গেছে নাকি নিজ নিজ কর্মে? পলিই বা কোথায়? ত্রিদিব তাকে কথা দিয়েছে—তার অন্তত থাকা উচিত। বিস্তীর্ণ বাগানের মাঝখানে বাংলো প্যাটার্নের একতলা পাকা বাড়ি। চতুর্দিকে ঘোরানো বারান্দা—গোল গোল থাম। কি করি না করি—ভাবতে ভাবতে বারান্দার উপর উঠে পড়ল। ঘরের ভিতরে হয়তো মানুষ আছে। খুব বিরক্তি লাগছে এখন—হোক না দেরি, তা বলে আদর-আপ্যায়নের জন্য একজন কেউ থাকবে না—এ কেমন কথা! বড়লোকি স্পর্ধা—এই জন্য এসব লোকের ছায়া মাড়াতে চায় না ত্রিদিব।

আছে বটে মানুষ—দশ-বারো বছুরে এক ছেলে ভিতর থেকে এসে বারাণ্ডা পেরিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডেকে তাকে জিজ্ঞাসা করবে—ডাকতে হল না, ছেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছে বারবার। মিষ্টি

চেহারা, বড় বড় চোখ। ত্রিদিব কাছে এগিয়ে গিয়ে সকৌতুকে বলে, কি দেখছ খোকা? চেনো আমায় তুমি?

হ্যাঁ, আপনি ডক্টর রায়—

'ডক্টর'—বেশ নিখুঁত উচ্চারণে বলছে। ভালো ইস্কুলে পড়ে নিশ্চয়, বেশবাসও পরিচ্ছন্ন। ইউরোপের নানান দেশে বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের দেখেছে। হিংসা হত, নিশ্বাস পড়ত নিজেদের কথা ভেবে। এ ছেলেটি কিন্তু হামেশাই যা দেখা যায়, সে দলের নয়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আনন্দস্মিত চেহারা।

কি করে জানলে বলো তো?

কাগজে ছবি উঠেছিল আপনার—

ভারি ভাল লাগে। এইটুকু ছেলে কত খবর রাখে, দেখ। ত্রিদিব হাত ধরে তাকে বসাল একটা সোফার উপর, নিজে পাশে বসল।

বলো দিকি, কি করি আমি—

খুব বড় বৈজ্ঞানিক আপনি। অনেক গবেষণা করেছেন, অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, জগৎ-জোড়া নাম। বিজ্ঞানের ব্যাপার এখন আমি বুঝিনে, বড় হলে সব জানতে পারব।

তারপর চঞ্চল হয়ে ওঠে, এখন আমি যাই—

ত্রিদিব হেসে বলে, সে কি কথা। এত বড় একজনের দেখা পেয়ে গেলে। ডক্টর রায়ের সঙ্গে দুটো-পাঁচটা কথা বলে যাবে না?

গিয়ে পড়তে বসব। দেরি হয়ে গেলে হস্টেলে বকবে। আমার দেরি হয় না, কোনদিন আমি বকুনি খাইনি।

বেশ, বেশ। কোন হস্টেলে থাকো তুমি?

সার্কুলার রোডের কাছাকাছি একটা হস্টেলের নাম করল—মিশনারিদের নাম-করা হস্টেল। ত্রিদিব সবিস্ময়ে বলে, অদ্দূর একা একা যেতে পারবে?

কেন পারব না?

ভয় করবে না?

ভয়—ভয় আবার কিসের ? বড়-রাস্তায় গিয়ে বাসে উঠব। বাস থেকে নেমে তারপর হেঁটে চলে যাবো এটুকু পথ।

কথাবার্তায় ত্রিদিবের আমোদ লাগে। ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না, গল্পে গল্পে দেরি করিয়ে দিচ্ছে।

ওরে বাসরে! ভীষণ বীর তবে তো তুমি! আচ্ছা, বাস না হয়ে জাহাজ হয় যদি! ধরো, জাহাজে করে সমুদ্দুরের উপর দিয়ে যাচ্ছ একা একা। তা হলে ভয় করবে না ?

উল্লাসে ছেলেটার মুখ ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

সে তো আরো ভালো! বইয়ে নানান দেশের কথা পড়ি—বড্ড ইচ্ছে করে আপনার মতন দেশ বিদেশ দেখে বেড়াতে। সমুদ্দুরের উপর দিয়ে জাহাজ ভেসে ভেসে যাচ্ছে—মজা লাগে—নয় ? যেদিকে তাকাই, কূলকিনারা নেই। একটানা চলেছে নীল জল—

ঝড়ের সময় যখন পাহাড়ের মতন বড় বড় ঢেউ উঠবে ? ছোট ছেলে তবু ভয় পায় না। বলে, বেশ নাগরদোলার মতন দুলবে জাহাজ। এক ছবিতে দেখেছিলাম জাহাজ ঝড়ে ডুবে যাচ্ছে। রবিনসন ক্রুশোর অমনি জাহাজডুবি হয়েছিল, ভাসতে ভাসতে শেষে অজানা দ্বীপে গিয়ে উঠল। কী মজা!

ত্রিদিব বলে, খুব গল্প পড়ো তুমি ?

গল্প আমার বড্ড ভাল লাগে। নাবিকদের গল্প, দৈত্যদানো-ভূতপ্রেতের গল্প, বাঘ-শিকারের গল্প—

কথার তুবড়ি ছেলেটা। ঘাড় দুলিয়ে, চোখ বড় বড় করে, কেমন সুন্দর কথা বলছে। জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাঘ দেখেছেন ?

দেখেছি চিড়িয়াখানায়।

সে আমি কত দেখেছি। সে কথা হচ্ছে না, এত জায়গায় বেড়ালেন—জঙ্গলের বাঘ দেখেননি ?

জঙ্গলে যাইনি তো আমি, খালি শহরে শহরে ঘুরেছি। অবশ্য শহরকেও জঙ্গল বলতে পারো এক হিসেবে। যে-সব মানুষ থাকে,

তারা বাঘের মতন নখ-দাঁত মেলে তক্কে তক্কে বেড়ায় শিকার ধরবার আশায়।

এ সব ফাঁকি কথায় ছেলেটা উৎসাহ বোধ করে না। আবার বলে, ভূত দেখেছেন?

জমাতেই হবে এবারটা—অতএব দ্বিধাহীন ভাবে ঘাড় নেড়ে ত্রিদিব বলে, হ্যাঁ—

কোথায়?

ত্রিদিব চট করে মনে মনে গল্প বানিয়ে ফেলে।

আমিই তো ভূত একটা। জিব্রাল্টার কাছ দিয়ে যাচ্ছি। সে কি ঝড়-জল!

তারপর?

জাহাজ ডুবে গেল সাগরের জলে। যেমন তুমি ছবিতে দেখেছ।

আপনি তখন কি করলেন?

হেসে ত্রিদিব বলে, আমি মরে গেলাম। ইচ্ছে ছিল না, কি করব আর তখন? মরে ভূত হয়ে বেড়াচ্ছি সকলের মধ্যে।

গলা নামিয়ে বলে, কাউকে বোলো না একথা—খবরদার! ভূতের বড় কষ্ট—আকাশে ভেসে ভেসে বেড়ায়—মাটির নাগাল পায় না, পা ছোঁয় না মাটির উপর।

ছেলেটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, এই তো মাটিতে পা। তবে ভূত হলেন কি করে?

ওটা লোক-দেখানো। অন্তত চুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে মাটির সঙ্গে। ঘর-বাড়ি নেই, আপনজন একজন কেউ নেই গোটা পৃথিবীর মধ্যে। তবে পুনর্জন্ম হয় কখনো কখনো ভূতের। আমিও চেষ্টায় আছি।

টং করে একবার দেয়াল-ঘড়ি বাজল। সাড়ে-ছ'টা। ছেলেটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

ওরে বাবা! দেরি হয়ে গেছে, আমি চললাম—

আরে কি করছে আবার দেখ। দু-হাত জোড় করে দিব্যি বুড়ো মানুষের ভঙ্গিতে নমস্কার করে বেরিয়ে যায়। ত্রিদিবের ছুটে গিয়ে কোলে তুলতে ইচ্ছে করে। ফুড়ুত করে পাখির মতন উড়ে বেরিয়ে ততক্ষণে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

ছেলেটা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল—অতএব, ভিতরে নিশ্চিত মানুষ আছে। ঢুকে পড়ল ত্রিদিব। দু-দিকে খোপ-খোপ—মাঝখান দিয়ে পথ, দরদালানও বলা চলে। আশ্চর্য, জনমানবের চিহ্ন নেই! ভূতের কথা হচ্ছিল ছেলেটার সঙ্গে—সেই ভূতের বাড়ি যেন। ব্যাপারও তাই। দুলালচাঁদ দাঁও মেরে এই বাড়ি কিনেছে—বাজার-দর যা হওয়া উচিত, তার অর্ধেকেরও কম। লোক পেলেই দুলাল জাঁক করে বাড়ি কেনার বাহাদুরি শোনায়। সেই একদিন দেওঘরে দেখা হয়েছিল, তখনই সবিস্তারে বলা হয়ে গেছে; কলকাতায় গিয়ে, ডক্টর ঘোষ, একদিন গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসব আমার বাগানবাড়িতে। কী এলাহি ব্যাপার, দেখতে পাবেন। তিনটে প্রাণী নাকি খুনোখুনি করে মরেছিল ওখানে—বড় ছেলে, তার এক বন্ধু, আর একটা মেয়ে। বুড়োকর্তা তাই পণ করে বসলেন, টাকা দিয়ে কেউ না কিনতে চায় তো মাগনা বিলিয়ে দেবো। সেই সময়টা দুলাল গিয়ে পড়ে। কিনেছেও একরকম মাংনা বলতে হবে।

ভর-সন্ধ্যেবেলা ঘরগুলো পেরিয়ে যেতে গা ছমছম করে। হা-হা করছে—গিলে খাবার তরে হাঁ করে আছে যেন। ছেলেটা তবে যে ঘরের দিক থেকে বেরিয়ে এলো—দালান শেষ হয়ে আবার তো বাগান পড়বে, সেইখানে তবে আছে কেউ না কেউ।

দালানের প্রান্তে খাটের উপর বসে—মানুষই তো। স্ত্রী-মূর্তি। আলো জ্বলেনি—আঁধার ঘন হয়ে জমেছে ঘরের মধ্যে। বাইরের দিকে মুখ করে চেয়ে আছে—আবার কে? উৎপলা। উৎপলা রাগ করে ঐ ভাবে বসে আছে তার দেরি করে আসার জন্য। উৎসব-অন্তে

সে-ই শুধু আটকা পড়ে আছে, ক্লান্তিময় একটি মধুর ভঙ্গিমায় এলিয়ে আছে খাটের উপর। রাগ হয়েছে—আহা, চোখে জল এসেছে হয়তো বা।

পলি!

চমকে উঠে সেই মেয়ে মুখ ফেরাল। চোখাচোখি। ত্রিদিবের সর্বদেহ থরথর করে কাঁপছে। মাটিতে পড়ে যেত নিশ্চয়—একটা চেয়ার পেয়ে তার উপর ধপ করে বসে পড়ল।

ক্ষণপরে সম্বিত ফিরে এলে ডাক দেয়, ঝুমা!

ঝুমা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলে, চুপ চুপ! গাঙের জলে ডুবে মরেছি আমি।

ত্রিদিব বলে, তাই তো জানি। কাগজে বেরিয়েছে—দেশসুদ্ধ সকলে জানে। মরার পরে ভূতুড়ে এই বাগানবাড়ি এসেছ।

নেমন্তন্নে এসেছি, এসে দেখছি সমস্ত ফাঁকা।—

জ্যান্ত-মরা সকলকে এরা নেমন্তন্ন করেছে?

একটু আগে ত্রিদিব মরে যাওয়ার গল্প বলছিল ছেলেটার সঙ্গে। হয়তো স্বপ্ন দেখছে—সেই গল্পই স্বপ্ন হয়ে এসেছে।

বলে, মৃত্যুলোকে আজকাল পুল বানানো হয়েছে নাকি—ইচ্ছে মতো এপার-ওপার করতে পারো?

ঝুমা বলে, মরে গেছে সেকালের ঝুমা আর মাধবীলতা। কাটছাঁট হয়ে লতাটুকু রয়ে গেছে শুধু। আমি লতা এখন—লতিকা দেবী।

আর সেই এতটুকু মুকুলবাবু? ঝোড়ো রাতের অন্ধকারে দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে মায়ের কোলে উঠে মুকুলবাবু চলে গেল—সে ছবি ভোলা যায় না। দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়িয়েছি—অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, মুকুল যেন অন্ধকারে হাসছে তেমনিভাবে। কত বড় হয়েছে ছেলে আজ?

ঝুমা বলে, এসেছিল সে এখানে, আমারই সঙ্গে ছিল। রাত হয়ে যাচ্ছে বলে হস্টেলে চলে গেল।

বলতে বলতে অপরূপ হাসি ফুটে উঠল মুখের উপর। বলে, মা হয়ে বলতে নেই—বাড়বাড়ন্ত হয়েছে একটুখানি। আর-একটু আগে হলে দেখা হয়ে যেতো—

ত্রিদিব সোল্লাসে বলে, আমি দেখেছি। কথার জাহাজ সেই ক্ষুদে ভদ্রলোকটি তবে মুকুলবাবু? দিব্যি ভারিক্কি হয়ে উঠেছেন। আর কি আশ্চর্য, দেশে দেশে ঘোরবার বিষম শখ—ঐ বয়সে আমার অমনি ছিল।

সেই তো বড় ভয়—

ভয় আমারও হচ্ছে। বাপের মতন না হয়ে যায়। ডক্টর ঘোষের আড্ডিনাড়ির খবর সে জানে, কেবল বাপকে চেনে না।

ঝুমা গম্ভীর হল—সেই দুর্যোগরাত্রির ঝুমা।

না, বাপের পরিচয় দেওয়া হয়নি। নামটা শুনেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ডক্টর ঘোষ আর সেই মানুষ এক তো নয়! হবে কি করে?

কেন?

একজনকে জগৎসুদ্ধ মানুষ শ্রদ্ধা করে। আর একজন—থাকগে, আমার মুখ থেকে না-ই শুনলে।

মুখ কালো করে ত্রিদিব ঝুমার কথাটা শেষ করে।

সকলে ঘৃণা করে সেইজনকে। নিজের ছেলেও করবে জানতে পারলে।

বুঝতে পারলাম। আশা করি, মায়ের ইতিহাসের কিছু বলোনি। বাপ-মা দু'জনকেই ঘৃণা করে ঐটুকু ছেলে বাঁচবে কেমন করে?

মনের অন্ধকারে পেঁচানো কালসাপটা ফণা তুলে এতক্ষণ দুলছিল এদিক-ওদিক; হঠাৎ ছোবল দিয়ে বসল—

মাধবীলতা দেবী তো মরেছে। শ্রীল শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ মিত্র—তাঁর কি অবস্থা?

ঝুমা বলে, দু-দুটো খুনের চার্জ মাথার উপর—অবস্থার ইতরবিশেষ

হতে পারে? ফাঁসিতে না-ই যদি ঝুলোয়, চিরজীবনের কারাবাস। প্রতিহিংসার বড় সুযোগ কিন্তু, দেখ না চেষ্টা করে—

কিন্তু জমল না ঝগড়া—ত্রিদিবই ভেঙে পড়ে। মুকুল এত বড়টি হয়েছে, পাশে বসে এতক্ষণ ধরে কত বকবক করল তার সঙ্গে। ভূতের কথা হচ্ছিল, সে যেন সত্যি সত্যি তাই। ছেলের ঠিক পাশটিতে বসে ও হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে তোলবার উপায় নেই। পিতৃ-পরিচয় পেলে হাত-পা ছুঁড়ে আঁচড়ে-কামড়ে মাটিতে নেমে পড়বে—সেই ছেলে-বয়সের এক ফোঁটা মুকুল এক একদিন যেমন করত।

অবিচার করেছ আমার উপরে ঝুমা, সকলে ভুল জেনে বসে আছে। যা শুনেছ, একেবারে মিথ্যে—

ঝুমা চকিতে তাকাল ত্রিদিবের দিকে। বিশ্ব-বিজয় করে এসেছে, সেই মানুষের উদ্ধত কণ্ঠ নয়—কঠিন বিচারকের কাছে এক জন সর্বরিক্ত যেন আকুতি জানাচ্ছে।

নিরুত্তাপ স্বরে ঝুমা বলল, অন্য লোকের রটনা তো নয়—তুমি নিজেই কত জায়গায় জাঁক করে বলেছ।

আমি মিথ্যেবাদী। বানিয়ে বানিয়ে বলেছি—

মিথ্যে বানালে নিজের চরিত্র সম্বন্ধে?

চুক্তি যে তাই। লোকে বাসনকোসন আংটি-ঘড়ি বিক্রি করে, জমাজমি ঘরবাড়ি বিক্রি করে। অভাবের ভিতর আমারও যা-কিছু ছিল সমস্ত বিক্রি হয়ে গেল, তারপরে সুনামটা বেচে দিলাম। মোটা দামও পেয়েছি। এমন সজ্জন খদ্দেরকে ঠকানো যায় না—ঠকাইনি আমি। একটা দলিল দৈবাৎ রয়ে গেছে। সেই দলিল তোমাদের নাকের উপর ধরে এক লহমায় সমস্ত কুৎসা নস্যাৎ করে দিতে পারি।

ঝুমাও কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

একথা আর এক দিন বলোনি কেন?

বলবার সময় দিলে কখন? ঝড়-জলের মধ্যে ছুটে বেরুলে—কোলে আড়াই বছরের ছেলে। নিজের যা হয় হোক, ছেলের

কথাও ভাবলে না একবার! এমন পাষাণী মা কেমন করে হয়, জানিনে।

কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। একটু পরে সামলে নিয়ে বলে, সে যাকগে। বিশ্বাস না করতে পারো, কাজ নেই। কিন্তু বাপের জন্য ছেলে দুঃখ পাবে, চিরজীবন যে মাথা হেঁট করে বেড়াবে, এটা না হয়। ছেলেকে চাই আমি, তাকে কাছে আসতে দিও। ছেলের কাছে আমায় ছোটো কোরো না, দোহাই তোমাদের—

আর পারে না ঝুমা। সজল চোখে বলল, আমিও যে চাই সমস্ত। স্বামী চাই, সংসার চাই—একা-একা আর পারিনে। ঝড়ের মধ্যে কেন বেরুতে দিলে সেদিন? দোষ তোমারই—দুয়োর বন্ধ করে আটকালে না কেন আমায়?

এত বছরের জমানো কথা—কিন্তু উৎসমুখ পাষাণে কে আটকে দিয়েছে! হঠাৎ নজর পড়ল, ত্রিদিব যে মালা এনে রেখে দিয়েছে।

মালা কার?

তুমি যদি পরো—

পুরানো ঝুমা আর নেই—ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো তবে তো সে ছিটকে পড়ত। মালা গলায় পরিয়ে দিল ত্রিদিব। আরে আরে—এ কি! ঝুমা প্রণাম করে তার পায়ের গোড়ায়।

ঝোড়ো রাতের সেই ঝুমা মরে গেছে তবে সত্যিই!

জংবাহাদুরের গলা।

অন্ধকারে কারা গো?

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে চোখ বড় বড় করে ভুজঙ্গ চেয়ে রইলেন।

কখন এসেছ ত্রিদিব-ভায়া? একটু জানতে পারিনি। বিষম কাণ্ড হয়ে গেল—আমাদের বাবু আর উৎপলার মধ্যে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। মেয়েটা অতি নচ্ছার—ফরফর করে বেরিয়ে গেল। তারপরে বাবুও গেলেন। শিবহীন যজ্ঞ!

ঝুমা সরে বসেছিল। কাছে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ঠাহর করে দেখে বললেন, মা লক্ষ্মীকে যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে। মনে পড়েছে—মাধবীলতা যে! বেঁচেবর্তে আছ তা হলে? মিল-টিলও হয়ে গেছে—বেশ বেশ, সুখে থাকো, পাকা চুলে সিঁদুর পরো। শঙ্করের সঙ্গে সরে পড়লে মা-জননী, সবাই নিন্দে-মন্দ রটাতে লাগল। আমি বলি—এ কিচ্ছু না—বয়সকালের ছুটোছুটি, আঁব-দুধ আবার মিলেমিশে যাবে দেখো। হল তাই—

॥ চৌদ্দ ॥

জংবাহাদুর রাহুর মতো হঠাৎ এসে জীবনের পরম ক্ষণটুকু কালিমাময় করে দিয়ে গেলেন। ত্রিদিব বেরিয়ে গেছে, একা ঝুমা কাঠ হয়ে বসে ভাবছে আকাশ-পাতাল। পুরানো খবর লোকটা প্রায় সমস্ত জানে। তার নজরে পড়ে গেছে যখন, লতিকা দেবীর পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠল। ত্রিদিব ঘোষ নামজাদা লোক—তার পারিবারিক কুৎসা, জংবাহাদুরের অধ্যবসায়ে, জানতে বাকি থাকবে কারো? আর নয় লতিকা, বাইরের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে চলো সংসারের অন্দরে। ত্রিদিব ফুলের মালা পরিয়ে ঝুমা-ঝুমি, ঝুমঝুমিকে অভিষেক করল। জংবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হওয়া নিয়তির ইঙ্গিতও বোধহয় তাই।

তবু সেই নির্জন ভূতের বাড়িতে একা বসে আছে উৎপলার আশায়। দুলালের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে গেছে—রাগ কমলে নিশ্চয়ই কাণ্ডজ্ঞান হবে, তার খাতিরে যারা নিমন্ত্রণে এসেছে তাদের খোঁজ-খবর নিতে আসবে।

অনেক বসে বসে তারপরে এক সময় ঝুমা উঠে পড়ল। আহা, ঝুমা কেন—লতিকা। যাচ্ছে উৎপলার বাড়ি—লতিকা ছাড়া কি? ঝুমা নামে কে চেনে তাকে এই রাজ্যে?

বাড়ি ঢুকবার সময় শোনে, ঘর ফাটিয়ে উৎপলা গান ধরেছে। কি মেয়ে—মনিবের সঙ্গে ঝগড়া করে আজকেই চাকরিটা খোয়ালো, মনে তার একটু আঁচড় কাটেনি। এক গাদা মানুষকে আহ্বান করে এনে নিজে সরে পড়া—এরই পক্ষে সম্ভব বটে!

হরিদাস নিচে। লতিকাকে বলেন বড় মেয়ে। আদর করে ডাকলেন, আয় রে—এত রাতে কি মনে করে? খবরবাদ ভাল তো মা?

কে বলবে, মাথার দোষ হরিদাসের! অন্যদিন কথাবার্তার মধ্যে একটু-আধটু তবু মনে হতে পারে, আজকে পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ। লতিকা বলে, শুনলাম কি ঝগড়াঝাটি করে উৎপলা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

এক গাল হেসে হরিদাস বললেন, বেশ করেছে। বিয়ের পরে সংসার করবে না অফিস করবে? দু' নৌকোয় যারা পা দেয়, পাঁকের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় তারা—কিছুই পায় না জীবনে। আজকাল বিস্তর মধ্যবিত্ত সংসারে যেমন দেখা যাচ্ছে।

লতিকা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বলে, বিয়ে হচ্ছে উৎপলার?

হয়ে না গেলে বিশ্বাস নেই মা। মত ঘুরতে ও-মেয়ের কতক্ষণ? তুমি উপরে যাও মা—আরো বেশ স্ফূর্তি দিয়ে এসো—

সে কি আর বলে দিতে হবে লতিকাকে! দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে সে উপরে উঠল। গান বন্ধ করে উৎপলা হাসছে।

লতিকা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, প্রণাম করো। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ —ছি ছি, কী মেয়ে তুমি! বরানগর থেকে আসছি—পায়ে বিস্তর ধুলো, পদধূলির অভাব হবে না।

উৎপলা বলে, কানে গেছে এর মধ্যে? তা-ও তো বটে! নিচে হয়ে এলে—সেখানে বাবা রয়েছেন। পায়ের জোর থাকলে বাবা খবরটা এতক্ষণে ত্রিভুবনে চাউর করে দিয়ে আসতেন।

লতিকা বলে, কত আনন্দ হয়েছে বুঝে দেখ তবে! ঐ যে মাথা

খারাপ—তুমি অনেকখানি দায়ী তার জন্যে। এতদিনে সুবুদ্ধি হল—দেখো, কত শিগগির উনি ভাল হয়ে যাবেন। এখনই হয়েছেন—কী সুন্দর আজ কথাবার্তা বললেন, আমি অবাক হয়ে গেছি।

উৎপলা প্রশ্ন করে, খবরটা কি শুনে এখানে এসেছ, না এখানে এসে শুনলে?

আমি শুনেছিলাম আর এক খবর। দুলালচাঁদ বাবুর সঙ্গে খুব নাকি ঝগড়াঝাটি করেছ? কি ব্যাপার?

উৎপলা হাসে, জবাব দেয় না।

এমন খাসা চাকরিটাও নাকি ছেড়েছ—বলো না, কি হয়েছে?

উৎপলা বলে, কাব্য করে বলছি দিদি। দেবতার নৈবেদ্যে হনুমান মুখ দিতে চায়। তাই মুখ পুড়িয়ে একটু শিক্ষা দিয়ে দিলাম।

ফিক করে হেসে বলে, হাতে-নাতে নয় অবিশ্যি—অতদূর করিনি। শুধু মুখের কথায়—দশের মাঝে অপমান করে।

লতিকা কঠিন হয়ে বলে, সব জায়গায় এই গতিক রে বোন। ষোল আনা কাজ পেয়ে খুশি নয় ওরা—তারও উপরে চায়। আর তা পেয়েও যায় সহজে, পেয়ে পেয়ে লোভ বেড়েছে। সেকালের সমাজ আর জীবনরীতি ভেঙে গিয়ে মেয়েদের ইজ্জতের ওরা কানাকড়ি দাম দিতে চায় না।

উৎপলা বলে, আমার বেলা এই একটু মান দিয়েছে—বিয়ে করতে চায়। বুকে হাত রেখে শুকনো মুখে ফোঁস-ফোঁস করে এমন নিশ্বাস ছাড়ে যে হাসি চাপতে পারিনি। হাসি দেখে ক্ষেপে গেল।

লতিকা বলে, হনুমান তো ঢের ঢের দেখিয়েছ। দেবতাটি দেখতে পাচ্ছি কবে?

দেখাব বই কি দিদি। এত বড় সংসারে দুই আমার আপন লোক—বাবা আর তুমি।

বলছে আর উল্লাসের ঝিলিক ফুটছে চোখে-মুখে। বলে, দেবতাই বটে! কতকাল ধরে—ছোট্ট বয়স থেকে কামনা করে আসছি।

প্রায় বুড়ি হয়ে গিয়ে তপস্যার বর পেলাম। হঠাৎ একদিন তোমার কাছে জোড়ে গিয়ে দাঁড়াব, তখন দেখো।

লতিকা মুগ্ধ চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে। গভীর কণ্ঠে বলে, সর্বসুখী হও বোন। আজকের এই হাসি কোনদিন না মোছে যেন মুখ থেকে।

উৎপলার আনন্দ লতিকারও অন্তর ছুঁয়ে যায়। নিজের কথা এই পরম-আপন মেয়েটাকে না বলে পারে না।

শোন তবে। তুমি একা নও—বর পেয়ে গেছি আমিও।

বলো কি ?

লতিকার স্বামী নিরুদ্দেশ—এই জানত উৎপলারা। স্বামী ফিরে এসেছে—আনন্দ ষোলকলায় পরিপূর্ণ হল। ধরণীর কোনখানে আজ বুঝি দুঃখ-বেদনা নেই, আনন্দের প্লাবনে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

উৎপলা বলে, বর দেখাবে কবে ?

আগে তোমার বর—

না, তোমার বর পুরানো। তোমারটি আগে—

অবশেষে রফানিষ্পত্তি হল, দুই বরকে দাঁড় করানো হবে মুখোমুখি। এক সঙ্গে সকলের আলাপ-পরিচয় হবে।

পরদিন সকালে শেখরনাথ ত্রিদিবের বাসায় এল। আর কখনো আসেনি এখানে—আগেকার দিনে ভাবতেই পারা যেত না কষ্ট করে আসবে সে এতদূর। সত্যিই কষ্ট হয়েছে বাসা খুঁজে বের করতে। বলে, এমন জায়গায় থাক, আমার ধারণা ছিল না। নতুন নতুন রাস্তা —মোটর থেকে নেমে কতবার কতজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে এসে পৌঁছেছি।

ত্রিদিব বলে, আসবার কি এমন দরকার ? কথাবার্তা তো ফোনেই হতে পারত।

তা হলে আসতে যাব কেন। অন্দরের দিকে দৃষ্টি হেনে বলে, এ জায়গায় আসা আমার পক্ষে সহজ নয়, তা-ও জান তুমি। তোমায় নিয়ে এক্ষুণি পালাব। টেলিফোনে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে দিতে—জানি তোমায়। কিন্তু তা হবে না—আজকে এ-বেলাটা খাটতে হবে আমার সঙ্গে। বিষম জরুরি!

একরকম টেনে-হিঁচড়ে ত্রিদিবকে মোটরে পুরল। পোশাক বদলানোর সময় দেয় না। এমন উপকারী বন্ধুকে একটু চা খাওয়াবে, তারও ফুরসত দিল না। ত্রিদিব মনে মনে আরাম পায়। সুধা ভালো চোখে দেখে না শেখরকে—দেখবারও কথা নয়। অন্তদিন এতক্ষণে সে কতবার ত্রিদিবের ঘরে আনাগোনা করে, আজকে একেবারে ডুব দিয়েছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে নিশ্চয় দেখেছে শেখরনাথকে—দেখে যেন অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে।

শেখরের বৈঠকখানায় গালিচার উপর ত্রিদিবকে নিয়ে বসাল। মঞ্জুলার দেয়াল-জোড়া ছবি। সোনালি ফ্রেম ঝকমক করছে, নতুন করে তেলরঙ বুলিয়েছে ছবিতে—ফ্রেমের ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে মঞ্জুলা। মঞ্জুলার মৃত্যুর পর এ-ঘর থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিদেহী পুণ্যবতীর দৃষ্টির সামনে সঙ্কোচ হয় বুঝি সোফা-কৌচে গা এলিয়ে আরাম করে বসতে।

শেখরনাথ এক গাদা কাগজপত্র বের করে আনল। কি বিপুল সংগ্রহ! দেশে দেশে জ্ঞানীগুণীরা ভেবে ভেবে বের করছেন মানুষ গড়ে তোলার নতুন নতুন পদ্ধতি। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা জানতে চায়, বুঝতে চায়, অল্পদিনের চেনা তাদের এই ধরিত্রীকে। এর জন্য অসীম আগ্রহ তাদের। এই তালে তাল দিয়ে চলবে নতুন কালের শিক্ষা-ব্যবস্থা। যত না পড়াশুনো, দেখাশুনো অনেক বেশি তার চেয়ে। শিক্ষা-ব্যাপারটা ভয়াবহ নয়—আনন্দের হয়ে উঠবে খেলাধুলোর মতন। বেকার হয়ে অকর্মণ্য দিন কাটাতে হবে না কারও পরজীবনে—প্রতিটি মানুষ প্রয়োজনীয় সমাজের পক্ষে, ফালতু কেউ নয়। সকলে কাজ

পাবে, আর পাবে জীবনের শান্তি ও আনন্দ। শিক্ষানীতি এমনিভাবে সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ করে তুলতে হবে গোড়া থেকেই।

কত ভেবেছে শেখরনাথ, শিশুদের পড়াশুনো নিয়ে নিজেই বা পড়েছে কত! আলোচনার মাঝে হঠাৎ ত্রিদিব স্তব্ধ হয়ে যায় এক সময়, তাকিয়ে থাকে শেখরনাথের দিকে। তাকে নতুন চোখে দেখছে। একেবারে আলাদা এক মানুষ—নিরীহ, নিরহঙ্কার—তপস্বীর মতো অহরহ তার কল্পনার এই জগৎ নিয়ে আছে।

সমস্ত কিন্তু ঐ একটা নারীকে ঘিরে—ছবির মধ্য দিয়ে সহাস্য মুখে যে তাদের দেখছে। মঞ্জুলা বেঁচে থাকতে ছোটখাট এক সাধারণ ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। তার নাম এখন মঞ্জু-বিদ্যায়তন। নামের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের খাঁচও আগাগোড়া পালটে গেছে। শেখর চিরকাল ভাবপ্রবণ—সকল বস্তু একটু রঙিন হয়ে তার কাছে দেখা দেয়। যা বলে—অন্য লোকের কানে অতিশয়োক্তি বলে ঠেকে, তার কাছে কিন্তু পরম সত্য। তবু ইস্কুলের যে অভিনব পরিকল্পনার কথা বলছে, তার আধাআধিও ঘটলে তাজ্জব হবার ব্যাপারই বটে!

মনের বিস্ময় ত্রিদিব একসময় মুখে বলে ফেলে, মঞ্জুলা দেবী মারা যাবার পর তুমি একেবারে বদলে গেছ শেখর—

ব্যথিত দৃষ্টি তুলে শেখর বলে, মঞ্জু মরে নি তো!

সে কি?

তোমরা বিশ্বাস করবে না। অনুভূতির যে আশ্চর্য জগৎ, বিজ্ঞান সেখানে মাথা গলাতে পারে না। এই আমরা কথাবার্তা বলছি, কাজ করছি—সে-জগতও ঠিক এমনি সত্য। বিশ্বাস কর ভাই, একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না তোমাকে। মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে চলে যাই সেখানে। সামনে বসে থেকেও তখন তোমরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাও। ডুবুরি সাগরে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা খোঁজে, আমারও হয়েছে তাই। কাজকর্ম চুকিয়ে ভুস করে আবার ভেসে উঠি, দশজনের একজন হই।

হবেও বা। শেখরের মুখ-চোখ দেখে অবিশ্বাস করা শক্ত। এই তো—কথা বলতে বলতে হঠাৎ ছবির দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে যায়। মনে মনে যেন জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছে, বলবার মুখে ভুল হয়ে যাচ্ছে কিনা কোথাও। জেনে বুঝে নেয় ছবির কাছ থেকে। গোড়ায় খুব এক তাচ্ছিল্য ছিল ত্রিদিবের মনে—তারপরে সে অবাক হয়ে যাচ্ছে। এমন করে সমস্ত দিক দিয়ে ভেবে রেখেছে, বলছে এমন ভাবে—আবাল্য জানা-চেনা শেখরনাথ যেন এ নয়, কোন অতি-মানবিক শক্তি ভর করেছে তার মধ্যে। ছবি যেন সত্যি সত্যি বলে দিচ্ছে তাকে নিঃশব্দ ভাষায়।

ফোঁস করে সে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বলল, তোমাদের ধারণায় আসবে না, কিন্তু আমার কাছে মঞ্জু তেমনি জীবন্ত। সে এসে বসে আমার কাছে, কথা বলে, যুক্তি-পরামর্শ দেয়। আমি কখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নে, চলে গেছে সে আমাদের ছেড়ে।

কচি গলার মিষ্টি হাসি এল ভেসে। সিঁড়ি দিয়ে নামছে তারা। শেখর ডাক দেয়, অঞ্জু, রঞ্জু, বৈঠকখানা হয়ে যেও তোমরা।

ত্রিদিব বলে, অঞ্জু রঞ্জু—মায়ের নামের সঙ্গে মিল করে ছেলে-মেয়ের নাম রেখেছ দেখছি।

পুরো নাম হল অঞ্জনা আর রঞ্জন। ছবির দিকে দেখিয়ে বলে, নাম ওরই রাখা। সেই যা বললাম—মঞ্জুকে আমি সব সময় কাছে কাছে পাই। পায় না ছেলেমেয়ে দুটো। বড় দুর্ভাগা ওরা, মায়ের আদরযত্নে বঞ্চিত হয়ে আছে—সংসারে আর কি পাচ্ছে তবে বল।

ছেলেমেয়ে ঘরে এল। ছেলে ছোট, মেয়েটা বড়। দুর্ভাগা হোক, যা-ই হোক—চেহারায় কিন্তু মালুম হয় না। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অতি সুন্দর চেহারা।

শেখরনাথ বলে, ইনি জ্যেঠামশায় হন তোমাদের। মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক। এক সরকারি কাজ নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

অঞ্জু-রঞ্জু গড় হয়ে প্রণাম করল। কিছু বলতে হল না। বড়-লোকের বাড়ির ছেলেপুলে, কিন্তু শহবৎ শিখিয়েছে ভালো।

সঙ্গে অতুল নামে সেই সেক্রেটারি ভদ্রলোক। অতুলের চুলে পাক ধরেছে। কাজ এখন আরও বিস্তর বেড়েছে দেখা যাচ্ছে। শেখরের বাইরের কাজ শুধু নয়, ছেলেমেয়ের দায়ও অনেকটা বর্তেছে তাঁর উপর।

শেখর প্রশ্ন করে, সাজিয়েগুজিয়ে কোথায় নিয়ে চললে অতুল?

অতুল কিছু না বলতেই নাচের মতন এক পাক দিয়ে বাপের দিকে ফিরে অঞ্জু বলে, নেমন্তন্নে যাচ্ছি বাবা। মাসিমা নেমন্তন্ন করেছেন আমাকে আর রঞ্জুকে।

কৌতুকস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে শেখর বলে, আমাকে নয়?

অঞ্জু অতুলের দিকে চেয়ে বলে, বাবার নেমন্তন্ন হয় নি—না কাকাবাবু? মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করব,—বাবাকে বাদ দিল কেন?

শেখরনাথ হেসে উঠে বলে, না অঞ্জু, খবরদার ওসব বলতে নেই। তোমাদের ভালবাসেন, তাই নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, ছবির বই, পুতুল কিনে কিনে দেন। আমায় মন্দবাসেন, তাই ডাকেন না। এ সব কি জিজ্ঞাসা করবার কথা?

অতুলের দু'হাত ধরে দু-পাশে তারা লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

শেখরনাথ বলে, বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপ্যাল মাসি হয়ে পড়েছেন। বড্ড ভালবাসেন তিনি এদের। নেমন্তন্ন লেগেই আছে। এরাও 'মাসিমা মাসিমা' করে অজ্ঞান।

একটা ঠাট্টার কথা ত্রিদিবের ঠোঁট পর্যন্ত এসে গিয়েছিল—'মাসিমা' কেন, 'মা' বলে যাতে ডাকতে পারে, সেইটুকু করে ফেল না।

কিন্তু এমন ঠাট্টা চলবে না মঞ্জুলার ছবির সামনে। শেখরনাথ মজে আছে তার স্মৃতিতে—লঘু রহস্য রূঢ় শোনাবে।

অবশেষে ত্রিদিব উঠে পড়ল। নইলে সব কাজকর্ম মাটি হয়ে যায়। হাত ছাড়িয়ে জোর করে ওঠে। তবু রক্ষে নেই।

সন্ধ্যেবেলা যাব আমি তোমার কাছে ভাই—

সন্ধ্যেয় পাবে কোথা আমায়? রোটারি ক্লাবে বলব এ্যাটম-তত্ত্ব সম্বন্ধে। এতবড় শক্তি মানুষের হিতকাজে লাগাবার কত কায়দা রয়েছে।

শেখর কাতর হয়ে বলে, তবে কি হবে? স্বামিজীর কাছে নিয়ে যেতে চাই। তাঁকেও বলে রেখেছি।

ত্রিদিব হেসে বলে, লাভটা কি হবে বল তো! ধর্মকর্ম আমার ধাতে সয় না। তোমার স্বামিজী যত বড়ই হোন, অধর্মের ধর্মে মতি দেবেন—এত শক্তি ধরেন না তিনি।

শেখর বলে, কর্মই ধর্ম—স্বামিজী বলে থাকেন। সে দিক দিয়ে ষোলআনা ধার্মিক তুমি। নতুন করে তোমায় কি ধর্মের পাঠ দিতে যাবেন? কিন্তু বাজে কথা থাক। শিক্ষানীতি নিয়ে যে সব কথা তুমি বললে, আমি অমন করে বোঝাতে পারব না স্বামিজীকে। সেই জন্যে তোমায় নিয়ে যাওয়া।

ত্রিদিব বলে, কাজ করছ তুমি, খরচপত্র তোমার—স্বামিজীকে তবে ঘটা করে বোঝাতে যাই কেন?

জিভ কেটে শেখরনাথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, কিছু না—কিছু না। আমি কেউ নই। তিনিই সব। তিনি আর মঞ্জু। মঞ্জুর 'পরে বড় অনুগ্রহ স্বামিজীর। সেই সুবাদে আমিও আশীর্বাদ পেয়েছি। এত বড় বিদ্যায়তন গড়ে উঠল তাঁরই অনুপ্রেরণায়। শুধু টাকা খরচ করলে বড় জিনিস হয় না। প্রিন্সিপ্যালের কথা হচ্ছিল—সারা দেশ ঢুঁড়ে অমন আদর্শনিষ্ঠ সৎ মেয়ে আর একটি পাওয়া যাবে না। স্বামিজীই দয়া করে তাঁকে এনে দিয়েছেন।

এই এক কাণ্ড! বড়লোক হলেই গুরু তাকে পাকড়াবেনই। কালের গতিক বুঝে গুরুরাও আলট্রা-মডার্ন হয়ে উঠেছেন। ফিনফিনে

গেরুয়া সিল্কের পোশাক, দীর্ঘ চিক্কণ চুল থরে থরে নেমেছে। ভস্মের বদলে মাখেন পাউডার। সুকণ্ঠ হতে হবে—হারমোনিয়াম সহযোগে কীর্তন ধরেন, আর ফুলের মালা পড়তে থাকে গলায়। মাল্য দান করেন মেয়েরাই বেশি। মাল্যের বোঝায় মুখ-চোখ ঢেকে যায়। এমনি গণ্ডা দুই-তিন স্বামিজী দেখা আছে ত্রিদিবের।

শেখর বলে, আমাদের ভাবনা-চিন্তা সমস্ত স্বামিজীর কাছে পৌঁছে দিই। শেষ কথা তাঁর—তিনি যা বলবেন, তার উপরে তর্ক নেই। সংসারে ভণ্ড আছে জানি, কিন্তু সংসারসুদ্ধ সবাই ভণ্ড নয়। দেখাশুনা হোক আগে, বিচারটা ততক্ষণের জন্য মুলতুবি রাখ।

কিন্তু আজ তো আটক আমি সন্ধ্যের পর। আর একদিন যাব। কালও হতে পারে।

শেখর বলে, আজকেই। দেরি করবার জো থাকলে টানাটানি করে নিয়ে আসতাম না। কাল স্বামিজী বেরিয়ে যাচ্ছেন কুম্ভমেলায়। ওঁর তো স্নান করে চলে আসা নয়—সর্বসাধারণের ব্যবস্থা করতে করতে নিজের স্নানই হয়তো ঘটে উঠবে না। তারপর আবার কোন কাজে কোথায় বেরিয়ে পড়বেন, ঠিকঠিকানা নেই। আজই শুনিয়ে আসতে হবে। নইলে চাপা পড়ে থাকবে সমস্ত আয়োজন।

শেখর এমন করে বলছে, শুনে শুনে ত্রিদিবের আগ্রহ জমে স্বামিজীর সম্পর্কে। বলে, ঠিকানাটা দিয়ে যাও তবে। ক্লাব থেকে সোজা সেখানে চলে যাব। কিন্তু বড্ড যে রাত হয়ে যাবে—ধর সাড়ে ন'টা—

শেখর হেসে বলে, সাড়ে ন'টা স্বামিজীর সন্ধ্যাবেলা হে! যত রাত হবে, ততই ভাল। ওঁকে নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

॥ পনের ॥

পার্কের সামনে দক্ষিণ-খোলা বাড়িতে স্বামিজী থাকেন। চমৎকার বাড়ি, আরামে থাকেন বোঝা যায়। শেখরনাথ আগেই এসে দোতলার ঘরে বসে আছে। ত্রিদিব কলিং-বেল টিপতে চাকর এসে তাকেও উপরে নিয়ে গেল।

শেখর বলে, বলেছিলাম না? তাই দেখ, ধ্যানী সন্ন্যাসী নন—কর্মযোগী। সর্ব মানুষের কাজে আত্ম-নিবেদন করে বসে আছেন। কাজ নিয়ে পাগল, কাজেই মুক্তি।

ঘরের মধ্যে সন্ন্যাসের একতিল চেহারা নেই। ঝকঝক তকতক করছে। সোফা-কৌচে সাজানো। দেয়ালের ছবির মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আছেন বটে, তৎসঙ্গে রয়েছেন দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী।

স্বামিজীর ঘরে বসে শেখর আরও গদগদ হয়ে উঠেছে, মঞ্জুলা যাবার পর আমি তো একেবারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি স্বামীজীর উপর। তাঁর আদেশ ছাড়া কোন কাজে এগোই নে। সব কথা ওঁর সঙ্গে খুলে বলি, তিনি সমাধান করে দেন।

একটু থেমে বলে, নিজের ব্যক্তিগত কথাও বলে থাকি, তাঁর পরামর্শ নিই। শোন ত্রিদিব, তোমার কাছে কোন-কিছু তো গোপন নেই। একটা ব্যাপারে বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছি। স্বামিজীকে বলবার আগে তুমিই শোন সমস্ত।

স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে ত্রিদিব বলে, বল—

মঞ্জু আমার জীবন আচ্ছন্ন করে ছিল, সে তুমি জান। সে চলে যাওয়ার পর সংসার ফাঁকা হয়ে গেছে। কাজকর্ম নিয়ে ভুলে থাকতে চাই, কিন্তু আনন্দ না থাকলে কাজ শুধুমাত্র দায়িত্বের বোঝা হয়ে ওঠে—

ত্রিদিব হেসে উঠে বলে, সুলক্ষণা কন্যা দেখে পুনশ্চ পানিগ্রহণ কর। এ ছাড়া আর কোন পন্থা দেখিনে।

শেখর হাসে না, ঘাড় নেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, শুনতে বেখাপ্পা হলেও কথাটা তাই বটে। তোমার কাছে বলতে কি—বিদ্যায়তনের লেডি-প্রিন্সিপ্যালটি বড় ভাল। সেদিন তো দেখে এলে, আমার ছেলেমেয়ে দু'টিকে কেমন তিনি আপনার করে নিয়েছেন।

এবং দেখা যাচ্ছে তাদের বাপটিকেও—

শেখর বলে, প্রিন্সিপ্যালকে স্বামিজী এনে দিয়েছেন। স্বামিজীর কাছে কথাটা পাড়ব কিনা—আচ্ছা, তুমি কি বল এ সম্বন্ধে?

ত্রিদিব বলে, আজকালকার পাত্রী—তায় আবার লেখাপড়া-জানা—গার্জেনের কথায় মাথা নিচু করে সুড়সুড় করে ছাতনাতলায় এসে বসবেন, এমন তো মনে হয় না। তাঁর মতামত জেনে নাও আগে।

শেখর বলে, সঙ্কোচ লাগে—ভয়ও করে। ঠিক বোঝা যায় না ওঁকে। চটেমটে না ওঠেন আবার! কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি?

খপ করে সে ত্রিদিবের হাত জড়িয়ে ধরল।

তোমার অনেক ক্ষমতা ত্রিদিব। বড় কাজের মানুষ তুমি, তা হলেও এর একটা কিনারা করে দিতে হবে। আলাপ-সালাপ করে তুমিই তাঁর ভাব বুঝে দেখ—

এতকালের উপকারী বন্ধু এমন ধরাধরি করছে—রাজি না হয়ে পারা যায় না। যাবে শিগগির একদিন সে বিদ্যায়তনে। বিজ্ঞান-বিভাগের নতুন বাড়ি হচ্ছে, সেটা দেখে আসবে—আলাপ-পরিচয়ও হবে প্রিন্সিপ্যাল মেয়েটার সঙ্গে।

স্বামিজীকে দেখে চমক লাগে। হাসবে কি কাঁদবে, ত্রিদিব ভেবে পায় না। হেসেই উঠল হো-হো করে।

গুলি-গোলা ছেড়ে এখন স্বামিজী হয়েছ বুঝি? বেশ করেছ, ওতে ঝামেলা বিস্তর। বেড়ে দেখাচ্ছে গেরুয়া পাঞ্জাবিতে। ভাল।

শেখর সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, ছি ছি—কি বলছ তুমি ত্রিদিব!

ত্রিদিব জিভ কাটল, তাই তো হে! তুমি পাশে বসে, সেটা খেয়াল ছিল না। তোমাদের গুরুদেব—আমার এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘরোয়া ব্যাপার আছে কি না। কি নামে ভেক নিয়েছ—শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ স্বামী?

পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা মাথায় উঠে গেছে, ত্রিদিবকে নিয়ে ভালয় ভালয় এখন সরে পড়তে পারলে হয়। স্বামিজীও অস্বস্তি বোধ করছেন। মোটামুটি কাজের কথাগুলো বলে শেখর উঠে পড়ল। ত্রিদিবের হাত ধরে টেনে বের করল এক রকম।

এরা বেরিয়ে যেতে যেতেই এলো ঝুমা। স্বামিজী উঠে পড়েছিলেন—ঝুমাকে দেখে হেসে বললেন, এত রাত্তিরে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবা, কি ব্যাপার?

বড্ড দরকার আপনার কাছে। আপনি কুম্ভমেলায় চলে যাচ্ছেন। সকালবেলা তো লোকে লোকারণ্য। রাত্তিরে ছাড়া নিরিবিলি সময় কখন?

ভূমিকা না বাড়িয়ে ঝুমা বলল, চাকরিতে ইস্তফা দেব। সেই সম্বন্ধে বলতে এসেছি আপনার কাছে।

কাজটাকে আগে কোন দিন চাকরি বলনি মাধবী। চাকরি বলে মনে হচ্ছে নাকি শেখরনাথের কোন ব্যবহারে?

ঝুমা ঘাড় নেড়ে বলে, সে কি কথা! শেখরবাবু বড্ড ভাল। আরও জোর দিয়ে বলে, আমার সম্পর্কে বরঞ্চ বেশি রকম ভাল বলে মনে হয়। অপদার্থ হলাম আমি, আমায় মুক্তি দিন।

স্বামিজী মৃদু মৃদু হাসেন। বুঝতে পেরেছি, অনেককে এখন এই রোগে ধরছে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে সর্বস্ব-ত্যাগের আহ্বান এসেছিল, তখন কেউ পিছপাও হয়নি। আজকের কাজ তার চেয়েও বড়, দেশ গড়ে তোলা। ইস্কুলের মেয়েদের নিয়ে তোমার দিন কাটে—এ কাজে

উত্তেজনা নেই, শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করা। অবসাদ আসছে সেই জন্যে হয়তো।

ঝুমা অধীর হয়ে বলে, ও-সব কিছু নয়—ব্যক্তিগত ব্যাপার একেবারে। ঘর আমায় ডেকেছে। জানেন তো, ঘর না পেয়েই বাইরে এসেছিলাম একদিন।

তাই বটে! কপালের উপর সিঁদুর জলজল করছে, স্বামিজী তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, এখনই—একটু আগে ত্রিদিব এসেছিলেন। দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে? কথাবার্তা হয়েছে, রাগ মিটে গেছে?

ঝুমা বলে, আমায় ক্ষমা করেছেন। ভিতরের সেই অতি দুর্বল মেয়েটা আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে জীবনের সব আদর্শ ঢেকে দিয়ে। আপনার কাছে মুক্তি নিতে এসেছি।

প্রথম বয়সের সেই ভুলে-যাওয়া পথে নতুন করে যাত্রা শুরু। কেঁদেই ফেলল সে। বিদ্যায়তন সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা হল। স্বামিজী কুম্ভমেলা থেকে না ফেরা পর্যন্ত চলুক এমনি—ফিরে এসে তারপরে ব্যবস্থা করবেন।

রাত অনেক হয়েছে, ঝুমা বাসায় চলল। পার্কের মাঝখান দিয়ে সংক্ষেপ পথ আছে, অত দূর ঘুরতে হয় না। দ্রুত পায়ে যাচ্ছে—কে-একজন হঠাৎ এসে হাত এঁটে ধরল। অন্ধকারে প্রথমটা ঠাহর করতে পারেনি—চেঁচাতে যাচ্ছিল। তারপরে দেখল—

উঃ, কি ভয় পেয়েছিলাম!

ত্রিদিব বলে, আবছা মতন দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। না—দৃষ্টি আমার ভুল দেখে নি। আধ ঘণ্টা পার্কে বসে মশার কামড় খাচ্ছি।

কণ্ঠের রুক্ষ স্বরে ঝুমা অবাক হয়ে গেছে। বলে, স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

নিশিরাত্রি স্বামী-সন্দর্শনের উপযুক্ত সময়ই বটে!

ঝুমা আরও নরম হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে যায়, কি করব—দিনমানে ফাঁক পাওয়া যায় না। মুক্তি চাইতে গিয়েছিলাম আমি তাঁর কাছে।

কিন্তু ত্রিদিবের গর্জনে কথা শেষ হতে পায় না।

মুক্তি—কোন্ নিগড় থেকে জিজ্ঞাসা করি?

মুহূর্তে ঝুমাও কঠিন হয়ে যায়। বলে, কাজ নেই সে সমস্ত শুনে। শোনা আমার পক্ষে রুচিকরও নয়। তুমি শুনে রাখ, এক রোমাঞ্চক নাটক হয়েছিল সেদিন বরানগরে ভূতের বাড়ি। কিন্তু সেটা অভিনয় মাত্র।

বলছ কি তুমি?

তুমি নয়, আপনি বল। ডক্টর রায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—এমন কিছু অন্তরঙ্গতা সে স্বীকার করে না তোমার সম্বন্ধে।

ধ্বক করে আগুন জ্বলে ওঠে ঝুমার দু-চোখে। ঝুমা আর নয়, লতিকা। বেশ, তাই—তাই।

এদিকে-ওদিকে তাকায়। পাগলের চাউনি। সহসা শাড়ির আঁচল ঘষতে লাগল কপালের উপর। আক্রোশে কপালের সিঁদুর মুছছে। মুছে নিশ্চিহ্ন করবে। ঘষতে ঘষতে কপালের চামড়াও তুলে ফেলবে নাকি?

ত্রিদিবের ভয় হয়ে যায়। সিঁদুর তুলে ফেলছে, স্বপ্নও ঘষে ঘষে তুলছে যেন।

ঝুমা!

ঝুমা বলে, কোন লজ্জায় পরেছিলাম অপমানের সিঁদুর! ছি—ছি—ছি—

ছুটে পার্ক পার হয়ে অলিগলির মধ্যে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হল। ত্রিদিব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ ষোল ॥

মাসখানেক পরে ত্রিদিব একদিন সময় করে মঞ্জু-বিদ্যায়তনে গেল। নতুন বিল্ডিং দেখবার জন্য শেখর আরও অনেকবার বলেছে। কিন্তু যেটা আসল ব্যাপার, সেটা সেই একবারই বলেছিল। বারংবার বলতে সঙ্কোচ হয়। লেডি-প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর মনের ভাবগতিক বোঝা। এবং তদ্বির করা—শেখরের ঘরণী হতে সম্মতি দেন যাতে।

তা হাঁকডাক করে দেখাবার মতোই নতুন বাড়িটা। বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, তাতেই তাজ্জব। দু-হাতে পয়সা ঢেলেছে। মঞ্জুলাকে প্রাণ দিয়ে শেখর ভালবাসে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার ইচ্ছা পূরণের জন্য বিশাল আয়োজন। এটা ত্রিদিব বিশ্বাস করে না যে ভালবাসলেই অমনি জনম ভোর ফোঁৎ-ফোঁৎ করে নাক-চোখ মুছতে হবে। ভালবাসা হল অম্লান দীপের মতো—ক্ষতি কি, দীপ জ্বালিয়ে পূজা-অর্চনা ছাড়া কিছু আমোদ-ফূর্তিই হয় যদি!

দারোয়ান বলে, দাঁড়িয়ে কেন হুজুর, ঘরের মধ্যে বসুন। ডেকে আনছি আমি বাবুকে।

শেখর এসেছে?

অনেকক্ষণ হুজুর। এই এতক্ষণ বসেছিলেন আপনার জন্যে। তারপর কণ্ট্রাক্টর এসে পড়ল—

ত্রিদিব বলে, তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল কোথায়?

দিদিমণি তো চরকির মতো ঘুরছেন। সমস্ত দায় একটা মানুষের মাথায়। বসুন আপনি, খবর দিচ্ছি।

প্রিন্সিপ্যাল লতিকা। নতুন বিল্ডিং-এর দ্বারোদঘাটন-উৎসব ঠিক আঠারো দিন পরে। কাজের বোঝার উপরে এই এক শাকের আঁটি চেপেছে। বাচ্চা মেয়েরা মিলিত কণ্ঠে উৎসবের গান রপ্ত করছে—

সেইখানে একবার গিয়ে সে দাঁড়ল। অঞ্জু এদের মধ্যে। গান ছেড়ে সে ছুটে এসে লতিকার হাত জড়িয়ে ধরে। হাত ছেড়ে তারপর ঘুর-ঘুর করে চারিদিকে একপাক নেচে নেয়।

মাসিমা, মাসিমামণি—

দেখাদেখি আরও অনেক মেয়ে ঘিরে ধরেছে। গান বন্ধ। লতিকা গাল টিপে চুল টেনে কয়েকটিকে আদর করে বলে, যাও—আমায় দেখলেই ছুটে আসবে, এ কেমন কথা! অমন উঠে আসতে নেই, গানের দিদিমণি তাহলে রাগ করবেন।

বেরিয়ে এসে দেখে, শেখরনাথ দরজার ধারে। বলল, একটু আসুন লতিকা দেবী! কণ্ট্রাক্টর ক্যাটলগ নিয়ে এসেছে—নতুন অফিস-ঘরের ফার্নিচার কি ধরনের হবে, বুঝিয়ে দেবেন তাকে।

মিটিমিটি হাসছে শেখরনাথ। একটু থেমে আবার বলল, মেয়েরা ঘিরে ছিল—ভারি ভাল লাগছিল আপনাকে। আশ্রমকর্ত্রীর অপূর্ব রূপ।

লতিকা হেসে বলে, আপনি আশ্চর্য মানুষ শেখরবাবু। ক'দিন পরে এত বড় এক ব্যাপার—এর মধ্যে কবিত্ব আসে কেমন করে জানিনে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শেখর। অঞ্জু হাত ধরে নাচছিল, হঠাৎ মঞ্জুলার কথা মনে এসে গেল। ছোট্ট ইস্কুল তখন। মঞ্জু এলে মেয়েরা অমনি তাকে ঘিরে নাচত।

একটু চুপ করে থেকে বলে, আমার মনে হয় কি জানেন, মঞ্জুই আপনাকে জুটিয়ে এনেছে তার কাজ করে দেবার জন্যে। কাজও তাই নিখুঁত হচ্ছে। মঞ্জু বেঁচে থাকলেও বোধ করি এমনটা হতে পারত না।

কেমন এক বিহ্বল চোখে তাকিয়েছে। লতিকা তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলে, বিজ্ঞান-বিভাগ নিয়ে অনেক ভাবনা ছিল—সেটাও চালু হয়ে যাচ্ছে। এবারে আমি বিদায় নেব। কলকাতা ছেড়ে একেবারে বাইরে চলে যাব।

তবে আমিও থাকব না। চলে যাব সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে।

কেন?

উঠেই তো যাবে আপনি না থাকলে। ততদূর হতে দেব না—তার আগে মানে মানে সরে পড়ব।

লতিকা বলে, মঞ্জুলা দেবী নেই, তাঁর অভাবে কিছুই আটকে থাকছে না। আমি গেলেই অমনি উঠে যাবে?

শেখর বলে, ওসব আমি ভাবতে পারি নে। ভাবতে গেলে নিজেকে অসহায় বোধ করি। যেন অকূল সমুদ্রে ভাসছি—এতটুকু আশ্রয় নেই, ভরসা করে যেদিকে হাত বাড়ানো যায়।

লতিকা কঠিন হয়ে বলে, কিন্তু যেতেই হবে আমাকে। থাকতে পারব না। কথাবার্তা আগেভাগে পরিষ্কার হয়ে থাকা ভাল। আপনারা অন্যলোক দেখতে লাগুন।

সত্যিকার জোর কিছু তো নেই—কী আর বলব! যার উপরে জোর ছিল সে ছেড়ে চলে গেল—

গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে কয়েক পা গিয়ে শেখর বলে ওঠে, হ্যাঁ—বলবে তারাই, যাদের আপনি কিছুতেই ফেলতে পারবেন না। অঞ্জু-রঞ্জুকে জানিয়ে দেব, তোদের মাসিমামণি চলে যাবেন।

কাতর অনুনয়ের কণ্ঠে আবার বলে, অসহায় ছেলেমেয়ে দুটো মা'কে ভুলে আছে আপনাকে পেয়ে। পারবেন ছেড়ে যেতে ঐ মা-হারাদের? কষ্ট হবে না?

লতিকা আগে আগে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হল হঠাৎ। শাণিত অসিফলকের মতো হাসি মুখের উপর। বলল, শুধুই মা-হারাদের কথা? ঠিক করে বলুন, তাদের পিতাঠাকুর মহাশয়ের কিছু নয় তো?

প্রশ্ন শুনে শেখর হতভম্ব হয়ে যায়। সামলে নিয়ে তারপর মৃদু-কণ্ঠে বলে, মঞ্জু চলে যাবার পর ঘরবাড়ি সমস্ত খালি হয়ে গেছে—

এবং আপনার হৃদয়ও।

ঠিক তাই। আমি পাগল হয়ে যাব লতিকা দেবী। আপনি দয়া করুন।

কথায় ছেদ পড়ে গেল। দারোয়ান এসে খবর দেয়, এসেছেন সেই সাহেব। অফিস ঘরে বসিয়ে এসেছি।

অফিস ঘরে ঢুকল ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটি। মুকুল না? হ্যাঁ, মুকুলই তো?

এস এস মুকুলবাবু। আমায় চিনতে পারছ না? জিব্রাল্টারে জাহাজডুবির সেই যে ভূত আমি।

এত ডাকছে, মুকুল যেন কানে শুনতে পায় না। ত্রিদিব উঠে বাইরে এল। মুকুল আরও জোরে হাঁটে।

পালাচ্ছ কেন আজকে? কি হল? এখানে—বিদ্যায়তনে কি জন্যে তুমি?

দৌড়বে নাকি ধরবার জন্য? দৃশ্যটা উপভোগ্য বটে! বিশ্ববিখ্যাত ডক্টর ত্রিদিব রায় বাচ্চাছেলের পিছু পিছু ধাওয়া করেছেন। থপথপে দেহ নিয়ে ধরা যেত না। কিন্তু ওদিকটায় পথ নেই, দেয়াল। মুকুল ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়েও মুখে কথা নেই, হাত টানাটানি করছে ছাড়িয়ে নেবার জন্য।

বল না মুকুল, কি হয়েছে? রাগ করেছ আমার উপর?

কথা না বলে এবারে উপায় নেই। মুকুল বলে, ছেড়ে দিন।

না বললে ছাড়ব না। বল, আমি কি করেছি।

মুকুল বলে, মা রাগ করেছে—খুব বকেছে আমায়।

কি বলেছেন তোমার মা?

একটু ইতস্তত করে মুকুল। তার পরে বলেই ফেলল, আপনি ডাকলে কাছে যাব না—কথাও বলব না আপনার সঙ্গে।

ত্রিদিব মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, তা সত্যি। ডক্টর রায়ের মতো নৃশংস নরাধম দুনিয়ায় আর একটি নেই, তার কাছে গেলে খারাপ হয়ে যাবে। তোমার মা ঠিক বলেছেন, যাওয়া উচিত নয়।

ছেড়ে দিয়েছে মুকুলের হাত। মুকুল তবু তার মুখের দিকে চেয়ে। ত্রিদিব বলতে লাগল, সবাই সাচ্চা—সকলে ভাল। এই একটি মানুষই শুধু পৃথিবীর সেরা সেরা দোষগুলো করে আসছে। তার কাছে গেলে ছেলেপুলে নষ্ট হয়ে যায়। দাঁড়িয়ে কেন মুকুল, পালাও। তুমি কেন গালি খাবে আমার জন্যে? দোষ-অপরাধের তো অন্ত নেই—মায়ের অবাধ্য হতে বলে আবার এক নতুন দোষ করব না।

মুকুল চলে গেল তাড়াতাড়ি পা ফেলে। দৌড়নোও বলা চলতে পারে। যেন কোন সর্বনাশের কবল থেকে ছুটে পালাল। ত্রিদিব দু-চোখ বন্ধ করল—কেন হে, জল আসছিল নাকি? না—পৃথিবীখ্যাত ত্রিদিব রায় কাঁদতে যাবে কোন দুঃখে? ও কিছু নয়, এমনি চোখ বোজা।

বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, অফিস-ঘরে নিয়ে বসায় নি?

ঝুমা আর শেখর এসেছে। না, ঝুমা তো নয়—লতিকা। শেখর পরিচয় করিয়ে দেয়, বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপ্যাল লতিকা দেবী—যার কথা বলছিলাম তোমায়। কি ভাগ্যে যে এঁকে পেয়েছি! আর ইনি হলেন ডক্টর ত্রিদিব রায়—নামেই যথেষ্ট, পরিচয়ের দরকার হয় না। না, একটি পরিচয় দিতে হবে—আমার পরম বন্ধু। ইস্কুল থেকে এক সঙ্গে পড়াশুনো, এত বড় হলেও সেই একভাব। এমন উপকারী বন্ধু আমার আর নেই।

ত্রিদিব বলে, তুমি নিজে বড়, তাই এমন করে বলছ। যদি কিছু কাজ করে থাকি, তার মূলে তুমি। তোমার সাহায্য না পেলে ত্রিদিব রায় আজও গেঁয়ো ইস্কুলের মাস্টার হয়ে থাকত, তার বেশি কিছু নয়।

কণ্ট্রাক্টর এসে বলে, স্যার, ফার্নিচার তো হল। আর আপনি বলছিলেন, হলের ভিতর টুকটাক কি সব কাজ।

উৎসবের আগেই সব সেরে ফেলতে হবে। চলুন, আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে শেখর নতুন বিল্ডিং-এর দিকে যাচ্ছে। লতিকাকে বলল, আপনারা অফিস-ঘরে গিয়ে বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি। ছাত্রদের বিজ্ঞান শেখানো সম্বন্ধে ত্রিদিব দেশবিদেশে অনেক দেখে এসেছে, অনেক ভেবেছে। এ সম্বন্ধে পড়াশুনাও বিস্তর। আলোচনা করে আপনি খুশি হবেন লতিকা দেবী। ত্রিদিবের দিকেও ইসারা করল। অর্থাৎ দু-জন মাত্র রইলে—শুধুই ইস্কুলের ব্যাপার নিয়ে সুবর্ণ-সুযোগ নষ্ট কোরো না।

নিঃশব্দে অফিসঘরে এল পাশাপাশি দু-জনে। ঝুমা আর ত্রিদিব। উঁহু, ডক্টর ত্রিদিব রায় আর লতিকা দেবী। চেয়ারে সুখাসীন হয়ে হাসির মতো ভাব করে ত্রিদিব বলল, বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আছ তুমি? শেখর শতমুখে তোমার গুণগান করে।

লতিকা বলে, তুমি নয়, আপনি বলতে হবে।

ত্রিদিবের চমক লাগে। এ যেন অন্য কেউ বলছে, এ কণ্ঠ ত্রিদিব কোন দিন শোনেনি জীবনে। লতিকা বিশদরূপে বুঝিয়ে দেয়, অনাত্মীয় অপরিচিতকে আপনি বলাই নিয়ম।

ত্রিদিব ঘাড় নেড়ে বলে, সিঁথির সিঁদুর একেবারে নিশ্চিহ্ন—অনাত্মীয় তো বটেই। কিন্তু অপরিচিত বলা চলে কেমন করে?

ব্যঙ্গের হাসি ঝিকমিকিয়ে ওঠে লতিকার মুখে। কোনদিন ছিল নাকি পরিচয়? কই, আমার তো মনে পড়ে না। সিঁদুর শুধু নয় —মনের উপরের দাগও ধুয়ে-মুছে গেছে, এতটুকু চিহ্ন নেই কোথাও।

এই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিনে লতিকা দেবী। একটু থেমে আরও জোর দিয়ে বলে, ঠিক তাই, মুকুল বাপ দেখে পালায়—বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে মানা। মনের মধ্যে দরদ না থাক, বিষ আছে। আনন্দ দেওয়া নয়, অপমান বেঁধানোর কৌশল। ভুলে যাওয়ার লক্ষণ নয় মোটেই এটা।

ছেলেকে আমি অসৎসঙ্গে মিশতে মানা করেছি। এরই মধ্যে মনের পাখনা বেরুচ্ছে—দেশের গণ্ডির মধ্যে তার আকাঙ্ক্ষা আটক

থাকতে আর রাজি নয়। নানা রকম দুর্জন মানুষের নাম করে বলে, তাদের মতন হবে সে জীবনে।

ত্রিদিব উচ্চ হাসি হেসে ওঠে।

দুর্জন মানুষ একটাই। ওটা গৌরবে বহুবচন, বুঝতে পারছি। তা সে যাই হোক, বাপ-ছেলের সহজ সম্পর্কের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়ানো—নিশ্চয় অনধিকার-প্রবেশ সেটা।

লতিকা বলে, দায়িত্বের সঙ্গেই আসে অধিকার। বস্তুর যেমন ছায়া। ওটা স্বতন্ত্র কিছু নয়। ছেলের এতটা বয়সের মধ্যে যে কোন দায়িত্বই নিল না, অধিকার আসবে তার কিসে? মুকুলের বাপ-মা সমস্ত আমি—একলা আমি। আমি ছাড়া কোন আপনজন নেই সেই অভাগার।

কণ্ট্রাক্টরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে শেখর ফিরে এল। দায় সেরে আসা কোন গতিকে—যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে বোঝানোর ধৈর্য নেই। লতিকার কাছে প্রস্তাবটা নিজেই আজ অনেকখানি এগিয়ে রেখে গেছে—তারপরে ত্রিদিব আর কতদূর কি করতে পারল, কে জানে! যথাসাধ্য সে করবেই। কাজ যত দুঃসাহসিক হোক ত্রিদিব কখনো পিছপাও হবে না, এটা শেখরের চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। ঘরে ঢুকেই দু-জনের দিকে দৃষ্টিপাত করে অবস্থার আন্দাজ নিতে চায়। থমথমে মুখ দেখে ঘাবড়ে গেল—বেশি সুবিধে হয়েছে বলে তো ঠেকে না। ঠোঁটের উপর কাষ্ঠহাসি এনে প্রশ্ন করে, আলাপ-সালাপ হল আমাদের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে? বাঙালি মেয়ের মধ্যে এমন মেধা আমি আর দেখি নি।

হেসে উঠে লতিকাই বলে ওঠে, বলেন কি শেখরবাবু? মঞ্জুলা দেবী—যাঁর নামে এই বিদ্যায়তন—তাঁর চেয়েও মেধা বেশি হল আমার? নাকি তিনি আর কানে শুনতে আসছেন না বলে?

শেখর অপ্রতিভ হয়। চকিতের মতো মনে আসে, বুদ্ধির এত প্রখরতা ভাল নয়। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে অবশেষে বলে, মঞ্জু ছিল হৃদয়ের দিক দিয়ে অনেক বড়—

আমার বুঝি সে বালাই নেই?

ত্রিদিবের দিকে চেয়ে হেসে উঠে বলে, ডক্টর রায়ের কি অভিমত? আমাকে হৃদয়বতী বলে মনে হয় না আপনার?

শেখর বলে, কি মুশকিল! দু-জনেই কি ভাল হতে পারেন না? সংসারে কি দুই সমান ভাল থাকতে নেই। তুলনার কথা উঠছে কেন আপনার মনে?

লতিকা বলে, আজকে না হোক, উঠবেই তো দু-দিন পরে। যাঁর জায়গায় নিয়ে বসাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে অহরহ মনে মনে তুলনা করবেন। তার চেয়ে আগে থেকে ফয়শালা হয়ে মনের বাষ্প কতক বেরিয়ে যাওয়া ভাল।

ত্রিদিব সবিস্ময়ে শেখরের দিকে তাকিয়ে বলে, একথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না শেখর—

লতিকা বলে, কিছু বলেন নি শেখরবাবু? কি আশ্চর্য, আপনাকেও নয়? আমিই তবে নিমন্ত্রণ করে রাখি। বিয়েয় আসতে হবে ডক্টর রায়।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে ত্রিদিব বলে, বিয়ে—কার বিয়ে?

আমার-ওঁর—। অন্যের বিয়েয় বলতে যাওয়ার কি দায় পড়েছে? আপনার বন্ধুটি কি লাজুক ডক্টর রায়—আপনার কাছে খুলে বলতেও লজ্জা! বুঝতেই পারছেন—বেশি জানাজানি হতে দেবার ব্যাপার নয়, বেশি লোককে বলা হবে না। আপনাকে নিজে উপস্থিত থেকে শুভ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

বলে চক্ষের নিমেষে লতিকা বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে যেন বোমা মেরে চলে গেল। নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো দু-জনে মুখোমুখি তাকিয়ে—কথা বলতে পারছে না, ভাবনার শক্তি হারিয়েছে।

॥ সতেরো ॥

শেখরনাথ ক্ষণকাল দিশা করতে পারে না। তারপর ত্রিদিবের হাত জড়িয়ে ধরল।

তোমার কীর্তি বুঝতে পারছি। ঠিক তাই। চিরকাল জানি, অসাধ্য সাধন করতে পার তুমি। এই তার এক নমুনা।

আমি কি করলাম?

দেখ, কতকাল ধরে মনে মনে এই সব তোলাপাড়া করছি। এক পা এগোই তো তিন পা পিছুই। পনের-বিশ মিনিট মাত্তর তোমরা এক সঙ্গে ছিলে—তার মধ্যে কি হয়ে গেল, কেমন করে কি ভাবে কথাটা তুললে বলো দিকি।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নানা রকমে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে—থামানো যায় না। ত্রিদিব কিছু করে নি, লতিকার সঙ্গে এ সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হয় নি।

—তা শেখর কানেই নেবে না। এক নম্বর হাঁদারাম—এরাই হল দেশনেতা, খবরের কাগজগুলো পঞ্চমুখ এদের প্রশংসায়।

ত্রিদিব বলে, সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চাও নাকি আধ-বুড়ি প্রিন্সিপ্যালটাকে?

শেখর বলে, আমার বয়সটারও হিসাব ধর। কচিকাঁচা কে আসবে আমার ঘরে—আমার ছেলেমেয়ের মা হতে?

ভাল করে খোঁজখবর নিয়েছ তো কে মেয়েটা, কোথা থেকে এলো, কেমনধারা আগেকার জীবন?

এতদিন ধরে কাছাকাছি রয়েছেন, অহরহ চোখের উপর দেখছি—পরের কাছে কি খোঁজ খবর নিতে যাব, পরে আর কোন্ নতুন কথা বলবে? তা ছাড়া স্বামিজী যাঁকে এনে দিয়েছেন, তার কোন দোষত্রুটি থাকতে পারে না।

ত্রিদিবের মুখে চেয়ে শেখর কি দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করে, তোমার জানাশোনা নাকি ওর সঙ্গে?

থতমত খেয়ে ত্রিদিব বলে, হ্যাঁ—একটু-আধটু আছে বই কি! যার জন্যে তুমি পাগল হয়ে উঠেছ—জান, এক ছেলে আছে তার?

মুকুল—খুব জানি তাকে। ছি-ছি, কি ভেবেছ তুমি! শেখর উচ্চ হাসি হেসে উঠল। বলে, এক কুড়ানো ছেলে। ছেলেটাকে লতিকা দেবী মানুষ করেছেন, বোর্ডিং-এ রেখে পড়ান।

একটুখানি থেমে বলে, এ রকমটা হবেই। দেখ, লেখাপড়া শিখে বেশি বয়স পর্যন্ত বিয়েথাওয়া না করলে কি হবে, মাতৃত্ব মেয়েদের স্বভাব!

ওঃ, বিয়ে করেন নি বুঝি? কুমারী?

সহাস্যে ঘাড় নেড়ে শেখর বলে, হ্যাঁ কুমারী। অনাঘ্রাত একটি শতদল ফুল। বয়স কিছু বেশি হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে কিছুই বলবার নেই।

ত্রিদিব বলে, মুকুল ওঁরই গর্ভজাত ছেলে—কুড়িয়ে-পাওয়া নয়। হ্যাঁ, ও-মেয়ে খুব সহজ ব্যক্তি নন—মিথ্যা-পরিচয়ে তোমার বিদ্যায়তনে ঢুকেছেন।

শেখর স্তম্ভিত হয়ে বলে, এ তুমি কি বলছ ত্রিদিব?

ভাল রকম জানি বলেই। আমি ছাড়াও জানে অনেকে—এই কলকাতা শহরেই আছে তেমন লোক। প্রমাণ করে দেওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। কিন্তু আমি বলি কি—বাইরের লোক ডাকবার আগে তুমি নিজেই একবার স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করতে পার। দেখি কি জবাব দেন।

শেখর তাড়াতাড়ি বলে, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাব না। আর তোমার কথা সত্যি হোক মিথ্যে হোক—অনুরোধ করছি, এ ব্যাপার নিয়ে উচ্চবাচ্য কোরো না। তোমার মনের তলে কত ভারী ভারী জিনিস চাপা রয়েছে—এটাও চাপা পড়ে থাক তার পাশাপাশি।

অর্থাৎ লতিকা যেমন হোক, যত নোংরা হোক তার পিছনের ইতিহাস, বিয়ে তুমি করবেই।

সজোরে ঘাড় নেড়ে শেখর বলে, হ্যাঁ।

আমি তা হতে দেব না।

কেন, তোমার কি স্বার্থ বল তো ?

সেটা না-ই বা শুনলে। কিন্তু আমায় শত্রু বানিয়ে তোমার অত্যন্ত অসুবিধে হবে। বিদ্যায়তন থেকে বিদ্যা কি পরিমাণ সরবরাহ হচ্ছে, সঠিক জানি নে। তবে তোমার নামযশ বিদ্যায়তনের এই অট্টালিকার মতো সকল মানুষের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে উঠেছে। লহমার মধ্যে আমি সমস্ত চুরমার করে দিতে পারি—আশা করি, মিথ্যে দম্ভ বলে মনে কর না।

রাগে গরগর করতে করতে ত্রিদিব চলে গেল। শেখর অবাক। কিসে হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল। মঞ্জুলাকে অতিরিক্ত রকম ভালবাসে বলে চারিদিকে রটনা—ধরা যাক সেটা একেবারে মিথ্যা। এবং এটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল, লতিকা দেবীর পদস্খলন হয়েছিল কুমারী অবস্থায়। কিন্তু এ সমস্ত শেখরের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ত্রিদিবের আগুন হয়ে উঠবার হেতুটা কি ? যত বড় বন্ধুই হোক অভদ্রভাবে অমন ভয় দেখানো কথা বলা তার পক্ষে নিতান্ত বেমানান। একদিন ত্রিদিব উপকার করেছিল, কিন্তু ত্রিদিব আজ যে এত বড় হয়েছে তার মূলেও নিশ্চয় এই শেখরনাথ।

যা হবার হোক,—ত্রিদিব যদি শত্রু হয়ে পড়ে, কি আর করা যাবে ? মঞ্জুলা বেঁচে নেই, তেমন আর ভয়ের নেই কিছু এখন। সারা জীবন সে ভেসে ভেসে বেড়াবে না—না হয় কলকাতা শহর ছেড়ে কোথাও চলে যাবে লতিকা আর অঞ্জু-রঞ্জুকে নিয়ে। দশের হাততালি, খবরের কাগজের কৃপণ দু-এক লাইন কিম্বা এই বিদ্যায়তন—এ সবের চেয়ে লতিকার মূল্য তার জীবনে অনেক বেশি।

ভেবেচিন্তে মন স্থির করে শেখর চলল প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারে।

কোয়ার্টার বিদ্যায়তন-কম্পাউণ্ডের ভিতরেই। আজকে ছুটির দিন। ছুটির দিনে মুকুল মায়ের কাছে আসে। লতিকা এটা-সেটা বানিয়ে রাখে, ছেলেকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে খাওয়ায়। খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে সে বাইরে এলো।

এমন অসময়ে যে শেখরবাবু?

শেখর বলে, একটু আগে যা সমস্ত বলে এলেন, তারপরে সময়-অসময় বিচারের অবস্থা থাকে না লতিকা দেবী।

একটু চিন্তার ভান করে লতিকা বলে, এমন কি বলে এলাম! আমি তো কই ভেবে পাচ্ছি নে কিছু।

আমাকে জীবনে গ্রহণ করবেন। এ যে আমার কত দিনের স্বপ্ন—

কথা শেষ করতে দেয় না লতিকা। হেসে উঠে বলে, কি সর্বনাশ—আপনি সত্যি বলে ধরে নিয়েছেন? ঠাট্টার কথা বুঝতে পারেন না! তাই কখনো হতে পারে?

শেখর বলে, কেন হতে পারে না বলুন।

লতিকা বলে, আপনাকে ছোট হতে দেব না শেখরবাবু। পুরুষ বড় মিথ্যাচারী। তার মধ্যে একজন অন্তত আমার চোখের সামনে রইলেন, একনিষ্ঠ ভালবাসায় চিরদিন যিনি মঞ্জুলা দেবীর স্মৃতির মধ্যে ডুবে আছেন।

শেখর তর্ক করে, বিয়েথাওয়া হলে আপনি আর পালাই-পালাই করতে পারবেন না। মঞ্জুলার বিদ্যায়তন আরও বড় হবে, ভাল চলবে। ওপার থেকে দেখে খুশিই হবে সে।

ভ্রূকুটি করে লতিকা বলে, এই জন্যে?

শেখর ইতস্তত করে বলে, একেবারে আসল কারণ না হলেও এ-ও একটা কারণ বই কি!

লতিকা ব্যঙ্গস্বরে বলে, শুনছি মঞ্জুলার আত্মার সঙ্গে হামেশাই আপনার দেখাশুনো চলে। ভাল করে এবারে জেনে নেবেন তো, বিদ্যায়তনের খাতিরে সতীন তিনি সহ্য করতে পারবেন কি না।

শেখর রাগ করে বলে, খুব যে ঠাট্টা করছেন লতিকা দেবী।

ভণ্ডামি ঠাট্টারই জিনিস। আপনি আমার ধারণা ভেঙে দিলেন শেখরবাবু। মঞ্জুলার কাজের খাতিরে আপনি বিয়ে করতে চাচ্ছেন, কখনো তা আপনার মনের কথা হতে পারে না।

শেখর বলে, কিন্তু আপনার মনেই যদি ভিন্ন কথা, ত্রিদিবের সামনে কেন অমন করে বানর নাচালেন?

ঘৃণাভরা তীব্রকণ্ঠে লতিকা বলে, বানর দেখলেই নাচাতে ইচ্ছা করে। নাচিয়ে মজা পাওয়া যায়।

অপমানে শেখরের মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি সামলে নেবার চেষ্টা করেঃ নাচাবারই মতলব ছিল শেখরবাবু। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে আপনাকে নয়।

তবে কে? আর ছিল সেখানে ত্রিদিব। তার পরেই বা এত আক্রোশ কিসের? আপনার কৌমার্যকাহিনী কিছু কিছু তার জানা আছে, সেই জন্যে না কি?

লতিকা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখে দেখে শেখর খানিকটা আনন্দ পায়। আশাভঙ্গের শোধ তুলে নিচ্ছে নিষ্ঠুর আঘাত হেনে। বলতে লাগল, কি আশ্চর্য—এতদিন রয়েছেন, আপনাকে একটু চিনতে পারি নি! পিছনের কলঙ্কের এতটুকু খোঁজখবর নিই নি।

কি আমার কলঙ্ক? ডক্টর রায় কি বলেছেন আমার সম্বন্ধে?

আপনি বলেছিলেন মা-বাপ মরা কুড়ানো ছেলে মুকুল। কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন।

আস্তে, আস্তে বলুন শেখরবাবু। জোড়হাত করে বলছি, অত চেঁচাবেন না।

সশঙ্কে লতিকা পিছনে ঘরের দিকে তাকায়। কি সর্বনাশ, যা ভয় করেছিল তাই। গোলমাল শুনে মুকুল কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। রক্তলেশবিহীন পাংশু মুখ। ছেলের দিকে তাকিয়ে লতিকার অন্তরের মধ্যে হাহাকার করে উঠল।

শেখরের দৃকপাত নেই, তেমনি কঠিন কণ্ঠে বলে চলেছে, বলুন যে এই মুকুল আপনার কুড়ানো ছেলে, সত্যিকার ছেলে নয়। দয়া করে তাকে পালন করছেন। অবিশ্যি বললেই যে পার পেয়ে যাবেন তা নয়। ত্রিদিব রায় এই কলকাতা শহরে বসেই প্রমাণ করে দেবে।

কিছু প্রমাণ করতে হবে না। স্বীকার করছি, মুকুলের মা আমি—সত্যিকার মা।

কুমারীর সন্তান! আর তাই গোপন রেখে পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে আছেন এতদিন। শহরের বিশিষ্ট ভদ্রঘর থেকে এখানে মেয়ে পাঠায়।

বাঘিনীর মতো লতিকা গর্জন করে ওঠে, বাড়ি বয়ে এসে অপমান করছেন শেখরবাবু। অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। আপনার পশুবৃত্তিতে আমার ছেলে হাঁপিয়ে উঠেছে।

হাত বাড়িয়ে বাইরের পথ দেখিয়ে দিল। শেখর বলে, আমার জায়গায় বসে আমার উপর হুমকি?

বিত্তায়তনের প্রিন্সিপ্যাল আমি, এটা আমার বাসা। আপনাকে বলছি এই মুহূর্তে চলে যান এখান থেকে।

আচ্ছা, ক'দিন আব প্রিন্সিপ্যাল থাকতে পারেন, দেখে নেব। শেখর দ্রুত পায়ে চলে গেল।

॥ আঠারো ॥

বিত্তায়তনের জরুরি মীটিং। নতুন বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্ঘাটন কিছু পিছিয়ে দেওয়া হল। লতিকাকে সরিয়ে নতুন যিনি প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসবেন, তাঁকে দিয়েই সে কাজ হবে। মঞ্জুলার নামের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান—লতিকার মতো মেয়ের এখানে জায়গা নেই।

ব্যাপারটা বেশ খানিক চাউর হয়ে পড়েছে। হেন মুখরোচক কথা

গোপন রাখা দায়। সত্যি যেটুকু, তার বহুগুণ রটনা। এমন কি মুকুলেরও কানে গিয়ে উঠেছে। কাঁদো-কাঁদো হয়ে সে বলল, তোমার বড্ড অপমান করবে নাকি মা ? মীটিঙে তুমি যেও না।

লতিকা একটুও যে বিচলিত হয়েছে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কৌতুক-স্বরে বলল, তবে কি করব রে খোকা ?

পালিয়ে চল মা এদের এখান থেকে।

লতিকা গম্ভীর হয়ে বলল, পালানো তোর মায়ের স্বভাব নয়। এখান থেকে যাব ঠিকই, কিন্তু মীটিঙ হয়ে যাবার পরে।

ডক্টর রায়ের মতন মানুষ ঐ দলে রয়েছেন, তবে আর ভরসা কিসের বল ? ছেলের কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাল। বলে, ছি-ছি-ছি, অত বড় মানুষ—এমন নোংরা মতিগতি তাঁর।

লতিকা বলে, সেই জন্যেই তোকে সামাল হতে বলি বড় মানুষের কাছ থেকে। মীটিঙ অবধি থেকে স্বচক্ষে দেখে যেতে চাই, ঐ মানুষ কতদূর নিচে নামতে পারে।

মুকুলকে কাছে টেনে বুকের উপর তার মাথা চেপে ধরল। বলে, কী হয়েছে বে খোকা, অত মন ভারী করবার কি আছে ? দেখ দেখ, মুকুলবাবুর চোখে জল। সকলকে আমি বলে দেব, পুরুষছেলে হয়ে কেঁদে ফেলে কথায় কথায় —

মুকুল লজ্জা পেয়ে চোখ মুছে ফেলে। কিন্তু চুপ করে থাকতে পাবে না, আগের কথারই জের ধরে বলে, তুমি পছন্দ করতে না মা, কিন্তু আজ তোমায় বলি, কাগজ খুঁজে খুঁজে ওঁর কথা আমি পড়েছি। কী ভাল যে লাগত ! বাইরে এত নামডাক, সে মানুষ এত ছোট হয়ে যায় কেমন করে ?

লতিকা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলে, যে যেমন হয় হোকগে। আমাদের কি। যা তুই বলছিলি—চলেই যাবো এখান থেকে। তুইও যাবি। হস্টেলে থেকে পড়া আর হয়ে উঠবে না বাবা। খরচ পাব কোথায় ? মাস্টার মশায়ের মাইনেও হয়তো দিয়ে উঠতে পারব না।

মুকুল বলে, হোকগে, হোকগে। মাস্টার মশায়ের কি দরকার? তুমি একটু-আধটু বলে দিও। খুব ভাল হবে মা, তোমার কাছে পড়ব আমি।

লতিকাও বলে, তবে দেখ্। ওরা কষ্ট দিতে গেল, উল্টে মজা আমাদের। এতদিনই তো কষ্ট গেছে—তুই এক জায়গায় আমি অন্য জায়গায়। এবার থেকে মায়ে ছেলেয় একসঙ্গে থাকব। উঁহু, বাবা আর মেয়েয়—কি বলিস?

মজার দিনের সম্ভাবনায় লতিকা উচ্ছ্বসিত হাসি হাসতে লাগল। মায়ের সঙ্গে মুকুল কিন্তু হাসে না। সে চুপচাপ।

খবরের কাগজের চাকরিটা গিয়ে উৎপলা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। খাটনির জন্য নয়। সারাদিন খাটাও তাকে, নাইট-ডিউটি দিয়ে সমস্ত রাত্রি খাটাও—অটুট স্বাস্থ্য, তাতে তার কষ্ট নেই। কষ্ট হল দুলালের মতো মানুষের অহরহ কাছাকাছি বসে থাকা। কারণে অকারণে তাকে আকাশে তুলে ধরা। অসহ্য, অসহ্য! কাজ ওখানে যা ছিল, কিছুই না। আরও ঢের ঢের কঠিন কাজের ভার দাও। কিন্তু কাজের বাইরে ঐ যে মোসাহেবি ও ভালবাসার ভাণ—তারই খাটনিতে হাঁপ ধরে যায়। সারাদিনের এই অদ্ভুত চাকরির পর নিরালা রাত্রে শ্রান্তিতে ঘুম পায় না, চোখ ফেটে কান্না আসে।

চুপচাপ ঘরে বসে থাকবার অবস্থা নয়—দাদা মারা গিয়ে সকল দায়-দায়িত্ব উৎপলার কাঁধে চেপে গেছে। আবার তাই চাকরি খুঁজতে হয়। এমন জায়গা চাই, প্রবীণ পাকা লোক যেখানকার মুরুব্বি। যত খুশি খাটিয়ে নিক, কিন্তু তার বাইরে অপর কোন প্রত্যাশা না থাকে।

তেমনি এক চাকরিই জুটেছে। কনস্ট্রাকসন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম। বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করে নতুন লিমিটেড কোম্পানি ফেঁদেছেন। দেশ জুড়ে হাজারো পরিকল্পনা—আর

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সুদীর্ঘ চাকরিতে বিস্তর কেষ্টবিষ্টুর সঙ্গে দহরম-মহরম হয়েছে। তোড়জোড় করে কয়েকটি ভাল ভাল কন্ট্রাক্ট যে বাগাতে পারবেন, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ মাত্র নেই। চিঠিপত্র লিখতে উৎপলার অসাধারণ দক্ষতা—ইংরেজির খাসা বাঁধুনি। লেখার নমুনা দেখে তাকে চাকরি দিয়েছেন। পলিতকেশ, মানুষটিও ভাল—মা ছাড়া মুখে কথা নেই। সকাল ঠিক দশটায় অফিসে যাবার কথা, উৎপলা যায়ও তাই। সাড়ে-পাঁচটায় বেরুবে—ঠিক সেই মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাড়া পাওয়া যায়, আরও তিনটে চিঠি আছে মা, বড্ড জরুরি। লেট-ফী দিয়ে আজকেই পাঠাতে হবে। এগুলোর একটা গতি করে যাও। তার মানে, চলল এখন সেই সাতটা অবধি ; কিম্বা তারও বেশি। এ হেন জরুরি চিঠির ব্যাপার একদিন দু-দিন নয়, প্রায় রোজই। কয়েকটা শনিবারে ডেকে বললেন, কাল যদি মা আসতে পার একটু—। রবিবার বেরুনোয় লোকসান নেই অবশ্য ; খাটনিটুকু টাকায় পুষিয়ে দেন। কিন্তু অফিস থেকে ফিরবার সময় রোজই উৎপলার মনে হয়, সে যেন আখের ছিবড়ে ; সারা দিন ধরে জীবনের সমস্ত রসকষ নিংড়ে বের করে নিয়েছে। বাড়ি ফিরেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, ক্ষমতাও নেই বোধ হয়।

হরিদাস বলছিলেন, ত্রিদিব আসে না কেন রে ?

ডাক্তার সাহেব, জবাবটা দিন—আসা হয় না কেন ইদানীং ? লজ্জা ? বটেই তো ! বয়স হোক আর পুরানো পরিচয় যতই থাকুক —বিয়ের বর, সে তো মিথ্যা নয় ! সামনে দু-মাস অকাল, কিন্তু বাবার যেন সবুর সইছে না।

উৎপলা মনে মনে হাসে। সবুর সইছে না একা বাবারই বুঝি ? অন্য সকলে নিতান্তই উদাসীন নির্বিকার—কি বল ?

মনে পড়ে যায়, দিদি লতিকার সঙ্গেও দেখা হয় নি অনেককাল। সামনের রবিবার নিশ্চয় যাবে। বর দেখানোর তারিখটা ঠিক করে

আসবে সেই সময়। দিদির বরের সঙ্গে তার বর ত্রিদিবের পরিচয় করিয়ে দেবে—সেই যে কথাবার্তা হয়েছিল। কথাটা তারপরে চাপা পড়ে গেছে।

এমনি সমস্ত ভাবছে উন্মনা হয়ে। খট করে দরজা একটু নড়ে উঠল। আরে, মুকুল এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে কেউ নেই একা চলে এসেছ? এ বাড়ি এসেছে মুকুল অনেকবার, একা একা এল এই প্রথম। এস এস,—মুকুলবাবু বড় হয়ে গেছে, একলা চলাফেরা করতে পারে—আর ভাবনা কি আমাদের? কোন জায়গায় যেতে ইচ্ছে হলে মুকুলবাবু গার্জেন হয়ে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু মুকুলের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়। সুন্দর মুখে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন। ক'টা দিন দেখে নি, তার মধ্যে কত ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। কাছে গিয়ে হাত ধরে টেনে এনে খাটের উপর বসিয়ে স্নেহোচ্ছল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এমন চেহারা কেন মুকুল? কি হয়েছে—বল দিকি শুনি।

জবাব দেবে কি—মুকুল দেয়ালের ফোটোর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। ত্রিদিবের ছবি—সেই অনেক কাল আগে যখন সুবোধের সঙ্গে সে কলেজে পড়ত। উৎপলা ছবিটা সংগোপনে কাছে রাখত, এই কিছুদিন ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছে। আর কিসের পরোয়া—এই তো অকালের মাস দুটো গেলে ত্রিদিবের হাত ধরে সে ডঙ্কা মেরে বেড়াবে।

আজকের ত্রিদিব রায় অনেক তফাৎ ঐ ছবির সঙ্গে। চেয়ে চেয়ে তবু মুকুল চিনল। বলে, মাসিমা, ডক্টর রায়ের ছবি নয়?

উৎপলা ঘাড় নেড়ে বলে, তখন ডক্টর রায় নয়—সামান্য এক ত্রিদিবনাথ। ঠিক তো চিনেছ, নিশ্চয় খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছ তাঁকে। নিজের চেষ্টায় কত বড় হওয়া যায়, তার জীবন্ত উদাহরণ। তুমিও জীবনে ঐ রকম হোয়ো মুকুল।

মুকুল আপন ভাবনায় ছিল, উৎপলার সমস্ত কথা কানে গেল না

হয়তো। বলে, ডক্টর রায়ের বাড়িটা জানেন মাসিমা? কোন রাস্তায়, কদ্দুর?

রাস্তার নাম বলে দিয়ে উৎপলা বলল, বাড়িটা চিনি আমি—নম্বর কে মুখস্থ রেখেছে। টেলিফোন-গাইডে আছে, ইচ্ছে হলে দেখে নিতে পার। নম্বরই বা লাগে কিসে? ওদিকটায় গিয়ে একটু লেখাপড়া-জানা যার কাছে জিজ্ঞাসা করবে, সেই বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

প্রশ্ন করে, তাঁর বাড়ির খবর কেন মুকুল, কোন দরকার আছে? খবরদার, এমন একা একা চলে যাবেনা। অনেক দূর।

ফোঁটা কয়েক জল গড়িয়ে পড়ল মুকুলের চোখ দিয়ে। উৎপলা অবাক হয়ে যায়, কি হয়েছে—আমায় বলবে না?

মিষ্টি কথায় মুকুলের কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলে, মিথ্যে বদনাম দিয়ে আমার মাকে ওরা তাড়িয়ে দিচ্ছে। সেই জন্যে মাসিমা তোমার কাছে এলাম।

উৎপলা বিশ্বাস করতে পারে না সহসা। জানে তো, শেখরনাথ কি চোখে লতিকাকে দেখে! সকল জায়গায় তার প্রশংসা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত শুনল মুকুলের কাছ থেকে। মুকুল বলে, ডক্টর রায় রয়েছেন ওদের দলের মধ্যে। আমি ভাবতে পারিনে মাসিমা, অত বড় মানুষের এমন অধোগতি কি করে হয়।

উৎপলা বলে, ডক্টর রায় অনেক উপকার পেয়েছেন শেখরনাথের কাছে, শেখরের সঙ্গে তাঁর বড় বন্ধুত্ব। হাত এড়াতে না পেরে সঙ্গে রয়েছেন হয়তো।

মুকুল তিক্তস্বরে বলে, ঠিক উল্টো মাসিমা। তিনিই উসকে দিচ্ছেন শেখরনাথকে।

সে যাই হোক তোমার এত কি ভাবনা মুকুল? মা মাসি দু-জনে আমরা মাথার উপর—যা করতে হয়, আমরাই করব। তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ?

মুকুল বলে, মা কিছু করবে না। যদি কিছু করতে হয়, সে করবে তুমি—একলা তুমি। মা আর আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তা-ও আগেভাগে নয়। সকলের কাছ থেকে ঝাঁটালাথি যা খাবার, খেয়ে নিয়ে তারপরে বেরুব।

উৎপলা ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবছে। হঠাৎ মুকুল উঠে পড়ে, যাই মাসিমা।

সে কি রে? যাবে কি রকম। চল রান্নাঘরে।

মুকুল কাতর হয়ে বলে, খেয়েদেয়ে বেরিয়েছি মাসিমা। আর আমি খেতে পারব না। দেরি হলে হস্টেলে বকাবকি করবে। আমি চললাম।

উৎপলা নীলমণিকে ডাকে: পাগলা ছেলে ক্ষেপে গিয়েছে নীলমণি-দা, তুমি সঙ্গে করে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে এস। ভাবনা কোরো না মুকুল। কলকাতা ছেড়ে কেউ তোমরা যাবে না—না তুমি, না তোমার মা। কেউ অপমান করবে না। কালকে ওরা মীটিঙ করছে—দেখ দিকি, কিছু জানিনে আমি, কেউ কিছু বলে নি। অফিসে খেটে কারো কোন খবর রাখতে পারি নে। লোকলৌকিকতা চুলোয় গেছে, অমানুষ হয়ে গেছি একেবারে।

হাত ঘড়ি দেখে উৎপলা উঠে পড়ল। আর বিশ্রাম চলবে না, হরিদাসের খাবার দেওয়ার সময় হল।

নীলমণি-দা আসছে, একটুখানি বোসো মুকুল। ডক্টর রায়কে আমি মানা করে দেব, শেখরনাথকেও দেখে নেব।

মুকুল গর্জন করে ওঠে, দেখব আমিও—

বুড়ো নীলমণির নড়তে চড়তে দেরি হয়। এসে দেখে মুকুল চলে গেছে। রাস্তায় নেমে খানিকটা এগিয়ে দেখে। পাওয়া গেল না। উৎপলা রাগ করবে—কিন্তু উপায় কি, বাচ্চা ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তড়িঘড়ি ছুটাছুটির সামর্থ আছে কি তার?

সকালবেলা উৎপলা ত্রিদিবের কাছে যাচ্ছে। আদ্যোপান্ত তার কাছে সব শুনবে। কিন্তু ভুজঙ্গ এসে ভণ্ডুল করে দিলেন।

কি ব্যাপার ? কি মনে করে হঠাৎ এদ্দিন পরে ?

জংবাহাদুর বলেন, খবরাখবর নিতে এলাম দিদি। মনিবের সঙ্গে বনিবনাও হল না—চাকরি ছাড়লেন, বেশ করলেন। কিন্তু সে জন্যে আমরা পর হয়ে যাব কেন ?

উৎপলা সোজাসুজি প্রশ্ন করে, মনিব পাঠিয়েছে ?

জংবাহাদুর থতমত খেয়ে বলেন, নিজের আসতে বাধা কি ?

বাধা কিছু নেই, কিন্তু আসেন নি। নিজে থেকে কোথাও যান না আপনি, কোন-কিছু করেন না। অন্তত আমি তা কখনো দেখি নি।

ভুজঙ্গ একটু বিরক্তভাবে বললেন, দেখেননি—তবে দেখুন এই আজকে। হিতকথা বলতে বাস-ভাড়া করে ছুটে এলাম। ঝগড়াঝাটি করে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। আপনার পরে আর একটা মেয়ে এসেছে, কিন্তু তার গ্রামার শুদ্ধ করবার জন্য আর একজনের দরকার। এমন মুখ্যু দিয়ে কাজ হয় না। যা বলতে এসেছি, শুনুন। বড় আহা-মরি মানুষ দুলালচাঁদ বাবু—অমন মানুষ হয় না। আপনি একটু নরম হয়ে তাঁর কাছে যদি ঘাট স্বীকার করেন—

অর্থাৎ ঘাট স্বীকার করে দুলালবাবু আপনাকে পাঠিয়েছেন। তাঁকে বলবেন—মারফতি মাপ চাওয়ার বদলে নিজে সামনে এসে করজোড়ও যদি করেন, তাঁর চাকরি আমি করব না।

জংবাহাদুরও নাছোড়বান্দা। সুস্পষ্ট 'না' বলার পরেও সন্দেহ রাখেন, কোন গূঢ় গভীর তলদেশে 'হাঁ' লুকিয়ে আছে, খানিক ঘোলাঘুলির পর ভেসে উঠবে। বললেন, অমন সোনার চাকরি—

অন্য চাকরি পেয়েছি আমি। সোনার নয়, কিন্তু সম্মানের।

জংবাদুর বলেন, যদি কোন অসম্মান হয়ে থাকে, মনিবের হয়ে মাফ চাচ্ছি। রাগ পুষে রাখবেন না।

দুলালচাঁদের উপর রাগ পুষে রাখব, অতটা দরের মানুষ তাঁকে

ভাবি না। কোন রাগ নেই। নতুন চাকরি নিয়েছি বটে, সেটাও ছেড়ে দেব। চাকরিই করব না আর।

থেমে গিয়ে একটু হেসে বলে, বিয়ে হচ্ছে। অকালের মাস ছুটো গেলেই।

বিয়ে আপনার ?

পাংশু মুখে জংবাহাদুর বিস্তর উল্লাস প্রকাশ করলেন, বিয়ে ? ভাল ভাল। তা পাত্রটি কে হলেন, পরিচয় শুনি।

উৎপলা বলে, ভাল পাত্র। আপনি তো চেনেনই, নাম করলে দেশের সমস্ত লোক তাঁকে চিনবে।

হাসিমুখে দেয়ালের ছবির দিকে আঙুল দেখাল, ঐ যে—

আনন্দে গদগদ হয়ে জংবাহাদুর বললেন, তাই নাকি! ত্রিদিব আমার বড় আপনার।

সে তো জানিই। সেই যে নেমন্তন্ন করিতে গিয়ে ওঁরই বাড়ি বসে হচ্ছিল সেসব কথা।

জংবাহাদুর আগের কথারই জের ধরে বলতে লাগলেন, অমন পাত্র হয় না। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু পাত্রীর দিক দিয়েও আজকাল ঠানদিদি ঠাকুরমারা পাউডার মেখে কনে-পিঁড়িতে এসে বসেন। সত্যি, এ সম্বন্ধ জাঁক করে শোনানোর মতো—

উৎপলা বলে, কিন্তু এক দোষেই সমস্ত মাটি। কড়াই ভর্তি দুধের মধ্যে গোময়। আপনার সেই বিদ্যাধরীর সঙ্গে আমার কিন্তু খুব ভাব হয়ে গেছে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সে বলে অন্য কথা।

তখন ভুজঙ্গর মনে পড়ে যায়, যা সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল। তাঁরই কথা ফিরিয়ে বলে ঠাট্টা করছে। রাগ করে বললেন, বিদ্যাধরী সাফাই সাক্ষি দিয়েছে। চুলোয় যাকগে। কিন্তু বিয়ে-করা জলজ্যান্ত এক পরিবার আছে, তার সঙ্গেও পরিচয়টা তবে সেরে নিন।

তাকিয়ে আছে দেখে অধিকতর উৎসাহে জংবাহাদুর বলতে লাগলেন, এই কলকাতা শহরেই আছে সে। মিল-টিল হয়ে গেছে

ছ-জনায়। মাধবীলতা বউটার নাম। ঠিকানার খোঁজ নিয়ে আপনাকে দিয়ে যাব। সেই যা বলেছিলাম—বাইরেটা দেখে সকলে মত্ত হয়, কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়ে ত্রিদিবটা অতি ইতর।

উৎপলা তীব্র স্বরে বলল, কিন্তু আপনার মনিব তুলালের মতন নয়। যা বলবার বলা হয়ে গেছে তো—আমি উপরে চলে যাচ্ছি।

অপমানে ধৈর্য হারিয়ে কাজ নষ্ট করবার পাত্র ভুজঙ্গবাহাদুর নন। উৎপলা চলে যায়, তখন বলে উঠলেন, ওদের পারিবারিক ইতিহাস আমি সমস্ত জানি দিদি। বউটাও কুলটা।

উৎপলা ফিরে দাঁড়িয়ে বোমার মতো ফেটে পড়ল, স্পষ্টাস্পষ্টি বেরিয়ে যেতে না বললে উঠবেন না বুঝি? এ সমস্ত করে কোন লাভ হবে না আপনার মনিবের, বিয়ে আটকানো যাবে না।

দুমদুম করে সিঁড়ি বেয়ে উৎপলা উপরে উঠে গেল। যাবার সময় দরজা দিয়ে গেল, চিৎকার করে বললেও ভুজঙ্গের কথা আর তার কানে ঢুকবে না।

ভেবেছিল, ত্রিদিবের বাড়ি গিয়ে লতিকার সম্বন্ধে কিছু বলে আসবে। কিন্তু মনটা খিঁচড়ে গেল। বেলাও হয়েছে, বেরিয়ে পড়ছে এতক্ষণে ত্রিদিব। উৎপলারও অফিসে বেরুনোর সময় হল। যাকগে, অফিসে গিয়ে ফোন করবে ত্রিদিবকে, ফোনে সমস্ত বলবে।

॥ উনিশ ॥

ত্রিদিব বেরোয় নি, বাড়িতেই আছে। কি রকম অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, ভাল লাগছে না কোন-কিছুই। এর উপর একটা যন্ত্রণা উঠছে মাঝে মাঝে বুকের নিচের দিকটায়।

সুধার নজরে পড়েছে।

হয়েছে কি বল তো দাদা?

ম্লান হেসে ত্রিদিব বলে, নির্বিকল্প সমাধি। সকল আশা মিটেছে,

যা-কিছু চেয়েছিলাম ভাগ্যবিধাতা কল্পতরু হয়ে দু-হাতে ঢেলেছেন। আর কিছু করবার নেই, শুয়ে বসে চেখে চেখে এখন শুধু উপভোগ করা।

এই হাসি এই কথাবার্তায় সুধার চোখের কোণে জল এসে যায়। আঁচলের প্রান্তে মুছে ফেলে ঝাঁঝালো সুরে বলে, রাত্রিদিন তোমার মুখের বড়াই—শুনতে শুনতে কান পচে গেল। আর যার কাছে পার, আমায় তুমি মিথ্যে ছলনায় ভুলোতে পারবে না।

ত্রিদিব বলে, উপভোগের কথাই বলেছি, সুখের কথা হল কখন? দুঃখের বুঝি উপভোগ হয় না! বিধাতাপুরুষের কাছে খ্যাতি-প্রতিপত্তি চেয়েছিলাম, সুখশান্তি তো চাই নি। এখন আবার নতুন আবদার ধরতে গেলে চলবে কেন?

সুধা নাছোড়বান্দা হয়ে বলে, ওঠ দাদা। উঠে খানিক বেড়িয়ে এস, শরীর-মন চাঙ্গা হবে।

বারবার তাগিদেও ত্রিদিবকে নড়ানো যায় না। শুয়ে শুয়ে বলে, একেবারে বেরুবে রে! কলকাতা শহরের বাস উঠিয়ে দিয়ে। হতভাগা জায়গায় আর কোনদিন আসছি নে।

সুধা বলে, সে কি? আর-কিছু না হোক এত কষ্ট করে ল্যাবরেটারি গড়ে তুলছ—সমস্ত ছেড়েছুড়ে চলে যাবে?

জীবনের কোন বন্ধন কবে গ্রাহ্য করেছি বোন? দৈত্যের মতন সংসারটা দলেমথে বেড়িয়েছি। ল্যাবরেটারি কি এমন বস্তু যে এতকাল পরে পায়ে বেড়ি আটকাবে?

একটু থেমে বলে, পলিকে কি বলা যাবে, সেইটে শুধু ভাবছি। ভারি বুদ্ধির মেয়ে। ভেবেচিন্তে বানিয়ে কিছু বলতে হবে। ঝগড়া করে বলব না মিষ্টি কথায় বলব, মনে মনে সেই মুশাবিদা করছিলাম। ফল অবশ্য একই।

সুধা বলে, কোথায় যাবে?

'এখনো ঠিক করি নি। আর দশজনের মতো ছকে-বাঁধা জীবন

আমার নয়। বেরুলেই হল। পৃথিবী ছোট্ট জায়গা—সব দেশ সকল মানুষের মধ্যে চেনা-জানা হয়ে গেছে। বেরুব তার জন্যে আগে থেকে তোড়জোড় হিসাবপত্তরের কিছু নেই। কোন এক সকালে উঠে বললেই হল, বাঁধ গাঁটরি—কেন টিকিট—

সুধা বলে, অনেক তো হল। বয়স হয়েছে। ভেবেছিলাম, শান্ত হবে এবার। উৎপলাকে নিয়ে সুখী হবে।

ত্রিদিব বলে, আমিও ভেবেছিলাম তেমনি খানিকটা। কিন্তু হতে দিল কই? সর্বনাশী রে-রে করে এসে পড়ল। হ্যাঁ সুধা, সুখসোয়াস্তির দিকে চোখ তুলে তাকাতে গেলেই সে দাঁত বের করে ভয় দেখায়।

ত্রস্তকণ্ঠে সুধা বলে, চুপ কর দাদা, চুপ কর—

কিন্তু ত্রিদিব থামে না।

সর্বনাশী বলে কি জান? সংসারই যদি করবে, তবে এক সাজানো সংসার একদিন থেঁতলে মাড়িয়ে এলে কেন? এ আমি দেখেছি সুধা, গৃহস্থালীর কথা ভাবতে গিয়েছ কি সে অমনি উদয় হবে কোথা থেকে। অন্তর্যামী—কেমন করে যেন টের পেয়ে যায়।

এমনি কথা সুধা আরও অনেক বার শুনেছে। চোখ ছলছল করে আসে তার। বলে, সকলের বড় সর্বনাশী আমি দাদা তোমার জীবনে।

ঠিক উল্টো। পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলের ভূতপূর্ব এক মাস্টার দুনিয়া জুড়ে এত হৈ-হৈ করে এল, তার মূলে রয়েছ তুমি। অসুখে পড়ে পড়ে ধুঁকি, অগণ্য ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একটি প্রাণীরও পাত্তা পাওয়া যায় না সেবা-যত্নের জন্য, বিছানার পাশে তখনো সেই তুমি। পৃথিবীতে একটি মাত্র আমার আপন মানুষ আছে, তার নাম সুধাময়ী।

সুধা প্রবোধ মানে না, আকুল হয়ে পড়ে। আকুল হয়ে কেঁদে ফেলে: দাদা, ভুল করেছি জীবনে। বাঁচতে আমার একটুও লোভ নেই। আত্মহত্যার ইচ্ছে হয়, কিন্তু মরতেও বড় ভয়। মরার পরে যেখানে যাব সে যদি পৃথিবীর চেয়ে আরও খারাপ হয়, আরও নিষ্ঠুর হয়?

ত্রিদিব উচ্ছ্বসিত হাসি হাসতে লাগল। কোনটা ভুল আর কোনটা সত্যি, অঙ্ক কষে কে তা সঠিক বলে দেবে? সৃষ্টির আদিকাল থেকে সত্য আর নীতিনিয়মের মান কতবার বদলাল, পণ্ডিতেরা তার সাক্ষি দেবেন। এক জায়গায় এক সমাজের কাছে যা নীতি বলে মান্য পায়, ভিন্ন এক জায়গায় তারই সম্বন্ধে বিক্ষোভের অন্ত নেই।

সুধা বলে, এ তর্কে লাভ নেই দাদা। আমি ভাল করি কিম্বা মন্দ করি, এটা তো ঠিক—নির্দোষী তুমি কলঙ্কের ভরা মাথায় নিলে আমার জন্যে।

ত্রিদিব দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, আমার নিজের জন্য। সমস্ত জেনেশুনেও কেন তুমি মন গুমরে বেড়াবে? আমার নিজের জন্যই সমস্ত। ঘটি-চুরি বাটি-চুরি না হলেও দুল চুরি করেছি। হ্যাঁ, উৎপলার কানের দুল—তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। জাত-ভদ্দোরের মতো জোচ্চুরিও যে করিনি, এমন হলফ করে বলতে পারি নে। তারপরে একদিন অনুতপ্ত হয়ে অসাধু পথ ছেড়ে দিলাম। চুরি-ছ্যাচড়ামি আর নয়—বিক্রি। ঘড়ি বই-ফাউণ্টেনপেন বেচলাম, মেসের দেনা তবু শোধ হয় না। শেষটা সুনাম—স্বেচ্ছায় সুস্থ-শরীরে আমি সুনাম বিক্রি করে দিলাম। দামও মিলল ঢের। আমি জিতেছি—নার্ভাস হয়ে গিয়ে বাজার-ছাড়া দাম দিয়ে দিল আমায়।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সুধা বলে, তোমার জিত নিয়ে তুমি থাক দাদা। আমায় শোনাতে এস না, আমি সইতে পারি নে।

সুধা চলে গেল। বেরিয়ে গেল রাগ করে। গেল উৎপলার কাছে। হতভাগী, আপন চাকরিবাকরি নিয়ে বাপকে নাইয়ে-খাইয়ে অকালের মাস কয়টা কাটাবার প্রতীক্ষায় আছ, তোমার সব স্বপ্ন পদতলে থেঁতলে গুঁড়িয়ে চলে যাবার মনন করেছে এদিকে। ছুটে এসে পড়, কড়া হও। ভালমানুষির দিনকাল আর নেই।

ত্রিদিব শুয়ে পড়েছে, যন্ত্রণাটা বেড়েছে আরও। ক'দিন থেকে

এইরকম। সুধাকে বিন্দুবিসর্গ বলে নি। কিন্তু আর না বলে চলবে না, মনে হচ্ছে। সেবার জেনেভায় যে রকমটা হয়েছিল, তারই সূচনা। বড় কষ্ট পেয়েছিল, ডাক্তারে একটা গাল-ভরা নামও দিয়েছিল রোগটার। পলিক্লিনিকে দেড় মাস নিয়মিত ঘোরাফেরা করতে হয়েছিল। আবার যখন দেখা দিয়েছে অষুধে-পথ্যে তাড়না করতে হবে নির্ঘাৎ; আপোষে যাবে না।

অ্যাঁ, কে তার নাম করে? গোপালের কাছে কে যেন খোঁজ নিচ্ছে। মিষ্টি রিনরিনে গলা। উৎকর্ণ হল।

ডক্টর রায় আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

গোপাল ভাগিয়ে দেয়, যাও যাও—

আছেন কিনা তাই বল।

দেখা হবে না, শরীর ভাল নয়।

ত্রিদিব বালিশ পেটে চেপে উপুড় হয়ে পড়েছিল। ধড়মড় উঠে সে বাইরে ছুটল।

কে? আসতে দে গোপাল। ভাল আছি, খুব ভাল আছি আমি।

মুকুল এসেছে। এক গাল হেসে ত্রিদিব তার হাত ধরল। এক ঝাঁকিতে হাত ছাড়িয়ে নেয় ছোট্ট ছেলে। কেউটে-বাচ্চা ফোঁস করে যেমন ফণা তুলে ওঠে।

ওরে গোপাল, কদ্দূর থেকে এসেছে মুকুল। কষ্ট হয়েছে বড্ড, তাই চটে যাচ্ছে। সন্দেশ নিয়ে আয় শিগগির। এলি কেমন করে মুকুল? আয় রে, ভিতরে এসে বোস।

মুকুল ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তুই-তোকারি করছেন কেন? কিসের সম্পর্ক আপনার সঙ্গে?

ও, 'তুই' বলা চলবে না। 'আজ্ঞে' 'মশায়' বলতে হবে। তা তো বটেই—মুকুলবাবু যে বড় হয়ে গিয়েছেন, প্রবীণ হয়েছেন। নইলে এতদূর থেকে একা-একা আসা হল কি করে?

গোপাল চলে গিয়েছে, হয়তো সন্দেশই কিনে আনবার জন্য। বাইরের দিকে কেউ নেই। ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলে, তা বেশ —আপনিই বলা যাবে এখন থেকে। ভিতরে আসতে আজ্ঞা হোক, পাখার তলে বসে ঠাণ্ডা হন একটু।

মুকুল বলে, ঠাট্টার দরকার নেই। শেখরনাথের সঙ্গে মিলে মা'কে তাড়িয়ে দিচ্ছেন—তা দিন গে, বয়ে গেল। মা-ই চায় না এই খারাপ জায়গায় থাকতে। কিন্তু তা বলে বদনাম দেবেন কেন ?

ছেলেমানুষ তুমি, কে এ সমস্ত মাথায় ঢুকিয়ে ক্ষেপিয়ে দিল—

মুকুল বলে, আমি ছেলেমানুষ বলেই তো এত সাহস আপনাদের। মা আমার মুখ বুজে সমস্ত সয়ে যাবে, কাউকে কিছু বলবে না। আর আমি তো ছেলেমানুষই আছি। কিন্তু অত সহজে পার পাচ্ছেন না। বলুন, আপনার মতন এত বড় মানুষ কি জন্যে এমন ইতরতায় নেমেছেন ?

কৈফিয়ৎ চাও নাকি ? সে সব যদি তোমার শোনবার মতো না হয় ?

ত্রিদিবের রাগ নেই, কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। মুকুলের হাতে কাগজের মোড়ক—উত্তেজনার মুখে নাড়াচাড়ায় কাগজটা একটু খুলে গিয়েছে—কাগজে মুড়ে নিয়ে এসেছে ঘোড়ার সহিসের হাতে যে ধরনের চাবুক থাকে, সেই বস্তু।

শাস্তি দিতে এসেছ ? ত্রিদিব একেবারে কেমন হয়ে গেল। আর্তনাদের মতো বলে ওঠে, তাই দাও মুকুল, শাস্তি দাও। শাস্তির আমি যোগ্য, চাবকাও আমাকে।

মুকুলও থমকে গেছে। চাবুক বয়ে এনেছে এদ্দূরে, কিন্তু আসল সময়টিতে চোখে জল বেরিয়ে এল।

আমরা গরিব, সহায় সম্বল নেই। বোর্ডিং ছেড়ে দিয়ে মা-মণির সঙ্গে চলে যাচ্ছি, পড়াশুনো বন্ধ। আমাদের আপন কেউ নেই কিনা, তাই বুঝে আপনারা পিছনে লেগেছেন।

আছে তোমার আপন-জন মুকল। যেমন তোমার মা, তেমনি বাপও আছে।

বাবা? কচি ছেলের মুখ ঘৃণায় বীভৎস হয়ে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, নেই—

আছে, আছে—তুমি হয়তো জান না।

জানতে চাইনে আমি। আমি যখন এক বছরেরটি তখন বাবা আমায়—

আর বলতে পারল না। আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে। ত্রিদিবের চোখও শুষ্ক নয়। বলে, জান মুকুল তোমার বাবা কে?

হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে মুকুল বলে, আপনি চেনেন তাঁকে?

একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগল, সকলের বাবা থাকে, আমার নেই। কিন্তু যা শুনেছি, ভয় করে বাবার নামে। ঘৃণাও হয়।

ত্রিদিব আর সামলাতে পারে না: আমি তোমার বাবা—সেই পাষণ্ড।

আপনি এত বড়লোক—ডক্টর রায়—

হ্যাঁ, দেশবিখ্যাত সকলের হিংসার পাত্র ডক্টর ত্রিদিব রায়। কিন্তু নিজের ছেলে পিতৃ-পরিচয়ে ঘৃণা পায়।

মুকুল সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট ঐ ছেলে—কিন্তু কী হয়ে যায় আজ সর্বমান্য ত্রিদিবনাথের, কাতর হয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করছে তার কাছে। বলে, বড় হতে চেয়েছিলাম মুকুল। উঁচু আশা ঘরে টিকতে দিল না, আমায় জগৎময় ঘুরিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। বড় ক্লান্ত। ঘর খুঁজছি আজকে, কিন্তু কোথায়? ঘর মরীচিকা হয়ে যাচ্ছে পা বাড়াতে গেলেই। আমায় ক্ষমা কর।

এই এক বাচ্চা ছেলেই শুধু নয়—অলক্ষ্য কোন সুদূরবর্তিনীকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা লুটোপুটি খাচ্ছে যেন। কিন্তু ঘৃণার কৃষ্ণ-ছায়ায় মুকুলের মুখ আবার কালো হয়ে উঠল।

আমি ভেবেছিলাম, আমার বাপ মুখ্যুসুখ্যু এক সামান্য লোক। এত বড় হয়েও আপনি এমন? ছি-ছি-ছি!

ত্রিদিব হাত বাড়িয়েছিল মুকুলকে বুক নিতে। সে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ছুটে বেরুল, মুখ ফিরিয়ে তাকাল না আর একটিবার।

কতক্ষণ আছে দাঁড়িয়ে ত্রিদিব সেই বারাণ্ডায়। সুধা ফিরে এল। উৎপলার দেখা পায় নি, নীলমণির কাছ থেকে জানা গেল, সে আজ অফিসে যাবে না—লতিকার ইস্কুলে মীটিং হচ্ছে, সেখানে গেছে। ফিরে এসে ত্রিদিবকে দেখল যেন এক বজ্রাহত মানুষ।

একনজরে পথের দিকে কি দেখছ দাদা?

ধরণীর বাইরে এক ভিন্ন লোকে ছিল বুঝি ত্রিদিব। সুধার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পায়। বলে, সাপ এসেছিল সুধা। ছোট্ট—কিন্তু ফণাভরা বিষ।

ওদিকে গোপাল এসে বলছে, মীটসেফের উপর খাবার রেখে এলাম দিদিমণি।

সুধা অবাক হয়ে বলে, খাবার! দোকানের খাবার আনবার কি গরজ হল?

এক বাবালোক এসেছিলেন, সাহেব তাই বললেন—

নিশ্বাস ফেলে ত্রিদিব বলে, খাবার তুই খেয়ে ফেলগে গোপাল, সে চলে গেছে।

ধবক করে আর এক দিনের একটা ছবি ফুটল ত্রিদিবের মনে। বর্ষারাত্রে ছেলে কোলের ভিতর চেপে নিয়ে ঐ ঘর এই বারাণ্ডা দিয়ে ওর মা সেই যে নেমে চলে গেল! অমনি করেই ছুটে বেরিয়েছিল ঝুমা, মুখের উপর অমনি চেহারাই ফুটেছিল। মা আর ছেলে দু-জনে ওরা এক।

বিদ্যায়তন কাউন্সিলের সভা। বিষয়টা গোপনীয়, তা হলেও এমন মজাদার বস্তু চেপে রাখা যায় না, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ফুসফুস-গুজগুজ নিয়ত চলেছে এই সমস্ত নিয়ে। দোতলার ঘরে মীটিং। সিঁড়িতে দরোয়ান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাউন্সিলের লোক ছাড়া আর কাউকে উপরে উঠতে না দেয়।

সভাপতি বুড়া মানুষ। শেখরনাথ যখন ইস্কুলে পড়ত, সেই ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিনি। রিটায়ার করবার পর শেখর এনে বসিয়েছে কাউন্সিলের সভাপতি করে। চিরকাল মাস্টারি করেছেন, অতিশয় নিরীহ মানুষ। সাতেও থাকেন না পাঁচেও থাকেন না—কে কি বলে চুপ করে শোনেন, শেখরের কথায় 'হাঁ' দিয়ে যান শেষ অবধি আজকে কিন্তু গোড়াতেই তিনি ভূমিকা ফাঁদছেন।

মঞ্জু-বিদ্যায়তনের কেবল নতুন বাড়িই হচ্ছে না, পড়াশুনোর ধাঁচও একেবারে নতুন এবার থেকে। তাই কথা হয়েছিল, কয়েকজনকে বাদ দিয়ে তাঁদের জায়গায় বিশেষজ্ঞ নতুন শিক্ষিকা আনা হবে। শেখরনাথকে জানি আমরা সবাই—কারো অন্ন যায়, সে তা কিছুতে হতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজি হয়েছে—না হয়ে উপায় নেই, দেশে সুশিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা তো সকলের আগে—

তিন চারটি বেয়াড়া লোক আছে কমিটিতে—বিশেষ করে এটর্নি অনিমেষ। ঠেকানো যায় নি, অভিভাবকদের তরফ থেকে ইলেকশনে ঢুকে পড়েছে এরা। কিন্তু এই কজনে কি আর করতে পারে, ভোটে হেরে যায়, কায়দা পেলে কড়া কড়া বচন শোনায় শুধু।

অনিমেষ হুমকি দিয়ে ওঠে, আমরা ব্যস্ত মানুষ। কাজের কথায় আসুন। শেখরবাবু অত্যন্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তি—শুনে শুনে কান ঝালাপালা। আজকে নতুন করে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন কি হল?

সভাপতি বলে উঠলেন, কাজের কথা হল—কয়েকজনকে আমরা বিদায় দিচ্ছি, তার মধ্যে হেড-মিস্ট্রেসই যাচ্ছেন সকলের আগে। গুরুতর কারণ ঘটেছে।

অনিমেষ বলে, সেই তো তাজ্জব। বরাবর গুণগান শুনে আসছি—রাতারাতি এমন কি ঘটল যে আজকে তিনি বিশেষ সভায় আলোচনার বস্তু হয়ে উঠলেন?

সভাপতি বলেন, আমিও তাঁকে মা-জননী ছাড়া ডাকি নে। কাজের মেয়েও বটে। কিন্তু সর্বনেশে ব্যাপার বেরিয়ে পড়ল যে! আমাদের বিদ্যায়তন সাধারণ একটা ইস্কুল নয়, বিরাট আদর্শ এর পিছনে। এঁর যিনি কর্ত্রী হবেন—

অনিমেষ অধীর হয়ে বলে, সে জানি, সে জানি। হিমালয় গোছের একটা কিছু হবেন তিনি। হেড-মিস্ট্রেস সম্বন্ধে কানাঘুসো কিছু কিছু আমাদেরও কানে এসেছে। আপনি প্রাচীন মানুষ, সঠিক খবর জানতে চাইছি আপনার কাছ থেকে।

শেখর বলল, বিস্তারিত রিপোর্ট রয়েছে, পড়ে বুঝতে পারবেন।

সভাপতি বলেন, মহিলার চরিত্রঘটিত ব্যাপার—যত সত্যই হোক, মুখে বলতে ভদ্রতায় আটকায়।

অনিমেষ হেসে বলে, ভদ্রতা কাঁটাগাছ কিনা, আটকে আটকে যায়। ওটুকু আর কেন শেখরবাবু? আপনি বীরপুরুষ, উপড়ে ফেলে দিন না।

চট করে কাগজখানার উপর নজর বুলিয়ে আবার বলে, এই ভুজঙ্গ মুখুজ্জে কে মশাই? তার কথা আমরা বেদবাক্য বলে মেনে নিচ্ছি কি জন্যে?

শেখর বলে, ডক্টর ত্রিদিব রায়ের চেনা লোক ভুজঙ্গবাবু। ডক্টর রায় তার নাম বলে দিলেন, অনেক খবর সে জানে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ডক্টর রায় মীটিঙে আসছেন, এক্ষুণি এসে যাবেন। ভাল করে জিজ্ঞাসা করবেন, মনে কোন সন্দেহ রাখবেন না।

লতিকা ছিল না, সে এসে ঢুকল এইবার। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অনিমেষ থাকতে পারে না। সোজাসুজি প্রশ্ন করল, আপনি এলেন—

কি শক্ত মেয়ে! চোখে মুখে উদ্বেগের লেশমাত্র নেই, বরঞ্চ যেন হাসির ভাব। বলে, চাকরিতে আছি তো এখন অবধি। যতক্ষণ আছি, বিদ্যায়তন-কমিটীর মেম্বার আমি।

সভাপতি তাড়াতাড়ি বলেন, সে তো বটেই। তবে কথা হল যে, কেউ কেউ হয়তো বিরূপ মন্তব্য করবে—শুনে কষ্ট পাবে তুমি মা।

সভাপতিকে লতিকা কাকাবাবু বলে ডাকে। বলল, মস্ত বড় ব্যাপার শুনতে পাচ্ছি কাকাবাবু। ডক্টর রায় নিজে নাকি আসছেন সামান্য এক মাস্টারনি তাড়াতে। অত বড় মানুষটা কি বলেন, শুনতে এসেছি। লোভ সামলানো গেল না। আজকেই তো তাড়াচ্ছেন—এর পরে আপনাদের সঙ্গে বসবার আর কোন সুযোগ পাব না। সেইজন্য এসেছি।

অনিমেষ গজর-গজর করে, লোক-দেখানো ম্যানেজিং কমিটী। একজন-দু'জনের মরজির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনদিন কাউকে আকাশে তুললেন, পরের দিন ধপাস করে আবার পাতালে ডোবালেন। আজকে তা বলে সহজে নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

লতিকাকে বলে, আগে থেকে ধরে নেবেন না যে তাড়োনোই হবে আপনাকে।

লতিকা বলে, আপনারা তাড়ান না তাড়ান, আমি যাবই। পদত্যাগ করে চিঠি দিয়েছি সেক্রেটারির কাছে।

অনিমেষ বলে, আমিও সেটা আন্দাজ করেছিলাম। আত্মসম্মান নিয়ে এ জায়গায় কেউ থাকতে পারে না। আমার মেয়েরা এখানে পড়ে, তাদের মুখে শুনে থাকি আপনার কথা। আর বলতে কি, আপনার জন্যেই মেয়ে পাঠাই আমরা এখানে। এঁদের অভিযোগ সত্যি কি মিথ্যে, সাক্ষিসাবুদ এসে পড়লে খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

আমি আজ সহজে ছাড়ব না। কিন্তু সে সব বাদ দিয়েও কমিটির কাছে বলতে চাই, হেড-মিস্ট্রেসের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের আলোচ্য নয়, মানুষ মাত্রেরই দোষত্রুটি থাকে—

সভাপতি তারস্বরে প্রতিবাদ করে ওঠেন, তোমার এ কথাটা মানতে পারলাম না অনিমেষ। শেখরনাথের সামনে বসে এমন কথা বলছ কি করে ?

আর একজন ফোড়ন দিয়ে ওঠে, তা সত্যি, সম্রাট শাজাহানের সঙ্গে তুলনা চলে শেখরবাবুর। মঞ্জুলা দেবীর স্মৃতিতে অপরূপ এক তাজমহল বানিয়েছেন—এই মঞ্জু-বিদ্যায়তন।

সভাপতি বললেন, আমি বলব তারও চেয়ে বড়। তাজমহল পাথরে গড়া—তার প্রাণ নেই। শেখরের গড়া এই বিদ্যায়তন থেকে কত শত মেয়ে জীবন-পাথেয় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন থাকব না, তখনো প্রতিষ্ঠান থাকবে এমনি। তার সঙ্গে মঞ্জুলা দেবীও জীবন্ত হয়ে থাকবেন।

অনিমেষ তর্ক করে, ধরে নিচ্ছি শেখরবাবু আদর্শ পুরুষ। কিন্তু সকলেরই যে ঠিক এই রকমটা হতে হবে—

শাজাহানের উপমা-দাতা সেই লোকটি কথা শেষ না করতে দিয়ে বলে ওঠে, মানুষের চরিত্রই আসল। মঞ্জু-বিদ্যায়তন যিনি চালাবেন তাঁকে মঞ্জুলা দেবীর মতোই নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র হতে হবে।

সভাপতি বললেন, আমি ঐ সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দেব—মঞ্জুলা আর তার আদর্শ-স্বামী শেখরনাথ। না না শেখর, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। পতিব্রতা স্ত্রীর কথা আমরা পুরাণে ইতিহাসে অনেক শুনি, কিন্তু তোমার মতো পত্নীব্রত মহৎ স্বামী অত্যন্ত দুর্লভ।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—

বলতে বলতে উৎপলা এসে ঢুকল। নাটকের মোক্ষম সময়ে যেমনধারা হয়ে থাকে। মীটিঙের ঘরে বাইরের লোকের আসতে মানা —সিঁড়িতে দারোয়ান মোতায়েন। দারোয়ানের কথা না শুনে জোর

করে সে চলে এসেছে। বলে, মহৎ স্বামী শেখরনাথ, তাতে আর সন্দেহ কি! মাহাত্ম্যের কতটুকুই বা আপনারা জানেন! কিছু নতুন খবর পাবেন এই চিঠিখানায়।

সেই সবুজ চিঠি বের করে ধরল।

সভাপতি বললেন, তুমি কে মা? তোমায় তো চিনতে পারছি নে।

বিদ্রূপের কণ্ঠে উৎপলা বলে, পাপীয়সী লতিকার সম্পর্কে বোন হই আমি। এ চিঠি মহাত্মা শেখরনাথ ত্রিদিবকে লিখেছিলেন নিদারুণ বিপদের সময়। ত্রিদিব যত বড় নরাধম হোক চিঠি বেহাত করে নি। চুরি নামক পাপকার্য করে এটি আমাকে জোগাড় করতে হয়েছে। ভাগ্যিস করেছি, নয়তো শেখরনাথের সবচেয়ে বড় কীর্তিটা ধরাধামে অপ্রকাশ থেকে যেতো।

শেখরের দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে, লজ্জা পাচ্ছেন আপনি। মুখ দেখে বুঝতে পারছি। দশে ধর্মে কীর্তি জানুক, এ আপনি চান না। কিন্তু এঁরা পরম অন্তরঙ্গ—এখানে অন্তত চিঠিখানা পড়া উচিত।

শেখরনাথ বলে, চিঠি আমার? কই, আমি তো—মানে, আমি লিখেছি বলে তো—

মনে পড়ছে না? পড়ে যাই তা হলে। তখন যদি মনে পড়ে।

শেখরের পাংশু মুখের দিকে চেয়ে অনিমেষ উল্লাস ভরে বলে, চিঠিটা দিন তো আমার হাতে। দেখি।

শেখর গর্জন করে ওঠে, জরুরি মীটিঙের মধ্যে কে ঢুকতে দিল? ভাওতা দিয়ে কাজ পণ্ড করবার মতলব। দারোয়ান—

উৎপলাও কঠিন সুরে বলে, দারোয়ান ডেকে বের করে দেবেন? কিন্তু সবুজ চিঠি যে মুঠোয় নিয়ে বেরুব। আর যতক্ষণ এ চিঠি আছে আপনি আমার গোলাম।

অনিমেষ ভালমানুষের ভাবে বলে, কি ব্যাপার বলুন দিকি শেখরবাবু? এত মুশড়ে যাচ্ছেন কেন?

উৎপলা বলে, সাধু মহাত্মার গোপন কীর্তি। এক সরলা উদ্বাস্তু মেয়ের সঙ্গে প্রেম জমিয়েছিলেন। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হল, চোখে অন্ধকার দেখলেন তখন! এঁর যত বড়মানুষি আর মহাত্মাগিরি স্ত্রীর পয়সায়। স্ত্রীকে বাঘের মতন ডরাতেন। কুম্ভমেলার নাম করে বেরিয়ে পড়লেন, মেয়েটিও গেছে। নানারকম চেষ্টা করে দেখে শেষটা পরম বন্ধু ত্রিদিবের কাছে কাকুতি-মিনতি করছেন, পাপের দায়িত্ব নিতে বলছেন তাকে, প্রলোভন দেখাচ্ছেন—

লতিকা উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে। এগিয়ে এসে উৎপলার হাত থেকে ছোঁ মেরে চিঠি নিয়ে নিল।

সবাই অবাক হয়ে শুনছিল। সভাপতি প্রশ্ন করলেন, এমন বিদঘুটে দায়িত্ব কে নিতে যায়?

উৎপলা বলে, তাই নিলেন ত্রিদিব রায়। সুনাম-সম্ভ্রম বিক্রি করে দিলেন টাকার দামে। দেশে থাকা তারপর অসম্ভব হয়ে উঠল। আর ত্রিদিবও চান তাই। ছোট্ট বয়স থেকে বিদেশের শিক্ষা নিয়ে বড় হওয়ার লোভ—শেখরনাথের টাকায় সে আশা পূরণ হল। শেখরনাথেরও লাভ। প্রতিভাশালী এক বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য তার নামে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। আপনারা কেউ জানেন না—দান নয়, সেটা মূল্য-শোধ।

সবুজ চিঠি আদ্যোপান্ত পড়ে লতিকা হতভম্ভ ;—মুখ দিয়ে কথা বেরোবার অবস্থা নেই। শেখরনাথ মীটিং ছেড়ে সরে পড়েছে। ভুজঙ্গ এমনি সময় হেলতে দুলতে এসে পড়লেন। চতুর্দিকে একবার নজর বুলিয়ে লতিকার দিকে চেয়ে বললেন, এই যে, মা-লক্ষ্মী রয়েছ এখানে—বেশ, বেশ! শেখর বাবাজিকে দেখছিনে। আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ত্রিদিবের বাড়ি হয়ে এলাম। সে আমার অতি আপন। তাই ভাবলাম, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তার গাড়িতে আসব। তা বড্ড অসুখ বেচারির, অসুখে ছটফট করছে।

লতিকা ব্যাকুল হয়ে বলে, কি হয়েছে?

জবাব না দিয়ে ভুজঙ্গ হেসে উঠলেন। উৎপলা ধমক দেয়: আপনি মানুষ না কি! হাসতে পারলেন এমন অবস্থায়? আর বলছেন, ত্রিদিববাবু আপন লোক।

ভুজঙ্গ বলেন, মা-লক্ষ্মী আজকে বড্ড উতলা। ভিতরের কথা জানা নেই, তা হলে তোমরাও হেসে উঠতে। হেসে গড়িয়ে পড়তে। ত্রিদিবের পেটের ভিতরে একটা যন্ত্রণা উঠেছে। শূল বেদনা-টেদনা হবে। ডাক্তার এসে পৌছয় নি। একবার ভাবলাম, থেকে যাই ততক্ষণ। তা সেই বিদ্যাধরীটি এসে বসল শিয়রে। ভদ্রলোকে তা হলে আর থাকে কেমন করে?

উৎপলা গর্জন করে ওঠে, এতখানি বয়স হয়েছে, চুল পাকিয়ে ফেললেন—ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন। সুধাময়ী বিদ্যাধরী কিংবা আর-কিছু, জিজ্ঞাসা করুন গিয়ে শেখরবাবুকে। যাঁর সঙ্গে দল পাকিয়ে ভাল মেয়েদের নামে কুৎসা ছড়াতে এসেছেন, একখানা চিঠি দেখে লাঠি-খাওয়া কুকুরের মতো যিনি পালাবার দিশা পেলেন না।

লতিকা সভাপতিকে বলল, আপনাদের বিচার দেখবার জন্য এসেছিলাম! সে তো আর হয়ে উঠল না কাকাবাবু! আমি চললাম।

অনিমেষ বলে, চলে যাচ্ছেন—মজা যে বড্ড জমে উঠছে!

লতিকা বলে, আমার অসুস্থ স্বামী ছটফট করছেন, বসে বসে প্রহসন দেখি কেমন করে অনিমেষবাবু। একা সুধা কি করছে জানি নে, আমি চললাম।

সভাপতি অবাক হয়ে বলেন, ত্রিদিব রায় তোমার স্বামী?

উৎপলাও বলে, দিদি, তোমার বরের কথা বলেছিলে—সে ঐ ত্রিদিব?

লতিকা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, আমার স্বামী—মুকুলের বাবা।

শেখরনাথ বাড়ি চলে গিয়েছিল। ভুজঙ্গ সেখানে গিয়ে প্রবোধ দিচ্ছেন, ঘাবড়ে যান কেন? অমন একটু-আধটু হয়েই থাকে, নইলে

আর মরদ কিসের? চুপচাপ এখন নিজের কাজ নিয়ে থাকুনগে, দুটো-চারটে মাস পরে আপনা আপনি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আবার সবাই মাথায় করে নাচবে। কত তা-বড় তা-বড় নেতা দেখলাম, নাম করে করে বলতে পারি—কলিযুগে সাচ্চা কেউ নয়।

ক'দিনের আসা-যাওয়ায় ভুজঙ্গ বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। হাতে পয়সা পড়েছে এবং প্রতিষ্ঠা চাচ্ছে—এসব মানুষকে পটিয়ে ফেলতে তাঁর জুড়ি নেই।

বললেন, ঐ যে শ্রীমতী মাধবীলতা—লতিকা হয়ে আপনার ইস্কুলে ঘাপটি মেরে ছিল, সকলের চোখের উপরে সতীসাধ্বী হয়ে ড্যাং-ড্যাং করে স্বামীসেবায় বেরিয়ে গেল—শুনবেন তবে ওর কীর্তিকলাপ? আপনি ছিলেন না, অন্য সকলে রে-রে করে উঠল—মীটিঙের মধ্যে তাই হাটে-হাঁড়ি ভাঙতে পারি নি।

মজাদার কাহিনীর ভূমিকাটুকু ধরতেই শেখর জিভ কাটল, ছি-ছি—ভুল জেনে বসে আছেন আপনারা। লতিকার পরিচয় না জানি, স্বামীজিকে জানি আমি ভাল করে। আমার মতন কেউ জানে না।

প্রতিবাদের বহরে ভুজঙ্গ হকচকিয়ে গেলেন।

জানেন? বেশ, কি জানেন বলুন তো শুনি।

জীবন পণ করে ওঁরা স্বাধীনতার আয়োজনে নেমেছিলেন। দলের মধ্যে আমারও একটু-আধটু ঘোরাফেরা ছিল। টাকাটা-পয়সাটা দিতাম, তার বেশি কি আমার ক্ষমতা! স্বামীজি দেব-চরিত্রের মানুষ। কাজের গতিকে কিছুকাল লতিকার সঙ্গে এক বাড়িতে ছিলেন। অপবাদটা ছড়াতে দেওয়া হয়েছিল ইচ্ছে করেই—পুলিশ যাতে সন্দেহ না করে, নিন্দা-ঘৃণায় ওঁদের আসল লক্ষ্য সাধারণের চোখে যাতে চাপা পড়ে যায়।

নাছোড়বান্দা ভুজঙ্গ বকবক করে যাচ্ছেন তবু। শেখরের কতক কানে যায়, কতক যায় না। ভাবছে সে নিজের মনে। তারই জন্যে ত্রিদিবের ঘর ভেঙেছে, কোলের ছেলে নিয়ে স্ত্রী দুর্যোগ-রাত্রে বেরিয়ে

পড়ল। ত্রিদিবের কাছে সমস্ত শুনেছে। ষড়যন্ত্র করে ত্রিদিবকে বাইরে পাঠাল মনের অনুশোচনায়। তারপরে লতিকা এল বিদ্যায়তনে—সেখান থেকে ধীরে ধীরে মনের রঙিন কুঠুরিতে মঞ্জুলার আসনে নিয়ে তাকে বসাল। তা-ও নয়—মঞ্জুলাকে নিয়ে বাইরে যত উচ্ছ্বাস দেখাক, আসলে তাকে সহ্য করা দায় হয়ে উঠেছিল। বড়লোকের অহঙ্কার—মঞ্জুলার জন্যই গরিব শেখরের ধনসম্পদ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি—এমনি একটা ভাব কথাবার্তায় চালচলনে। ত্রিদিবের ঘর ভেঙে গেল, আর শেখরের ঘর ছিলই না কোন দিন। বেশি দুর্ভাগা শেখর। মঞ্জুর অট্টালিকায় সোনার খাঁচায় বসবাস করত সে। লতিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছিল। স্বামীজির দলের মেয়ে, তাঁর পরম বিশ্বাসের পাত্রী। সে-ই যে আবার পরম বন্ধু ত্রিদিব রায়ের স্ত্রী, এমন সম্ভাবনা মনে আসবে কি করে?

॥ একুশ ॥

পরের দিন উৎপলা ত্রিদিবের বাড়ি গিয়েছে। জমজমাট সংসার। সুধা কলকণ্ঠে আহ্বান করে, এস—এস। গোপাল যাচ্ছিল তোমার কাছে। তুমি না থাকলে কেমন যেন ফাঁকা রয়ে যায়, আনন্দ ষোলকলায় ভরে না।

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে মুকুল আধ-শোয়া হয়ে ছিল, সুড়ুৎ করে সে উঠে পালাল। উৎপলা ডাকে, কি হল মুকুলবাবু? কি দোষ করলাম—চলে যাচ্ছ কি জন্য?

ত্রিদিব হেসে বলে, কাল এইখানে এসে থুতু ফেলে গিয়েছিল, সেই লজ্জায় আজ সে মুখ দেখাবে না। দাঁড়াও, ধরে নিয়ে আসি।

ছুটল ত্রিদিব ছেলের পিছু পিছু। উৎপলা বলে, দিদি, বলেছিলে বর দেখাবে। স্ফূর্তির চোটে ভুলে গেলে। উদ্যোগ করে তাই বর দেখতে এলাম। ডক্টর ত্রিদিব রায় আর বর ত্রিদিবে তফাতটা কি রকম, তাই দেখব।

ঝুমা বলে, আমরাও যাব তোর বর দেখতে। সুধা বাধে, আমি যাব—ওঁকেও নিয়ে যাব। কবে যাব বল্?

সুধা গম্ভীর হল। তার অজানা নেই কিছু। তাড়াতাড়ি সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল—চোখের জল পলি হতভাগী দেখতে না পায়।

আমার বর? উৎপলা উচ্ছ্বসিত হাসি হাসতে লাগল। বরের পিছনে ধাওয়া করলাম, তা পলকে বর ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। বিয়েই করব না ঠিক করে ফেলেছি, চাকরি করব চুটিয়ে। বাবা আর আমি—তার মধ্যে আর কাউকে ঘেঁষতে দিচ্ছিনে। বিয়ে করে সংসার নিয়ে মেতে গেলে আমার বাবাকে দেখবে কে?

গলা ধরে আসে। বাবার কথা এসে পড়ল, সেই জন্য নাকি—না, অন্য কিছু? ত্রিদিব ধরে নিয়ে আসছে মুকুলকে। পাঁজাকোলা করছে তো পা ছুঁড়ছে সে শূন্যদেশে। ত্রিদিব বলে, আহা, লজ্জা কিসের মুকুল—এ তো সদ্‌গুণ, আদর্শ মাতৃভক্তি। তুই তো তবু খালি-হাতে গিয়ে শুধুমাত্র থুতু ফেলে গেলি। আমার মাকে কেউ কিছু বললে চাবুক মেরে শোধ দিয়ে আসতাম।

অফিসের বেলা হচ্ছে বলে উৎপলা উঠে পড়ল। ত্রিদিব আবার কিছু বলে না বসে, তার সম্বন্ধে ত্রিদিবকে নিয়ে বড় ভয়। ত্রিদিবের সামনাসামনি উৎপলা থাকতে পারছে না।

রাস্তায় নেমে পড়ে সে স্তম্ভিত হল। পুলিশের গাড়ি তীরের মতো ছুটে এসে ব্রেক কষে থামল ত্রিদিবের বারাণ্ডার সামনে। লাফিয়ে নেমে পড়ল কতকগুলো কনস্টেবল এবং পুলিশের এক কর্তাব্যক্তি। আর দেখা গেল ভুজঙ্গকে—তিনি নামলেন না, জালে-ঘেরা গাড়ির ভিতর দিকে মুখ ফিরিয়ে ধ্যানে বসেছেন যেন। উৎপলা দ্রুতপায়ে এসে পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

মাধবীলতা দেবী আছেন এই বাড়িতে? ওয়ারেণ্ট আছে।

বাড়ির লোকও লক্ষ্য করেছে পুলিশের গাড়ি। বারাণ্ডায় বেরিয়ে এল। ভুজঙ্গের দিকে অপাঙ্গে এক নজর চেয়ে নিয়ে ইনস্পেক্টর বলে, ঐ যে তিনি। নদীতে ডুবে গিয়ে মরা-টরা মিথ্যে। আর জানেন, খুনের মামলা কখনো তামাদি হয় না।

সুধা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, মানুষ খুন করেছ বৌদি?

ঝুমা ঘাড় তুলল। গাড়ির ভিতরে ভুজঙ্গের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলল, মানুষ নয় সুধা—স্পাই।

ত্রিদিব বলে, সেটা ছিল ইংরেজের আমল। দেশের শত্রু মেরেই যদি থাকে, আজকে তার জন্যে শিরোপা পাওয়া উচিত।

উৎপলা পরিচয় দিয়ে দেয়, ডক্টর ত্রিদিব রায়কে জানেন তো? অন্তত নামে জানেন। যাঁকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন, ডক্টর রায়ের স্ত্রী তিনি।

ইনস্পেক্টর সসম্ভ্রমে বলে, আমরা কিছুই করি নি, আপনা থেকেই খোঁজখবর গিয়ে পৌঁছল। তখন না এসে তো উপায় নেই। এতকাল পরে প্রমাণই হবে না কিছু। প্রমাণ হলেও শিরোপা পাবেন কিংবা কি হবে—সে হল বড়দের বিবেচনা। সামান্য লোক আমরা, আমাদের দোষ নেবেন না।

মুকুল কেঁদে ওঠে, মা—মা-মণি—

উৎপলা কাছে টেনে নিয়ে তাকে শান্ত করছে, কান্না কেন মুকুল? তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, সবই তো বোঝ। বাবাকে পেয়ে গেছ, আমি মাসিমা রয়েছি—আমরাও যাচ্ছি সঙ্গে, তোমার মা-মণিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

ঝুমার মুখ মড়ার মতো রক্তশূন্য হয়ে গেছে। উৎপলা বলে, ভয় পাচ্ছ কেন? প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে ছুঁড়ে দিতে গিয়েছিলে তো একদিন!

ঝুমা চুপিচুপি বলে, প্রাণের চেয়ে ঘরসংসার আমার কাছে বড়। সংসারের দরজায় এসে পিছলে পড়ে গেলাম।

সকলকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে উৎপলা বলে, ভিতরে এসে একটুখানি বসুন ইনস্পেক্টর বাবু। দিদির সঙ্গে আমরাও যাব। জামিন-টামিন দিয়ে যেমন করে হোক নিয়ে আসতে হবে। মুকুল নইলে কেঁদে খুন হবে।

ঝুমা অশ্রুভরা অপলক চোখে ত্রিদিবের দিকে তাকিয়ে আছে। উৎপলা মুকুলের কান্নার কথাই বলল, ঝুমারটা বলল না।

॥ শেষ ॥